পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস

শ্যামলকুমার প্রামাণিক



ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ★ ★ ★ ২০০০

PUNDRADESH O JATIR ITIHAS

An Ethnological, Political, Social and Economic History of the Ancient Pundras in East India.

by Shyamal Kumar Pramanik

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই আগষ্ট, ২০০০ কলিকাতা

প্রচ্ছদ ঃ পার্থ সারথী সরকার

মুদ্রণে ঃ
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১২

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় পিতা
স্বর্গীয় কিশোরীমোহন প্রামাণিক-এর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের নিবেদন

ভারতবর্ষের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল সিন্ধু সভ্যতা। এই সভ্যতা মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির সমসাময়িক। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। সাম্প্রতিককালে মেহেরগড় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মেহেরগড় সভ্যতার সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দ। মেহেরগড় সভ্যতার সময়কাল থেকে আর্যদের ভারত আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বহু সভ্যতার কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষ। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহম্মদ রফিক মুঘল সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষে প্রায় শতাধিক সভ্যতার বিভিন্ন স্থানের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে হরপ্পা, চান-হুদ-রো, লোথাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোথাল পৃথিবীর প্রাচীনতম সমুদ্র বন্দর। ঠিক পরবর্তীকালে যে সকল সভ্যতা ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে মথুরা, বারাণসী, মগধ, পাটলিপুত্র, মহাস্থানগড, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, তাম্রলিপ্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে আর্য আগমনের পূর্বেই সিন্ধু সভ্যতার প্রায় সমসাময়িককালেই পূর্ব ভারতে গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্র সভ্যতা। পুণ্ড্র সভ্যতার কেন্দ্রস্থল মহাস্থানগড়ে খননকার্য চালিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সতেরটি ধ্বংসাবশেষের স্তর আবিষ্কার করেছেন। মহাস্থানগড়কে প্রাচীন পুণ্ড্র সভ্যতার রাজধানী হিসাবে সনাক্ত করেন আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম। বাংলাদেশের বগুড়া শহরের নিকটবর্তী করতোয়া নদীর তীরে এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিটি প্রাচীন পুণ্ড্র সভ্যতার এক মূল্যবান দলিল। তাছাড়া সমসাময়িককালের প্রাচীন সভ্যতার যে সকল ধ্বংসাবশেষ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে দিনাজপুরের বানগড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতুগড়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা, তিলপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী দেউলপোতায় নব্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুরের নিকটবর্তী আটঘরায় খননকার্যের সময় খ্রীষ্টপূর্ব যুগের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। আটঘরা প্রাচীন গ্রীক নাবিক টলেমির আন্তর্গাঙ্গেয় ভারতের মানচিত্রে উল্লিখিত গাঙ্গেয় নিম্নভূমি অঞ্চলের অন্যতম নগরী। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার তিলপির নিকটবর্তী ধোসায় খননকার্যের ফলে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বীরভূম

জেলায় অজয় নদের তীরে পাওয়া গেছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি। এখানে পাওয়া গেছে প্রাচীন সভ্যতার নির্দশন।

এই সকল ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে, বাংলাদেশে সভ্যতার ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্বকালে। অথচ ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ নেই। বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের রাজত্বকাল থেকে। কিন্তু শশাঙ্কের রাজত্বকাল ইতিহাসের সময়ের বিচারে সেদিনের ঘটনা। প্রাচীন বাংলার অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের গবেষণা ও আলোচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমি প্রাচীন বাংলার একটি আদি অধ্যায় পুণ্ড্রদেশ ও তার ইতিহাসের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে সাব-অলটার্ন ইতিহাসের অনুরাগী হিসাবে প্রাচীন পুণ্ড্র জাতির বর্তমান অবস্থাও আলোচনা করেছি।

পুণ্ড্রদেশ ও তার সভ্যতা সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলোকপাত করেন ইংরাজ ঐতিহাসিক উইলসন, আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম এবং হ্যামিলটন সাহেব। পরবর্তীকালে যে সকল বাঙালী মনীষী পুণ্ড্রদেশ ও তার সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায়, দীনেশ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুল সুর অন্যতম। পুণ্ড্রদেশ ও জাতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন পণ্ডিত বেনীমাধব দেব হালদার, রাইচরণ সরদার, শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ, ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ। সাম্প্রতিক কালে গবেষক নরোত্তম হালদার তাঁর 'গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ' এবং ধূর্জটি নস্কর 'পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধসভ্যতা' গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশ ও তার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নরোত্তম হালদার উল্লেখ করেছেন, গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনায় উল্লিখিত পূর্ব ভারতের প্রাচীন গঙ্গারিডি ও পুণ্ড্র একই জাতি। গঙ্গা নদীর অববাহিকায় বসবাস ছিল বলেই পুণ্ড্র জনজাতিকে গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ গঙ্গারিডি জাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারতে পূর্ব ভারতের এই অঞ্চলে সমসাময়িককালে পুণ্ড্রদের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

ইতিহাস সচেতন মানুষের কাছে গ্রন্থখানি গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা রাখি।

বিনীত

শ্যামলকুমার প্রামাণিক

সূচীপত্র

আর্য আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ

ভারতবর্ষের ইতিহাস সুপ্রাচীন। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা মিশর, ব্যাবিলন ও চীন সভ্যতার সমসাময়িক ভারতের সিন্ধু সভ্যতা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে এই সভ্যতা এক বিস্ময়কর নিদর্শন রেখেছিল।

এই সভ্যতার ছিল উন্নত লিপি, ভাষা। ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যেমন সে যুগের অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, অস্ত্র, শিলমোহর এগুলি থেকে প্রমাণিত হয় এই সভ্যতা ছিল এক উন্নততর সভ্যতা। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল লৌহযুগের পূর্বে অর্থাৎ তাম্রাশ্ম যুগে। সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতিও ছিল বিস্ময়কর। সমগ্র ভারতে সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িককালের চোদ্দশটি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিস্তৃতি সমগ্র মিশরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার বারো গুণ বেশি।

সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল পরিকল্পিত নগর। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে খননকার্যের সময় পরিলক্ষিত হয়, উভয় শহরের নির্মাণ পরিকল্পনায় দু'টি দিক ছিল। শহরের একটি অংশ বিস্তৃত ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে। এই অংশে অবস্থিত ছিল দুর্গ, শস্যাগার। মহেঞ্জোদাড়োতে যে দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু ঢিবির উপর অবস্থিত ছিল। এখানে যে ঘর-বাড়িগুলির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে ধারণা হয় এখানে শাসকশ্রেণী বসবাস করতেন। এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বৃহৎ স্নানাগার। স্নানাগারটির দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট। শস্যাগারটির আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট এবং প্রস্থে ১৫০ ফুট। এখানে আরও কয়েকটি বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি সম্ভবত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সভাঘর অথবা মিউনিসিপ্যালিটির হলঘর ছিল। উঁচু ঢিবির উপর এই অংশের ধ্বংসাবশেষগুলি থেকে মনে করা যেতে পারে যে সম্ভবত বন্যার সময় শহরের জনসাধারণ এখানে আশ্রয় নিত।

এই নগরগুলির নিম্নতর অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এখানেই জনসাধারণের বৃহৎ অংশ বসবাস করত। এখানকার রাস্তাগুলি চওড়া এবং

সরল। সেগুলি উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলি অধিকাংশই দ্বিতল এবং পোড়া মাটির ইটের তৈরী। বাড়িগুলিতে ছিল স্নানাগার এবং জলের জন্য ব্যবহৃত কূপ এবং জল সরবরাহ ও নিকাশী ব্যবস্থা।

সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পয়ঃপ্রণালী। পয়ঃপ্রণালীগুলি ছিল পোড়ামাটির ইটের তৈরী এবং আচ্ছাদিত। পয়ঃপ্রণালীগুলি পবিষ্কার করার জন্য কিছুটা দূর অন্তর ম্যানহোল বা ঢাকনা ছিল। ড্রেনগুলির মধ্যে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট Soak-pitও পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি বাড়ির সামনে জঞ্জাল ফেলার জন্য ছিল ইটের তৈরী ডাস্টবিন।

হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উভয়ই ছিল সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল উৎস। নগরের বাইরে ছিল গ্রাম এবং শস্যক্ষেত। কৃষকরা শস্যক্ষেতে ধান, গম ও যব প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। এছাড়া তুলাও প্রচুর উৎপাদন হত। উৎপাদিত তুলা থেকে শহরে তাঁতশিল্পীরা উৎকৃষ্টমানের বস্ত্র তৈরী করত। এছাড়া শহরের ধাতুশিল্পীরা তামা এবং ব্রোঞ্জের বিভিন্ন সামগ্রী নাগরিকদের জন্য তৈরী করত। মৃৎশিল্পও ছিল অত্যন্ত উন্নত।

সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক দিকটি ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। এই সভ্যতার সঙ্গে শুধুমাত্র ভারতীয় সভ্যতাগুলির বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল না। মিশরীয়, মেসোপটেমীয় এবং ক্রীট সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতাগুলির স্থলপথ ও জলপথ এই উভয় পথেই যোগাযোগ ছিল। গুজরাটের লোথালে পাওয়া গেছে একটি পোতাশ্রয়। লোথালের সমুদ্র বন্দরই পৃথিবীর প্রাচীনতম সমুদ্রবন্দর। স্থলপথেও দ্বিচক্রযানের ব্যবহার ছিল। সিন্ধু সভ্যতার বহু নিদর্শন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাতে বহু সংখ্যক টেরাকোটা. তামা ও ব্রোঞ্জের শিলমোহর পাওয়া গেছে। এই শিলমোহরগুলিতে বিভিন্ন জীবজন্তু, নৌযান ও দেবদেবীর অঙ্কিত মূর্তি পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত শিলমোহরে অঙ্কিত পশুপতিনাথের মূর্তি এবং মাতৃদেবী মূর্তিদ্বারা তৎকালীন যুগের ধর্ম সম্পর্কেও কিছুটা জানা যায়। এই পশুপতিনাথ হিন্দুধর্মের আদি দেবতা শিব।

মেসোপটেমিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার যে সকল শিলমোহর পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় এই সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০০ অব্দের।

স্যার জন ম্যালকমের মতে হরপ্পা সভ্যতার কাল ৩২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। সাম্প্রতিককালে রেডিও কার্বন পদ্ধতির দ্বারা সিন্ধু সভ্যতার এই বয়স নির্ধারিত হয়েছে।

মূলত পাথরের তৈরী শিলমোহর এবং তামার পাতের উপর সিন্ধুলিপি পাওয়া গেছে। সাধারণত পাথরের শিলমোহরের শীর্ষদেশে একছত্র লিপি এবং নিম্নে কোন জীবজন্তুর প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। তামার পাতের এক পিঠে লিপি ও অপর পিঠে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি আছে। যে সকল তামার পাতের উপর সিন্ধু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি ২.৩ সেমি বর্গাকার। অন্যগুলির পরিমাপ ৩.০ X ১.৩ সেমি. থেকে ৩.৮ X ২.৫ সেমি.। সিন্ধু লিপিতে ৩০০ চিহ্ন আছে। তার মধ্যে ২৫০ মৌলিক চিহ্ন এবং বাকীগুলি আনুষঙ্গিক চিহ্ন। সেগুলি মূল চিহ্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পণ্ডিতেরা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরূপ বিষ্ণু সর্বপ্রথম সিন্ধুলিপি পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি ১৯টি চিহ্নের ধ্বনি নির্ণয় করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এল. এ. ওয়াডেল তাঁর 'ইণ্ডো-সুমেরিয়ানস শিলস ডিসাইফারড' গ্রন্থে হরপ্পা শিলের লিখন রীতির সঙ্গে প্রাচীন সুমেরিয় লিখন রীতির সাদৃশ্য নির্ণয় করেন। স্যার জন মার্শালের 'মহেঞ্জোদাড়ো' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে সি. জে. গাড লিখেছিলেন, সিন্ধু সভ্যতার শিলমোহরগুলির লিখন পদ্ধতি (১) ডান দিক থেকে বামদিকে পঠনীয়। (২) লেখা সিলেবেল-ঘটিত। এই পুস্তকের আর একটি অধ্যায়ে এস. ল্যাংডন মত প্রকাশ করেন যে সিন্ধুলিপি পরবর্তীকালের ব্রাহ্মী লিপির জনক। গবেষক অতুল সুর ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে গুলাউমের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মঁসিয়ে গুলাউম লক্ষ্য করেছিলেন যে মহেঞ্জোদাড়োর প্রাপ্ত শিলের উপর লিখিত ৩০০ চিহ্নের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের ইষ্টার দ্বীপে প্রাপ্ত ১৮০টি লিপির সাদৃশ্য আছে। সাম্প্রতিকালে সিন্ধুলিপির উপর গবেষণা করেছেন ইরাবথম মহাদেবন, ফিনল্যাণ্ডের আসকো পারপোলা এবং রাশিয়ার লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিকিতা গুরোব। কিন্তু সিন্ধু লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি।

ভারতে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন স্থানে। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মহম্মদ রফিক মুঘল সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। এগুলি হল মুন্ড্রা, নবিনাল, মাড়েভা, টোডিও, নলিয়া, আজর, কোটাডা, বুজ, ভাদলি, নাকটাবনা,

দেশলপুর, নরপা, ভাদা ভিগোডি, লাখাপট, লুনা, বন্নি, কোটারা, নেনু-নি-ধর, কোটাডি, মরুও, কেরসি, সুরকোটাডা, সেলারি, রূপার, পাবুনাথ, লাখাপার, কণ্ঠকোট, খারিকা-ডাণ্ডা, পীরওয়াদা খেতর. ঝাঙ্গব, ফলা, লাখাবায়াল, আমারা, গপ্, কিগুসারখেবা. সোমনাথ, কানজেটার, বেনিয়া বাদার, রোজড়ি, আড়কোট, ভীমপটল, বাবরকোট, রঙপুব, চাচানা, মথুরা, গণি, পানসিনা, লোখাল, কোঠ, নানা সুতারিয়া, মেহগাম, টেলড, ভগৎরাও, ঘারো-ভিরো, কালিবঙ্গান, আমিলানো, পীরশাহ জুরিও, মেলবাজার, গথ হাসান আলি, বালাকোট, গুজো, সোটকা, ডাশট, সুট-কাজেন-ডোর, শাহজো, করচাত, ঢাল, আমরি, চানুধারো, খগগর ডামববুবি, গোরাণ্ডি, গাজী শাহ, লোহরি, আলি মুরাদ, পাণ্ডি ওয়াহি, লহুম জোদাবো, জুডিরজো-দারো, পাঠানি, গাণ্ড ডামব, কিরতা, কোয়েটা মিরি, কাওনরি, ডাবর কোট, পেরিয়ানো খণ্ডাই, রহমন ধেরি, গুমলা, কাটপালোন, নগর, বরা, বিকানীর, চানহুদরো, কোটাসুর, বৈনিওয়াল, আলমগীরপুর, মহেঞ্জোদাড়ো, কোটদিজি, হরপ্পা, ঢাক পুরবানে সইয়াল, ঝুকর, নার-ওয়ারোদারো।

সিন্ধু সভ্যতা থেকে পাওয়া গেছে ছুরির ফলা, পাথরের চাকতি, পুঁতি, পোড়ামাটি ও পাথরের দ্রব্যাদি, মৃৎপাত্র, তামার চুড়ি ও বালা, খেলনা গাড়ি ও তাম্র নির্মিত কুঠার। হরপ্পা সভ্যতাতে মূল্যবান অলংকারও আবিষ্কৃত হয়েছে। সবুজ বলের পাথর, নীলকান্তমণির অলংকার, সোনার ফলা ও আর্মলেট, কানের মাকড়ি, গলার হার, কোমরের মেখলা এখানে পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গেছে তামার তৈরী কুঠার, বর্শা ও বাঁশি। মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া গেছে একটি ব্রোঞ্জের নর্তকী মূর্তি। এ থেকে সিন্ধু সভ্যতা অধিবাসীদের বিনোদনের বিষয়টিও অনুমান করা যায়।

ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার বিস্ময়কর। ছোট ওজনের বাটখারার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট একককে ভিত্তিমান ধরে ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ গুণ ওজনের বাটখারা তৈরি করা হত। ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১১০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০, ১২৮০০ গুণ বাটখারার ক্ষেত্রে এককের মান ছিল ০.৮৫৬৫ গ্রাম। বাটখারাগুলি সঠিক সমান ওজনের ছিল এবং ওজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাটখারা তৈরী হয়েছে দশমিক হিসাবে। দু'টি গুণিতক শ্রেণীর প্রথমটি ছিল ০.০৫, ০.১, ০.২, ০.৫, ১, ২, ৫, ১০, ২০ ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০। হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন স্থানে যে সকল মানদণ্ড বা স্কেল পাওয়া গেছে, তার দশমিক ভাগ ছিল ১.৩২ ইঞ্চি, স্কেলটিব দৈর্ঘ্য ছিল

১৩.২ ইঞ্চি। আর একটি দৈর্ঘ মাপার জন্য একটি ব্রোঞ্জের মানদণ্ড তারা ব্যবহার করত। সেটি দৈর্ঘ্যে ছিল ২০.৭ ইঞ্চি। এই মাপদণ্ডের ০.৩৬৭ ইঞ্চি দূরত্ব অন্তর দাগ কাটা ছিল। হরপ্পা সভ্যতার যতগুলি মাপদণ্ড বা স্কেল পাওয়া গেছে তাদের দৈর্ঘ্য ও মাত্রাঙ্কন ছিল সমান। এই স্কেলগুলি পশ্চিম এশিয়া ও মিশরেও পাওয়া গেছে।

সিন্ধু সভ্যতায় গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যামিতির চর্চা ছিল। ধাতু (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) রেখা-দাগ দ্বারা সংখ্যা গণনার রীতি ছিল। পরবর্তীকালে মারাঠী ও ব্রাহ্মী লিপি প্রণালীতে এরূপ দাগ দ্বারা সংখ্যা নির্ণয় হত। হরপ্পা সভ্যতায় রাস্তাঘাট নির্মাণের সমান্তরালতা এবং কোণসমূহ থেকে বোঝা যায় তাদের জ্যামিতিক জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। মৃৎশিল্প, অস্ত্রশস্ত্র, কুঠার, প্রভৃতির অন্তবর্তী সামঞ্জস্যও তাদের জ্যামিতিক জ্ঞান নির্দেশ করে। বৃত্তাঙ্কন যন্ত্রও ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন সামগ্রীর উপর বৃত্তাকার রেখাসমূহ থেকে তা প্রমাণিত হয়।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি

বীরভূম জেলার বোলপুরের অদূরেই ইলামবাজারের নিকটবর্তী অজয় তীরবর্তী পাণ্ডুরাজার ঢিবি। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে এখানে প্রত্নাশ্মীয়পর্বসুলভ অশ্মীভূত কাঠের এবং স্ফটিকে নির্মিত বহুসংখ্যক কারুখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। দামোদর তীরবর্তী বীরভানপুরে উৎখননের ফলে অসংখ্য স্ফটিক ও গুঁড়ো পাথরের নির্মিত ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকগণের মতে রাঢ় এবং পুণ্ড্রদেশে তাম্রশ্মীয় কালে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। এই পর্বের সভ্যতায় পাথর ছাড়াও তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়েছিল। পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রথম স্তরে পাওয়া গেছে নানা রকমের ভগ্ন মৃৎপাত্র। পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় স্তরের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র, চিত্রিত লাল এবং কৃষ্ণ-লোহিত ভগ্ন মৃৎপাত্র, জলনালীযুক্ত মৃৎজলপাত্র, তামার তৈরী নানা অলঙ্কার যেমন বালা, আংটি, কাজল লাগাবার কাঠি, মাছ ধরবার বড়শি ইত্যাদি। মৃৎপাত্রগুলির আকৃতি-প্রকৃতি, অলংকরণ এবং তামার ব্যবহার নিঃসন্দেহে তাম্রাশ্মীয় কাল-কে চিহ্নিত করে। এই স্তরে বাস্তুনির্মাণের উন্নত নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে একটি শব-সমাধি স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমাধি থেকে প্রাপ্ত কাঠকয়লা তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক পরীক্ষা করে

যে তারিখ নির্ণিত হয়েছে তা খ্রীষ্টপূর্ব ১২১০±১২০ বছর কম বা বেশী অর্থাৎ ১২১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী সময়। উৎখননের তৃতীয় স্তরে পাওয়া গেছে জলনালীযুক্ত মৃৎপাত্র, একপদী মৃৎভাণ্ড, বিভিন্ন আকৃতির চিত্রিত লোহিত, কৃষ্ণ-লোহিত ভগ্ন মৃৎপাত্র, তামার অলঙ্কার, ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি। তাছাড়া পশুর হাড় ও শিং-এর তৈরী জিনিসপত্র এই স্তরে পাওয়া গেছে। তৃতীয় স্তরে পাওয়া গেছে পোড়া মাটির তৈরী একটি নারী এবং দু'টি পুরুষ মূর্তির ভগ্নাংশ। এই স্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল লৌহনির্মিত ফলা, তীক্ষ্ণাগ্র সূচ এবং অন্যান্য অস্ত্র যথা তীক্ষ্ণ মুখ তরোয়াল, তীরের তীক্ষ্ণ শিরাগ্র। সম্ভবত এই স্তরে বহিরাগত কোন জনগোষ্ঠী এখানে এসেছিল যারা লৌহের ব্যবহার জানত। এই স্তরের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী। চতুর্থ স্তরে পাওয়া গেছে ত্রিকোণাকৃতি পোড়ামাটির বাটি, মৃৎভাণ্ড, লাল রঙের মৃৎপাত্র, নকশাযুক্ত মৃৎভাণ্ড, পোড়ামাটির নারীমূর্তি। এই স্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল কালো Steatite পাথরের একটি গোলাকার শিলমোহর। শিলমোহরটির উপর তিনটি ভাগে বিভক্ত তিনটি Relief চিত্র। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, শিলমোহরটির উৎস প্রাচীন মিনোয়া সংস্কৃতি। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই শিলমোহর এবং কয়েকটি মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য তমলুকে প্রাপ্ত মৃৎভাণ্ডের ভগ্নাবশেষ, চব্বিশ পরগণা জেলার হরিনারায়ণপুর এবং চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত শিলমোহর এবং মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে মিল আছে। প্রাচীন মিশরীয় এবং ক্রীটীয় সভ্যতাতে অনুরূপ শিলমোহর ও মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকগণের মতে, সমকালীন সময়ে পূর্ব ভারতের সঙ্গে মিশরীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি ছাড়াও তাম্রশ্মীয় নবাশ্মীয় পর্বের প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে মঙ্গলকোট, কীর্ণাহার, নান্নুর, সুরথরাজার ঢিবি উৎখননে। এই সভ্যতাগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, এগুলির সময়কাল ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এই সময়ে উন্নততর গ্রাম সমাজ সংগঠন ও বিস্তৃততর কৃষির সূচনা হয়েছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির সমকালীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে মহাস্থানগড়ে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে।

দেউলপোতা

ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী দেউলপোতা ঢিবি উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে অতি প্রাচীন যুগের অসাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। পাথরের ক্ষুদ্রাস্ত্র ও তার শল্কছেদই অধিক পাওয়া গেছে। ক্ষুদ্রায়ুধগুলির বৈচিত্র্যময়তা উল্লেখযোগ্য। দেউলপোতা থেকে চাঁচনি, সূচাগ্র তিরের ফলা, ছুরি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এছাড়া পাওয়া গেছে কালো চার্ট (সিলিসিয়াস পাথর), ফ্লিন্ট (সাদাটে-ধূসর বর্ণ), চ্যালসিডনি (স্বচ্ছ, লাল আভাযুক্ত পাথরে তৈরী) আয়ুধ। আয়ুধগুলি ধারালো। সূচ্যগ্র তিরের ফলা শরের অগ্রে যুক্ত করে প্রাগৈতিহাসিককালের এই জনগোষ্ঠী পশুশিকারের তির হিসাবে ব্যবহার করত। এছাড়া একটি ঈষৎ বড় মসৃণ পাথরের কুঠারের মত হাতিয়ার পাওয়া গেছে। আয়ুধটি চওড়া ও ধারালো। দীর্ঘকাল মাটির ভিতর থাকার ফলে প্রস্তরায়ুধের গায়ে কালচে হালকা বাদামি আভাযুক্ত প্যাটিনা দেখা যায়। এছাড়া প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন রকমের পুঁতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

দেউলপোতায় তাম্রনির্মিত কতকগুলি আশ্চর্যজনক মাদুলির প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। মাদুলিগুলি গোবরে পোকার আকৃতির। মিশরীয় স্কারাব মাদুলির সঙ্গে এই মাদুলিগুলির সাদৃশ্য দেখা যায়। তাছাড়া দেউলপোতা থেকে তামার তৈরী কাজলকাঠি ও ক্ষুদ্রাকৃতি জাহাজের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। দেউলপোতা থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে বিভিন্ন পরিমাপের লিপিযুক্ত শিলমোহর, বিভিন্ন রঙের মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি ও তাম্রমুদ্রা উল্লেখযোগ্য।

দেউলপোতায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিশ্লেষণ করে প্রমাণিত হয় এই স্থানে নব্যপ্রস্তরীয় কালে মানুষের সভ্যতার সূচনা হয়েছিল এবং তাম্রশ্মীয় কালে তা সুসংহত রূপ লাভ করেছিল।

হরিনারায়ণপুর

ডায়মণ্ডহারবারের দক্ষিণে কুলপি থানার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। এখান থেকে পাওয়া গেছে চপার, বড় নোড়া, ছোট সেল্ট, পাথরের হাতুড়ি, বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রায়ুধ। এই ক্ষুদ্রায়ুধগুলি চার্ট, জেসপার, ফ্লিন্ট পাথরে তৈরী। এছাড়া পাওয়া গেছে একাধিক মসৃণ সেল্ট ও নোড়া। এগুলি কালো ব্যাসল্ট এবং ঈষৎ সবুজ কঠিন

লিস পাথরখণ্ডে তৈরী। বেলনাকার নোড়াগুলির মধ্যে একটি ঈষৎ ধূসর (৪.৫ X ৪.০ সেমি.), একটি কালো পাথরের, চ্যাপ্টা (৭.৫ X ৪.৪ সেমি.), একটি লোহিত কালো, দুই প্রান্তে ভাঙা ছোট ছোট চিহ্নযুক্ত (১৬.০ X ৪.৫ সেমি.), একটি ধূসর কালো পাথরের দু'প্রান্ত সমান গোলাকার (১৬.৫ X ৪.৪ সেমি)। ত্রিভুজাকার সেল্টগুলির মধ্যে একটি (৩.৫ X ৩.০ সেমি.) ধূসর, ধারাল প্রান্ত সরল, একটি (৫.০ X ৩.৮ সেমি.) ধূসরাভ, ধারালো প্রান্তের একদিক সরল, অপর দিক বাঁকা, পূর্বতলের একাংশ ভাঙা, একটি (৪.০ X ৩.৫ সেমি.) ধূসরাভ, ধারালো প্রান্ত একদিক সরল। ত্রিভুজাকার সেল্টগুলি যথেষ্ট মসৃণ। এই সেল্টগুলি রূপনারায়ণ নদের তীরে তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে আবিষ্কৃত সেল্টের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর পূর্বেকার। হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত মসৃণ ছোট সেল্টগুলি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এগুলি নবাশ্মীয় যুগ অথবা আদি ঐতিহাসিক যুগের। ক্ষুদ্রাকার সেল্টগুলি কাঠে রেঁদা দেবার ছেনি অথবা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হত। হরিনারায়ণপুরে ঝুড়িছাপ যুক্ত হাতে গড়া মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া হাড়ের তৈরী সুঁচ, ব্রোঞ্জনির্মিত মাদুলি, একটি আয়তাকার মৃৎখণ্ডে পরস্পর মুখোমুখি দু'টি পাখি, একটি হরিণের প্রতিমূর্তি এবং একটি গোলাকার শিলে দণ্ডায়মান মানুষের প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। গবেষক সুশীল ভট্টাচার্যের মতে, হরিনারায়ণপুর ছিল খ্রীষ্টপূর্বকালের প্রাচীন বন্দর। হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে প্রমাণিত হয়, এখানে মানব সভ্যতার সূচনাপর্ব ছিল নবাশ্মীয় যুগে এবং তাম্রশ্মীয় কালে এই সভ্যতা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছিল। হরিনারায়ণপুরে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তুর সঙ্গে আদি ঐতিহাসিককালের মূল্যবান পুঁথিদানা, মাটির পাত্র ও বিভিন্ন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর দেবব্রত ঘোষ লিখেছিলেন, The lower Bengal region was in ancient times doted with a chain of cities and ports from the west of Tamralipta to the east upto Chandraketugarh. হরিনারায়ণপুর থেকে খ্রীষ্টপূর্বকালের মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের শিলমোহর ও রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত একটি তামার ঢালাই করা মুদ্রার উপর তোরণ মুদ্রিত হয়েছে। এই তোরণের গঠন বিন্যাস মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের। আবার এখান থেকে প্রাপ্ত তামা মেশানো রূপার মুদ্রায় জাহাজের প্রতীক পাওয়া গেছে, যা প্রাচীনকালেব নৌ-বাণিজ্যের বিষয়টি প্রমাণিত করে।

পুণ্ড্রদেশ ও তার সভ্যতার বিকাশ

পণ্ডিতগণের মতে, সিন্ধুসভ্যতার প্রায় সমসাময়িক পর্বে পূর্বভারতে পুণ্ড্রদেশ এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন সাহেব সর্বপ্রথম এই সভ্যতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। মহাস্থানগড়কে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরীরূপে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করেন আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম। বাংলাদেশের বগুড়া শহর থেকে সাত মাইল দূরবর্তী প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের রাজধানী মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে মহাস্থানগড়ের অবস্থান। ছয় মাইল দীর্ঘ পরিধির প্রাচীর বেষ্টিত যে গড়টি দেখতে পাওয়া যায়, খনন করে দেখা গেছে, এর উপর ভাগের মাটি থেকে ২৫ ফুট নীচে আসল অকর্ষিত মাটি রয়েছে এবং এই ২৫ ফুট মাটির মধ্যে ১৭টি নির্মাণস্তর পরিলক্ষিত হয়েছে। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিটি পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। লিপিটি প্রাকৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ। এটি পুণ্ড্র-রাঢ়-বঙ্গের প্রাচীনতম শিলালিপি। এই শিলালিপিতে পুডনগল শব্দটি উল্লিখিত আছে। পুডনগল শব্দটি প্রাকৃত। সংস্কৃত ভাষায় এটি পুণ্ড্রনগর। মহাস্থানগড়ে খননকার্যের ফলে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে মানকালীর কুণ্ড, পাথরভিটা, পরশুরামের প্রাসাদ, জীয়ৎ কুণ্ড, শীলাদেবীর ঘাট উল্লেখযোগ্য। এছাড়া খননকার্যের ফলে বিভিন্ন স্তরে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির চিত্রফলক, অলংকৃত ইট, প্রস্তরনির্মিত দ্রব্য, ব্রোঞ্জ, তামা ও অন্যান্য ধাতুর তৈরী জিনিসপত্র, ক্ষেপণীয় বল ও কড়ি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ছাঁচে ঢালাই ছাপযুক্ত গোলাকার ও চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলি বিশেষ মূল্যবান।

পৌণ্ড্রসভ্যতার বিকাশ প্রায় সমগ্র পুণ্ড্র-রাঢ়-বঙ্গে বিস্তারলাভ করেছিল। দক্ষিণবঙ্গে এই সভ্যতার নিদর্শন চন্দ্রকেতুগড়। বিগত কয়েক দশক এই স্থানটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে সর্বপ্রথম পুরাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ইস্টার্ণ সার্কেলের সুপারিনটেনডেন্ট মি. লঙ হার্স্ট বেড়াচাঁপায় এসেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ...he mentions that he found fair large size bricks

15 inch. long by 11 inch. broad and moulded bricks and pottery assignable to an early period. The find of six rectangular copper cast coins in the neighbourhood...Further shows that this was one of the earliest settlement of lower Bengal. ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে বার্ষিক বসুমতীতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব-দ্বীপে মনুষ্য বসবাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিংহ, নোয়াখালি ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব-দ্বীপের মধ্যে যতগুলি পুরাতন স্থান আছে, সে সকলের মধ্যে ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই স্থানটি ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম। বিনয় ঘোষের মতে, চন্দ্রকেতুগড়ের সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল মৌর্যকালের পূর্বেই। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধানে চন্দ্রকেতুগড়ে খননকার্যের ফলে অসাধারণ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। এই সকল নিদর্শনগুলির মধ্যে ছাই রঙের এবং লাল রঙের চক্রনির্মিত (Wheel Turned) নানা আকৃতির মৃৎপাত্র, হাতে তৈরী তুষ এবং গাছের ছালের আঁশ (Fibre) মেশানো বৃহদাকার পাত্র, সূর্য, চন্দ্র, বৃত্ত ইত্যাদি ছাপযুক্ত, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর মূর্তি অঙ্কিত (Emboss) বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র, রোমক গোষ্ঠীর (Origin) রুলেটেড নক্সাযুক্ত থালা, মদ্যভাণ্ড, পানপাত্র (নলযুক্ত ও নলছাড়া) উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকেতুগড়ে পাওযা গেছে বিভিন্ন পোড়ামাটির মূর্তি (Teracotta plaque, solid rattle)। মূর্তিগুলির মধ্যে যক্ষিণী মূর্তিতে কেশচর্চার দিকটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মূর্তিটির মাথার চুলে ছিল পঞ্চচূড় (চুলের কাঁটা), স্বর্ণপট, (সিঁথির পাটি), বেণি (বিনুণি), মাথার চুলে জালের ব্যবহার (Hair net কড়ি সাজানো। মূর্তিগুলির পরনে দুকুল, কণ্ঠে মণিহার। দেবিকা, মাতৃকা, নর্তকী, প্রেমিকা প্রভৃতি নারী মূর্তিগুলি শিল্প সুষমার অনুপম। পুরুষ মূর্তিগুলির মধ্যে অশ্বারোহী পুরুষ, বীরোচিত বেশে পুরুষ মূর্তি, হস্তীরহী অঙ্কুশধারী মাহুত, কুবের, মেষবাহন অগ্নি, চতুরশ্বচালিত রথে সূর্য, রথারূঢ় যক্ষমূর্তি, প্রেমিকা নারী, শুকপাখি আদরেরতা নারী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু মূর্তিতে গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় শিল্পশ্রেণীর প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রীসদেশীয় ঘাগরা পরিহিত নর্তকী, রোমান পোষাক পরিহিত যোদ্ধা কিংবা নারীমূর্তির মাথার সজ্জায় মিশরীয় শিল্প প্রভাব পরিলক্ষিত।

চন্দ্রকেতুগড়ে পাথরের মসৃণ গোলাকৃতি থাম, বিভিন্ন প্রকারের বর্ণাঢ্য পুঁতি পাওয়া গেছে। গোলাকৃতি পাথরের থামের মসৃণতা মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়কার স্তম্ভগাত্রে পালিশের অনুরূপ। প্রস্তর শিল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের একটি অনুপম বুদ্ধমূর্তি এবং কালো পাথরে খোদাই করা একটি প্রস্তর ফলক (ষষ্ঠ শতক)।

চন্দ্রকতেুগড়ে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য জিনিসপত্রগুলির মধ্যে হাতির দাঁতের পাশা, অলংকৃত সুতাকাট তকলিয়া চাকা ও দণ্ড, মৃৎফলকে নকশা করার উপযোগী ছুরি, পুতল তৈরীর ছাঁচ, পোড়ামাটির গাত্রে ব্রাহ্মী হরফে লেখা অথবা চিত্রলেখ (Pictograph), শিলমোহর, কুষাণ যুগের তাম্রমুদ্রা এবং গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রাগুলি। এছাড়া খননকার্যের ফলে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির বেড়িযুক্ত পাতকুয়া (Ring well), ইটের গাঁথুনির পাকা পাতকুয়া এবং বিভিন্ন পাথরের অলংকার। এই পাথরগুলির মধ্যে এ্যাগেট, ব্যাণ্ডেট এ্যাগেট, স্ফটিক, জ্যাস্পার এবং সবুজ, কালো, নীলাভ, হরিদ্রাভ বর্ণের পাথরগুলি অতুলনীয়। রুবি, পোকরাজ ও হস্তীদন্ত নির্মিত শিল্পবস্তুগুলি বিস্ময়কর।

পুণ্ড্রদেশের অন্যতম সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল কোটিবর্ষ (বানগড়)। হেমচন্দ্র তার 'অভিধান চিন্তামণি' গ্রন্থে লিখেছেন, কোটিবর্ষ নগর বিভিন্ন সময়কালে বানপুর, শোনিতপুর, দেবীকোট, উমাবন প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়েছে। কোটিবর্ষের সমৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রাচীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরগুলির সমমানের। ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থাদিতে 'কোটিবর্ষং নগরম্' নামোল্লেখ আছে। 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ শোনিতপুর (কোটিবর্ষ) রাজকন্যা উষার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হলে শোণিতপুর রাজ বান অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন। ফলে দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ নিজ পৌত্রকে উদ্ধারের জন্য শোনিতপুর (কোটিবর্ষ) আক্রমণ করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ রাজা বানকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। অবশেষে অনিরুদ্ধ ও উষার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ঐতিহাসিককালে কোটিবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন গ্রন্থাদিতে। পূর্ব ভারতে জৈনদের চারটি শাখার অন্যতম শাখা ছিল কোডিবর্ষীয়া। 'বৃহৎকথাকোষ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু জৈন ধর্মাবলম্বী ভদ্রবাহু পুণ্ড্রবর্ধনের দেবকোট নগরে (কোটিবর্ষ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোটিবর্ষ ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি সর্বপ্রধান বিষয় এবং অন্যতম শাসনকেন্দ্র। এই নগরের অস্তিত্ব পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনায় কোটিবর্ষের অসাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতকে মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় দীব্‌কোট—দীওকোটের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দিনাজপুরের বানগড়ে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

গৌড়-পাণ্ডুয়া জনপদও পুণ্ড্রদেশের এক প্রাচীন জনপদ। পাণিনির রচনায় গৌড়ের উল্লেখ আছে। গৌড়ের উল্লেখ আছে পতঞ্জলির রচনাতেও। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্রদেশের কৃষি ও শিল্পের উলেখ আছে। গৌড় শব্দের উৎপত্তিও কৃষিজাত গুড় থেকে। এই অঞ্চলে পুঁড় নামক এক প্রকার আখের চাষ প্রচুর পরিমাণে হত। এই আখের গুড় ছিল খুবই উৎকৃষ্টমানের। পুঁড় থেকে পুঁড়ো শব্দের উৎপত্তি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সমুদ্রতীর হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহুসংখ্যক পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পুঁড়া শব্দটি পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দ তাহাই বোধ হয়। অতএব এই পুঁড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে পৌণ্ড্রদিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা হয়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। ঢাকা, বিক্রমপুর অঞ্চলকেই 'বঙ্গদেশ' বলে। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদেশে আসিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজধানীর নাম পৌণ্ড্রবর্ধন। জেনারেল ক্যানিংহাম বলেন, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন। বোধ হয় মালদহের অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ডুয়াই যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন, এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে। 'ত্রিকাণ্ডকোষ' গ্রন্থে গৌড় যে পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

পুণ্ড্রদেশ ও তার সভ্যতার বিকাশ যে আসমুদ্র বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রের পথনির্দেশিকা' (পেরিপ্লাস টেস্‌ ইরিথ্রাস থালাস্‌সেস) গ্রন্থে। এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশর থেকে সমুদ্রপথে এদেশে এসেছিলেন। তার ভ্রমণ বিবরণীতে গঙ্গা জনপদ, গঙ্গা নদী এবং গঙ্গা নামে বাণিজ্য নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। After there, the course turns toward the east again and sailing with the ocean to the right and the short remaining beyond to the left, Ganges comes into view, and near it the very last land towards the east, chryse. There is a river near it called the Ganges, on its bank there is a markct town which has the same name as the river Ganges. ভারতীয় সাহিত্যেও গঙ্গা শব্দ পাণিনি,

পতঞ্জলির লেখায় পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈয়াকরণদের লেখায় 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' অর্থাৎ গাঙ্গেয় ভূমি অর্থে 'গঙ্গা' শব্দেব প্রয়োগ উল্লিখিত আছে। তৃতীয় কৃষ্ণের অনুশাসনে (৮৮০ শকাব্দ) 'গঙ্গা' জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বারস্থাংগ কলিঙ্গ, গঙ্গা, মগধৈরভ্যর্চিতাঞ্জশ্চিরং। গ্রীক এবং রোমান ঐতিহাসিকগণ নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসকারী জনজাতিকে গঙ্গারিডি জনজাতি নামে উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িককালের রামায়ণে গাঙ্গেয় নিম্নভূমি রসাতল বা পাতাল নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতেও সমুদ্রকূলবর্তী সমৃদ্ধশালী জনজাতির উল্লেখ আছে। রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে এই জনজাতি ভীমসেনকে প্রবাল, মুক্তা, কাঞ্চন, অগুরু বস্ত্র (অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র) উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেছিল। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও গঙ্গানগরের প্রবাল, মুক্তা, কলতিস (কেলিত) স্বর্ণমুদ্রা, গাঙ্গেয় মসলিনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

টলেমির আন্তগাঙ্গেয় ভারতের মানচিত্রে গাঙ্গেয় নিম্নভূমি অঞ্চলে চারটি নগরের উলেখ আছে। এই চারটি নগর পালুরা (Palura), তিলোগ্রাম্মাম (Tilogrammum) গঙ্গে (Gange), আগ্‌গা (Agga)। পালুরা এবং তিলোগ্রাম্মাম ছিল সমুদ্রবন্দর। গঙ্গে এবং আগ্‌গা সমুদ্র-উপকূলবর্তী গাঙ্গেয় বন্দর। টলেমির মানচিত্রে Asthgura বা Astagura নামক একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণের মতে, আদি গঙ্গার তীরবর্তী বর্তমান আটঘরা টলেমি বর্ণিত আস্থাগুরা। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর স্টেশনের ৩ কিলোমিটার পূর্বে আটঘরায় (আস্তাগুরা) দমদমার ঢিবি উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব যুগের সভ্যতা। আটঘরা থেকে পাওয়া গেছে শিলমোহর, প্রস্তরনির্মিত মূর্তি, পোড়ামাটির মূর্তি, তাম্রমুদ্রা, মৃৎপাত্র। আটঘরায় ৩.৮৫ মিটার উৎখননে ১১টি স্তর পরিলক্ষিত হয়। এই সকল স্তর থেকে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির অলংকার, পোড়ামাটির টালি, ভগ্ন মৃৎপাত্র, মাছের জাল নিমজ্জনের জন্য পোড়া মাটির ছিদ্রযুক্ত গোলক (Net Sinker), লৌহ ফলা, লৌহ নির্মিত মল, বিভিন্ন পরিধি বিশিষ্ট কালো রঙের বয়াম (Jar), ভাণ্ড, পোড়ামাটির ভগ্ন নারীমূর্তি, পোড়ামাটি ও পাথরের পুঁতিদানা, হাড়ের তৈরী কীলক (Nail), মিশ্র রঙের মৃৎপাত্র (ভিতরে কালো, বাইরে লাল), পোড়ামাটির মিথুন ফলক, পোড়মাটির ভগ্ন জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, পোড়ামাটির ইট (১০ সেমি x ৮.৫ সেমি), নলযুক্ত লালরঙের বড় মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির হুঁকা। আটঘরা উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে ইঁটের দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ। এছাড়া পাওয়া গেছে মেষবাহন অগ্নি দেবতা,

গৌতমবুদ্ধ, যক্ষ-যক্ষিণী, মাতৃকা মূর্তি, ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ ফলক, অস্থি আয়ুধ। এগুলি অধিকাংশই মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্যামচাঁদ আটঘরা প্রসঙ্গে লিখেছেন, A Flourishing civilisation dating back to more than 2000 years, existed at Atghora village and its adjoining area of Baruipur in South 24 Pargans.

আগ্গা নগরের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে টলেমি তিলোগ্রাম্মাম নামে এক সমুদ্র বন্দরের উল্লেখ করেছেন। তিলোগ্রাম্মাম একটি প্রাচীন সমুদ্র বন্দর। গ্রীক নাবিক টলেমির অন্তর্গাঙ্গেয় মানচিত্রে উল্লেখ আছে, গঙ্গার তৃতীয় ও চতুর্থ মুখের মাঝখানে তিলোগ্রাম্মাম বন্দরের অবস্থিতি। উক্ত মানচিত্রে তিলোগ্রাম্মামের উপরে আগ্গা (Agga) বা আস্তাগুরা (Astagura) অবস্থিত। তিলোগ্রাম্মাম বন্দরের অবস্থিতি ছিল বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত তিলপিতে। তিলপিতে সাম্প্রতিক কালে খননকার্যের যে সকল প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জাহাজ বাঁধার লোহার শিকল, জলনিকাশী পাইপ, বিভিন্ন আকৃতির মৃৎপাত্র, বিদেশী পোষাক পরিহিত মূর্তি। এই মূর্তিগুলিতে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে পাওয়া গেছে বেলে পাথরের আসন চৌকি, একটি স্ফটিক স্বচ্ছ পাথরের আসনচৌকি (৪৩ সেমি—২১ সেমি)। মাটির উপরিভাগ থেকে দশ-বারো ফুট গভীরে পাওয়া গেছে অট্টালিকার ছাদ বা মেঝের ধ্বংসাবশেষ। (২৭ সেমি—২৬ সেমি—৩ সেমি আয়তন বিশিষ্ট টালি)। এই টালিগুলির উপর ৬ ইঞ্চি পুরু সুরকি। পোড়ামাটির জলনিকাশী পাইপ। এগুলির একদিকের মুখ সরু, যাতে পরের পাইপটি জোড়া যায়। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, ইটের বাড়ি, প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ থেকে তিলপির প্রাচীন নগর সভ্যতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তিলপিতে পাওয়া গেছে ব্রাহ্মীলিপিতে খোদিত শিলমোহর। গোলাকার একটি শিলমোহরে এক বণিকের বাণিজ্যের প্রতীক একটি বটবৃক্ষের চারপাশে ব্রাহ্মী অক্ষর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আরও একটি সীলমোহর পাওয়া গেছে মাটির সাত ফুট গভীরে। ৩.৫ সেমি. ব্যাসবিশিষ্ট শিলমোহরটির লিপি ব্রাহ্মী লিপির অনুরূপ। শিলমোহরটি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের।

তিলপিতে ধাতু-প্রযুক্তির কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। ৮ ফুট মাটির গভীরে পাওয়া গেছে সারি সারি চুল্লি। তার আশেপাশে পাওয়া গেছে

ধাতুখণ্ড, ধাতুমল, তাম্রমুদ্রা, ব্রোঞ্জ জাতীয় গোলাকার মণ্ড। তিলপিতে পাওয়া গেছে টেরাকোটার ঘোড়া, মোরগ, খেলনা, হাতি, ছাগল ও কুকুরের মুখ। এখানে পাওয়া গেছে যক্ষিণী মূর্তি, বিভিন্ন অলংকার এবং টেরাকোটার ভাস্কর্যের নিদর্শন।

সাম্প্রতিককালে ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিলপির নিকটবর্তী ধোসায় খননকার্য শুরু হয়। ধোসায় পাওয়া গেছে ভগ্ন আবক্ষ বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধস্তুপের ধ্বংসাবশেষ। বিভিন্ন আকারের মৃৎপাত্র, প্রাকৃত ভাষায় লেখা লিপিযুক্ত ইট, বিভিন্ন টেরাকোটার মূর্তি যথা বীনাবদনরত রাজপুরুষ, নৃত্যরত সুন্দরী, লক্ষ্মীমূর্তি, শিলমোহর ও তাম্রমুদ্রা। অমল রায় 'A Preliminary Report on the excavation at Dhosa and Tilpi' তে লিখেছেন, A large number of antiquities have been found in course of excavation at Dhosa. Important antiquities are tiled-brick with inscription nibitasya in 2nd/3rd century brahmi terracotta sealing, terracotta figures including yakshi, terracotta plaque with the narration of joy, terracotta torso of a round figure, terracotta moulds ivory, bone points, beads of Semi-precious stones, iron objects, cast-copper coin, shell object, terracotta lamp and a piece of terracotta humped bull (4th/5th century A.D.)...the notable antiquity is a terracotta head of Buddha. বুদ্ধ মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর। প্রতিবেদন শেষে অমল রায় লিখেছেন, After serious consideration of the fact and the satisfactions with the antiquities and the potteries, it is ascertained that the habitational site at Tilpi was abandoned after 2nd/3rd century A.D., though the site at Dhosa was occupied continuously till 4th/5th century A.D.

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ এবং বিদেশী ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের রচনায় পুণ্ড্রদেশ ও জাতির উল্লেখ

পুরাণ ও ইতিহাসে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্র উভয় শব্দই জাতিবাচক ও দেশবাচকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্ধন যে একই জনপদ এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ নেই। পুণ্ড্র—পুণ্ড্রদেশবাচক, পুণ্ড্রবর্ধন ও পৌণ্ড্রবর্ধন—নগরবাচক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্রিক নাম পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাসই পূর্বভারতের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায়।

যে সকল ভারতীয় গ্রন্থসমূহে পুণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রজাতির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল— ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭/১৮; বৌধায়ণ স্মৃতি; সাংখ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র; মনুসংহিতা—১০/৪০-৪৪; রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০/৪৩, ৪১/১২; মহাভারত—আদিপর্ব ১০৪/৫৩/৫৫, ১২৩/২৯, ১৮৬/১৬, সভা পর্ব ১৪/২০, ৩০/২২, ৫২/১৬, ৩৪/১১, ৮৮/১৬, ৪/২৪/৫২/১৮, বনপর্ব ৫২/২২, ভীষ্মপর্ব ৩১/৩৪/৫৮, ১৬/৩, দ্রোণপর্ব ৪/১৮, ১০/১৫, কর্ণপর্ব ৮/১৮, ২২/২/২৪, অনুশাসনপর্ব ৩৫/১৭; হরিবংশ—১০/১১, হরিবংশ পর্ব ৩১/৩৪/৪২, ভবিষ্য পর্ব ৪৬/৫৬, ৯১/১, ৯২/১/৭, ৯৩/১/৬, ৯৭/২৫, ১০১/১, ২/১৮; বিষ্ণুপর্ব ৩৪/১৪, ৫৯/৪/৫৩৮; শ্রীমদ্ভাগবত—১০/৬৬, ১/২৩; দেবী ভাগবত ৭/৩০; বিষ্ণুপুরাণ—১৮/৪, ২/৩—১৫; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—৪৬/২৯, বায়ুপুরাণ—৯৯/৩৮/৫, ২/৩—১৫; স্কন্দপুরাণ—পৌণ্ড্রখণ্ড, করতোয়া মাহাত্ম্য, রেবাখণ্ড ২৯ অঃ, প্রভাস খণ্ড; গরুড় পুরাণ—৫৫/১৩, ৬৮/১৭—৮; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১/৪৮/৫৮, বামন পুরাণ ১৩/১৫; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১/৪৮/৫৮, সৌরপুরাণ ৪০ অঃ; মৎস্যপুরাণ ১১৩/৪৫; কল্কিপুরাণ; ভবিষ্যপুরাণ; পদ্মপুরাণ (উত্তরখণ্ড) ৫১ অঃ; যোগিনীতন্ত্র; তন্ত্রসার—১ম পরিচ্ছেদ; জ্ঞানার্ণবতন্ত্র; ভ্রামরীতন্ত্র; বৃহন্নীলতন্ত্র; ভারতনাট্য শাস্ত্র ১৬/৩২; পতঞ্জলী প্রণীত মহাভাষ্য ৪/২/৫২; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ১১ অঃ; বৃহৎ সংহিতা ৫/৭০, ৯/১৫, ১০/১৪, ১১/৫৮, ১৬/৩, ৫/৭৪/৮০, ১৪/৭; সি-উ-কি ১৪/৬৮, ১৬/৩, ৫/৭৪/৮, ১৪/৭; রাজতরঙ্গিণী; দিব্যাবদান; জৈন কল্পসূত্র; হর্ষচরিত;

রাজবলী কথা; মহাবংশ; সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত; কথাসরিৎসাগর; দশকুমার চরিত।

যে সকল বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকগণের রচনায় পুণ্ড্রদেশ ও জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন, যুয়ান-চোয়াঙ, তাং-সু, গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থেনিস, ডিওডোরাস সিকুলাস, রোমান কবি ভার্জিল, ভেলেরিয়াস ফ্লাক্কাস, ঐতিহাসিক প্লিনি, কাটিয়াস রিউফাস, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ ক্লডিয়াস টলেমিয়াস এবং পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সীর অজ্ঞাতনামা নাবিকও রয়েছেন।

স্কন্দপুরাণের করতোয়া মাহাত্ম্যে পুণ্ড্রনগর করতোয়া নদীর তীরে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং বৃহৎসংহিতায় পুণ্ড্রদেশকে ভারতের পূর্বাংশে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভবিষ্যপুরাণে পুণ্ড্রবর্ধনের সাতটি রাষ্ট্রীয় বিভাগের উল্লেখ আছে। এই সাতটি বিভাগ হল গৌড়, বরেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। দশকুমারচরিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মৈথিলীরাজ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিষাণবর্মাকে পুণ্ড্ররাজ্য আক্রমণের জন্য সৈন্য দিতে চান। রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে এক কাশ্মীরি রাজপুত্র ছদ্মবেশে কিছুদিন পুণ্ড্রনগরে বসবাস করেছিলেন।

মহাভারতীয় যুগে পৌণ্ড্র সম্রাট বাসুদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। ড. দীনেশ সেনের মতে, সম্রাট বাসুদেব (খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী) ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি নিজ বাহুবলে বঙ্গ ও কিরাতদেশ অধিকার করেছিলেন এবং বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সম্রাট বাসুদেব নিষাধরাজ একলব্য, প্রাগজ্যোতিষপুররাজে নরক এবং মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে একযোগে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। হরিবংশে উল্লেখ আছে পৌণ্ড্র সম্রাট বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদেশ ও জাতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 'অস্তান বঃ প্রজাভক্ষীষ্টেতি। ত এতে অন্ধাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মুতিবাঃ ইত্যুদন্ত্যাঃ বহবো ভবন্তি (৭/১৩-১৮)।' বাল্মিকী রামায়ণে পুণ্ড্র দেশনামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মমালান বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্ মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাং স্ত্যঙ্গাং স্তথৈব চ।'

চৈনিক লেখকদের মধ্যে পুণ্ড্রদেশ সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনা রাজদূত চাঙ-কিয়েন। তার লিখিত বিবরণে দক্ষিণ চীন থেকে ভারতবর্ষের গুজরাট পর্যন্ত একটি বাণিজ্যপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঙ-কিয়েন লিখেছেন, দক্ষিণ চীনের য়ুনান এবং সজেচোয়ান প্রদেশ থেকে একটি পথ উত্তরব্রহ্ম, মণিপুর, কামরূপ, পুণ্ড্রবর্ধন, কজঙ্গল, চম্পা, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র, বারাণসী, অযোধ্যা, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান-চোয়াঙ পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন। তার লিখিত বিবরণে জানা যায়, পুণ্ড্রদেশের সীমা ছিল ৪০০০ লি বা ৮০০ মাইল।

৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তার সমকালীন সময় থেকে গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণ পূর্বভারতের প্রাসী ও গঙ্গারিডি জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। গঙ্গারিডি শব্দের অর্থ গাঙ্গেয় জনগোষ্ঠী বা গাঙ্গেয় জাতি। তাদের রাজ্য ও দেশ অর্থেও শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, আচার্য সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিদগণ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

গঙ্গারিডি জাতি সম্পর্কে যে সকল গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় লেখক ও ঐতিহাসিকগণ লিখে গেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মেগাস্থেনিস (৩৫০-২৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। মৌর্য সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তিনি পাটলিপুত্রে গ্রীক দূত হিসাবে এসেছিলেন। তার লিখিত গ্রন্থের নাম 'ইণ্ডিকা'। এই গ্রন্থে তিনি গঙ্গারিডি দেশ ও জনজাতি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। রোমান কবি পুবলিয়াস ভার্জিলিয়াস মারো (৭০-১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) যিনি ভার্জিল নামেই সমাধিক পরিচিত তার 'জার্জিকাস' কাব্যে গঙ্গারিডি জাতির শৌর্য ও বীর্য সম্বন্ধে প্রসস্তিতে লিখে গেছেন, 'In foribus pugnam ex auro solidoque elephanto Gangaridum facium, Victorisque arma Quirini.'

ইংরাজী অনুবাদ—

'On the door will I represent
In solid gold and ivory
The battle of the Gangaridae
And the arms of our victorious Quirinius.'

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমান কবি ভেলেরিয়াস ফ্লাককাস তার 'অরগনটিকা' কাব্যে লিখেছেন, গঙ্গারিডি দেশের যোদ্ধারা ১৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকুলাস তার 'বিবলিওথিকা হিসটরিকা' নামে এক বিশ্ব ইতিহাসে গঙ্গারিডি জাতির কথা উল্লেখ করেন। সমসাময়িককালে রোমান ঐতিহাসিক কার্টিয়াস রিউফাস (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) তার 'দি ভারবাস গেস্টো আলেকজান্ড্রি ম্যাগনি' গ্রন্থে গঙ্গারিডি দেশ ও জাতির উল্লেখ করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ টলেমীর (প্রথম খ্রীষ্টাব্দ) 'ভূগোল' বিষয়ক গ্রন্থে এবং তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের লেখক গেইয়াস জুলিয়াস সলিনাসের 'পলিহিসটর' গ্রন্থে গঙ্গারিডি দেশ ও জনজাতির উল্লেখ আছে।

এই গঙ্গারিডি জনজাতি ছিল গাঙ্গেয় পুণ্ড্রদেশের অধিবাসীগণ। গ্রীক, রোমান ও মিশরীর লেখক ও ঐতিহাসিকদের সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই সকল মনীষীদের সময়কাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী। এই সময়কালেই রচিত হয়েছিল রামায়ণ, মহাভারত, জাতক, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পতঞ্জলীর মহাভাষ্য। এই সকল ভারতীয় গ্রন্থাদিতে সমকালীন সময়ে পূর্ব ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পুণ্ড্রদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতীয় যুগে পুণ্ড্রদেশ বঙ্গ ও কিরাত দেশ জয় করে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। গ্রীক ও রোমান লেখকগণের রচনায় পুণ্ড্রদেশ গঙ্গারিডি দেশ নামে অভিহিত হয়েছে।

পৌণ্ড্রজাতির আদি বাসভূমি

পৌণ্ড্রজাতির আদি বাসভূমি কোথায় ছিল? অনেকে মনে করেন, দাক্ষিণাত্যে পৌণ্ড্রদের বসবাস ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। পুরাণে আছে, মহারাজ পুরুর বংশীয় ভরত দাক্ষিণাত্যের অনার্য পৌণ্ড্রকদিগকে জয় করেছিলেন। রামায়ণে উল্লেখ আছে, সুগ্রীব সীতান্বেষণার্থে অঙ্গদ, সুষেণ প্রভৃতিকে দক্ষিণস্থ গোদাবরী তীরবর্তী পুণ্ড্র, কেরলাদি প্রদেশে গমন করতে উপদেশ প্রদান করছেন।

'নদীং গোদাবরী চৈব সর্ব্বমেবানুপশ্যতঃ।
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ চোলান পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান।।'

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ অ ১২)

এতদ্বারা জানা যায়, গোদাবরী নদীতীরে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, কোল, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি দেশ ছিল।

বিষ্ণুপুরাণে দাক্ষিণাত্যবাসী পুণ্ড্রের কথা বলা হয়েছে।

'পুণ্ড্র ঃ কলিঙ্গামগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ।'

(বিষ্ণু ২/৩/১৫)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৫৭ অধ্যায়ে দাক্ষিণাত্যবাসী পুণ্ড্রের কথা উল্লেখ আছে।

'পুণ্ড্রাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গুলা স্তথৈবচ।।'

মহাভারতে দাক্ষিণাত্যবাসী পুণ্ড্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

'পৌণ্ড্রান্ কিরতান্ যবনান্ সিংহলাম্ বর্ব্বরাণ্ খসান্।
চিবুকাচ্চ পুলিন্দাশ্চ চীনান হুনান সকেরলান।।'

(আদিপর্ব, ১৭৬ অধ্যায়)

'পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্বশঃ।'

(শান্তিপর্ব ৬৫শ অধ্যায়)

মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায়, রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির সহদেবকে দক্ষিণ ভারত বিজয়ে প্রেরণ করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র, অন্ধ্র শবর ও পুলিন্দ পরস্পরের প্রতিবেশী ছিল বলে উল্লিখিত আছে।

'অন্তান্ বঃ প্রজাভক্ষীষ্টেতি।
ত এতে অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মুতিবাঃ ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি।
যে বৈশ্বামিত্রা দস্যুনাংভূয়িষ্ঠাঃ।'

সুতরাং মহাভারত, পুরাণ ও ব্রাহ্মণের উদ্ধৃতিগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর তীরে পুণ্ড্রদের বসবাস ছিল।

পূর্ব ভারতে পৌণ্ড্র জাতির বসবাস ছিল। এ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারত—আদিপর্ব, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, রামায়ণ, বৃহৎসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কলহনের রাজতরঙ্গিনী, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে। মহাভারতে উল্লিখিত আছে, মহারাজ বলীর পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম পূর্ব ভারতের পাঁচটি স্থানের শাসক ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে লিখিত আছে। 'পুণ্ড্রস্য পুণ্ড্রাঃ প্রখ্যাতাঃ সুহ্মাঃ সুহ্মস্য চ স্মৃতাঃ। এবং বলেঃ পুরাবংশেঃ প্রখ্যাত বৈ মহর্ষিজঃ।' মহাভারত থেকে আরও জানা যায় যে মহারাজ পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে পুণ্ড্ররাজকে পরাজিত করেছিলেন। মহাভারতের আদি পর্ব থেকে জানা যায়, পাণ্ডুরাজ দর্শানদেশে প্রবেশপূর্বক দর্শানপতিকে পরাজিত করেন। তারপর হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে তিনি মগধ দেশে উপস্থিত হন। মগধরাজকে পরাজিত করার পর মহারাজ পাণ্ডু মিথিলার বিদেহদের পরাজিত করেন। এরপর তিনি আরও পূর্বদিকে সুহ্ম ও পুণ্ড্ররাজ্য আক্রমণ করেন।

মহাভারতে উত্তরপূর্ব ভারতের কতকগুলি দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশগুলি হল মগধ, অঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত। এই দেশসমূহের মধ্যে মগধরাজ জরাসন্ধ এবং পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী। মহাভারতের সভাপর্বে ১৩ অধ্যায়েপৌণ্ড্র বাসুদেব সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি। হরিবংশ গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশের অবস্থান সম্পর্কে উত্তরপূর্ব ভারতের এক বিস্তৃত অংশকে উল্লেখ করে। হরিবংশে উল্লেখ আছে, পুণ্ড্র সম্রাট বাসুদেবের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছিল মগধ এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। এই সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে পুণ্ড্রদেশের সুসম্পর্ক ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুররাজ নরক শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হলে সম্রাট বাসুদেব মিত্র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অষ্ট সহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী ও বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য নিয়ে দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাবগবতে ৯ম খণ্ড ২৩ অধ্যায়ে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের নাম একই সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্ম পুণ্ড্রোড্রসংজ্ঞিতাঃ।' শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে, কাশীরাজ সম্রাট বাসুদেবের মিত্র। পুণ্ড্র সম্রাট বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লিপ্ত হলে কাশীরাজ মিত্র বাসুদেবকে সাহায্য করেছিলেন।

'পৌণ্ড্রকোহপি তদুদ্‌যোগমুপলভ্য মহারথঃ।
অক্ষৌহিনীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ দ্রুতম।।
তস্য কাশিপতির্মিত্রং পার্ষ্ণিগ্রাহোহন্বয়ান্নৃপ।
অক্ষৌহিনীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ।।'

বিষ্ণুপুরাণের বিংশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, বিশ্বস্ফটিক নামে এক মগধদেশীয় নৃপতি পৌণ্ড্রকগণকে তাদের স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন এবং মগধ থেকে পৌণ্ড্রগণ রাঢ় দেশে বসতি বিস্তার করেছিল। বিষ্ণুপুরাণের এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় পুণ্ড্রদের মগধে বসবাস ছিল। মগধ থেকে তারা পূর্বদেশে বসতি বিস্তার করেছিল।

ঐতিহাসিককালে পুণ্ড্রদেশের অবস্থান যে পূর্বভারতে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে জানা যায় পূর্ব ভারতের এই দেশটিতে উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হত। পুণ্ড্রদেশের বস্ত্রশিল্প ছিল বিখ্যাত। পুণ্ড্রদেশে দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক বস্ত্র উৎপন্ন হত। পুণ্ড্রদেশের দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মত সুদৃশ্য। দুকূল বস্ত্র অত্যন্ত সুক্ষ বস্ত্র ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে এই সকল বস্ত্র মিশর, গ্রীস ও রোমে রপ্তানির উল্লেখ আছে।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, শিলালিপি, মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় পূর্ব ভারতে পুণ্ড্রদেশের অবস্থান ছিল। মহাস্থানগড় খননকার্যের ফলে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ এই নগরকে পুণ্ড্রদেশের রাজধানী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত একটি মৌর্যযুগের শিলালিপিতে এই নগরকে পুডন্‌গল (পুণ্ড্রনগর) বলা হয়েছে। নগরের প্রথম স্তরটি পরিখা ও প্রাকার বেষ্টিত ছিল। মহাস্থানগড়ে খননকার্যের ফলে যে সকল ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার মধ্যে মানকালীর কুণ্ড, পাথর ভিটা, পরশুরামের প্রাসাদ ও শীলাদেবীর ঘাট উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পাওয়া গেছে বিভিন্ন স্তরে পোড়ামাটির চিত্রফলক, অলংকৃত ইট, প্রস্তরনির্মিত দ্রব্য, ব্রোঞ্জ, তামা ও অন্যান্য ধাতুর জিনিসপত্র, ক্ষেপণীয় বল, কড়ি ইত্যাদি। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন সাহেব এই সভ্যতার বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন। মহাস্থানগড়কে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরী হিসাবে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করেন আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম। পুণ্ড্রবর্ধনের এই প্রাচীন রাজধানী নগরই প্রথম ঐতিহাসিক যুগ থেকে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পুণ্ড্রসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল।

ঐতিহাসিককালে পুণ্ড্রদেশের পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চাঙ-কিয়েন নামক এক চীনা রাজদূতের বিবরণী সূত্রে। চাঙ-কিয়েনের লেখায় দক্ষিণ চীনের য়ুনান এবং সজেচোয়ান প্রদেশ থেকে ভারতের গুজরাট পর্যন্ত একটি বাণিজ্যপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পথটি দক্ষিণ চীন, উত্তর ব্রহ্ম, মণিপুর, কামরূপ, পুণ্ড্রবর্ধন, কজঙ্গল, অঙ্গ, চম্পা, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, পাটলীপুত্র, বারাণসী, অযোধ্যা, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খ্রীষ্টপূর্বকালের এই ঐতিহাসিক সূত্র থেকে প্রমাণিত হয় পুণ্ড্রদেশ পূর্বভারতের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। পরবর্তীকালের চৈনিক পর্যটকগণের মধ্যে ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতাব্দী), য়ুয়ান-চোয়াঙ (সপ্তম শতাব্দী) এবং কিয়া-তানের (নবম শতাব্দী) বিবরণী থেকে পুণ্ড্রদেশের অবস্থান যে পূর্ব ভারতে তা জানা যায়।

একাদশ শতকে কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে পূর্ব ভারতে পুণ্ড্রদেশের অবস্থান সম্পর্কে লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। সমসাময়িককালেই সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থেও পুণ্ড্রদেশের অবস্থান যে পূর্বভারতে ছিল তাঁর উল্লেখ আছে।

ঐতিহাসিক উইলসন পুণ্ড্রদেশের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরের কতকাংশ এবং বিহারের রামগড়, পালামৌ এবং চুনারের কতকাংশ নিয়ে পুণ্ড্রদেশ বিস্তৃত ছিল। পুণ্ড্রদেশের ইতিহাস আলোচনা করেছেন ক্যানিংহাম। তার মতে উপরোক্ত স্থানগুলি ব্যতীত পাবনা জেলা পুণ্ড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফার্গুসন মন্তব্য করেন, রাজমহল ও শিলিগুড়িও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন, এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্রদেশ নামে খ্যাত ছিল। যে অংশ মধ্যে কলিকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। বঙ্গিমচন্দ্র আরও লিখেছেন, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন। তাঁর মতে আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধান অংশ পূর্বে পৌণ্ড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে, পুণ্ড্রদেশের পশ্চিমে অঙ্গ বা ভাগলপুর। পূর্বে বঙ্গ (ঢাকা ও মৈমনসিং)। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মালদা, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানের কতকাংশ, ২৪ পবগণ, খুলনা, যশোহর নিয়ে পুণ্ড্রদেশ বিস্তৃত ছিল।

পঞ্চানন মিত্র তার 'Glimpses of Origin and the glorious past of the Pod People' প্রবন্ধে লিখেছেন, "The Poundra were a old race. They knows agriculture and exploit the rich mine first in India.

Pandyan dynesty in the Decan and the great Padma of the Nanda dynesty of Magadha last glymer of the dying race.

পুণ্ড্রদেশের কালের ব্যাপ্তি

ঠিক কত বছর আগে পৌণ্ড্রগণ পূর্বভারতে পুণ্ড্ররাজ্য গড়ে তুলেছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে মোটামুটি বলা যায় যে তারা বাংলাদেশে আর্যপূর্ব যুগ থেকেই বসবাস করছে। বাংলাদেশের ভূমিস্তর অপেক্ষাকৃত নবীন। চার্লস লয়েল তাঁর 'Principle of Geology' তে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ভূমিস্তর বহু পুরাতন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঢ় এলাকার জনবসতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের। পুণ্ড্র জনগোষ্ঠী প্রথমে রাঢ় অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর তারা পূর্বদিকে জলা-জঙ্গলপূর্ণ স্থানগুলিকে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে বসতি বিস্তার করে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ সরকার ও ফরাসী সরকারের যৌথ প্রয়াসে পুণ্ড্রদেশের রাজধানী মহাস্থানগড়ে খননকার্য চালানো হয়। খননকার্যের সময় মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের পর পর সতেরটি নির্মাণস্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথম স্তরটির প্রাচীনত্ব আর্য আগমনের বহু পূর্বের। পণ্ডিতগণের মতে এই স্তরটি হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক। প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে পৌণ্ড্রগণ এখানে এক নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। শেষ নির্মাণ স্তরটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর।

মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের আদি স্তরটি প্রমাণ করে পৌণ্ড্রগণ তাম্রযুগে এক উন্নত নগরসভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তাদের বসবাস যে এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই তা সম্প্রতি ২৪ পরগণার হরিনারায়ণপুর, মন্দিরতলা প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়।

প্রাচীনতম পৌণ্ড্র সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের প্রথম নির্মাণ স্তরকে উল্লেখ করা যায়। পরবর্তীকালে আর্য আগমনের পর আর্যদের রচিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই পৌণ্ড্ররাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পৌণ্ড্র সভ্যতার কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী ঃ

তাম্রযুগ—৫০০০ খ্রীঃ পূঃ।

বৈদিক যুগ—১৫০০ খ্রীঃ পূঃ—৫০০ খ্রীঃ পূঃ

বৌদ্ধযুগ—৫০০ খ্রীঃ পূঃ—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক

বৌদ্ধ পরবর্তী যুগ—

সুতরাং কালানুপঞ্জী অনুযায়ী পৌণ্ড্ররা পূর্ব ভারতে তাম্রযুগের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। প্রথমদিকে মগধে বসবাসকারী পৌণ্ড্ররা রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল এবং উড়িষ্যার বসবাসকারী পৌণ্ড্ররা মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করেছিল। প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে এক সময় পৌণ্ড্ররা মগধে বসবাস করত এবং তাদের রাজা ছিলেন বিখ্যাত মহাপদ্মনন্দ।

আর্যপূর্ব যুগেই পৌণ্ড্ররা পূর্ব ভারতে এক শক্তিশালী পৌণ্ড্ররাষ্ট্র গঠন করেছিল। আর্যযুগেও তাদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। মহাভারত থেকে জানা যায় পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব নিষাদরাজ একলব্য এবং প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ নরকের বন্ধু ছিলেন। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী, বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেবের শত্রুতা ছিল। এইজন্য তিনি দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন। বাসুদেবের পুত্র সুদেবও বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি এক অক্ষৌহিনী সৈন্য সহ বিদর্ভ সমরে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। মহাভারতীয় যুগে পৌণ্ড্ররা আর্যদের কাছে সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও পৌণ্ড্রদেশের উপর আর্যরা কখনই তাদের অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হয় নি। পরবর্তী পৌণ্ড্র শাসকগণ স্বাধীনভাবেই পুণ্ড্রদেশ শাসন করেছিলেন। আর্যরা পঞ্চম শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে বসতি বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

৫৬৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। রাজগৃহে অবস্থান করার পর বুদ্ধদেব পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। তিনি পুণ্ড্রদেশের রাজধানী মহাস্থানগড়ে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এই সময় পৌণ্ড্র রাজ্য প্রায় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। রাজধানী মহাস্থানগড় শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। এই সময় শুধু মহাস্থানগড়ই নয় পুণ্ড্রদেশের বিভিন্ন অংশে শহর ও বাণিজ্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। এ যুগেই শুধুমাত্র পুণ্ড্রদেশ ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে নয়, সমুদ্র পথে বৈদেশিক বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করেছিল। পুণ্ড্রদেশের অভ্যন্তরে

কোটিবর্ষ, কাকমারি, দেবগড়, পুষ্পগ্রাম প্রভৃতি শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় বণিকদের বর্ণিত 'গঙ্গে' সমুদ্রবন্দর এই সময় গড়ে উঠেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অর্থাৎ ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। পাঞ্জাবের রাজা পুরুকে পরাজিত করার পর তিনি আর পূর্ব ভারতে অগ্রসর হননি। তিনি গঙ্গারিডি নামে এক জাতির পরিচয় পেয়েছিলেন। তাদের ছিল এক বিশাল হস্তীবাহিনী এবং এক শক্তিশালী নৌবাহিনী। মেগাস্থেনিসের বর্ণনায় জানা যায়, গঙ্গারিডি জাতির শৌর্যের পরিচয় পেয়ে আলেকজাণ্ডার আর পূর্ব ভারতে অগ্রসর হন নি। গঙ্গারিডি ছিল পৌণ্ড্র সাম্রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগ।

পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে ঐতিহাসকি ডিওডোরাস, মহাকবি ভার্জিল, স্ট্র্যাবো, প্লিনি প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিক ও কবির রচনায় গঙ্গারিডি জাতি ও দেশের বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে মিশরীয় ও রোমান বণিকরা 'গঙ্গে' বন্দরে অবতরণ করেছিলেন।

বৈদিক যুগের পরেই অর্থাৎ আলোকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মিশর, গ্রীক ও রোমের বণিকরা পুণ্ড্র দেশের সঙ্গে সমুদ্র পথে বাণিজ্য করত। এই সময় পুণ্ড্রদেশ শৌর্য-বীর্যে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ভারতে এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং সপ্তম শতাব্দীতে এসেছিলেন য়ুয়ান চোয়াঙ। এদের বর্ণনা থেকে পুণ্ড্রদেশের এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। য়ুয়ান চোয়াঙ লিখেছেন যে পুণ্ড্রদেশ মুঙ্গের ও সমুদ্র সীমার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই সময় এখানে তিনি কয়েকটি মহাবিহার লক্ষ্য করেছেন। এই সময় এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষে একটি মহাবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে ভগবান বুদ্ধের পদচিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। স্যার ক্যানিংহাম এই বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তুপকে য়ুয়ান চোয়াঙ বর্ণিত পো-শি-পো বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে উল্লেখ করেছেন।

এরপরই পৌণ্ড্ররাজ্য কালের নিয়মে ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ মহাস্থানগড়ের শেষ স্তরটির সময়কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যরা পূর্বভারতে বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত তাদের

সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাচীন পুণ্ড্রসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। গুপ্ত রাজবংশ পুণ্ড্রদেশ দখল করেছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। যদিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পুণ্ড্রদেশ গুপ্ত সম্রাটদের অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে পুণ্ড্রদেশ ব্রাহ্মণ্যবাদী শশাঙ্কের কাছে পরাজিত হয় এবং সপ্তম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

পৌণ্ড্রজাতির নৃতত্ত্ব

পৌণ্ড্রজাতির নৃতত্ত্ব আলোচনার পূর্বে ভারতবর্ষের জনতত্ত্বের বিষয়টি আলোচনা করা যাক। নৃতত্ত্ববিদগণের মতে, ভারতীয় জনগোষ্ঠীর প্রথম স্তর নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জন। ভারতবর্ষ থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। হাটন, লাপিক, বিরজাশংকর গুহ লিখেছেন, আসামের অঙ্গামি নাগা, দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বকুলম এবং আন্নামালাইয়ের কাদার ও পুলায়নদের মধ্যে নেগ্রিটো রক্তধারা প্রবাহিত। বিহারের রাজমহল পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এদের দেহের রং কালো, খর্বকায়, নাক চ্যাপটা।

কিন্তু যে জনগোষ্ঠীর প্রভাব ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী, তারা হল আদি অস্ট্রেলিয় (Proto Austroloid)। ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রেলীয়া পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীর বিস্তার ছিল। উত্তর ভারতের কোল, ভীল, মুণ্ডা, ভূমিজ; দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুরুব; শ্রীলঙ্কার ভেড্ডা জনজাতি এবং অস্ট্রেলীয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর দেহ বৈশিষ্টগুলি পরিলাক্ষিত হয়। নিম্নবর্ণের বাঙালী ও বাংলার আদিম অবিবাসীদের মধ্যে এই জনগোষ্ঠীর প্রভাব সুস্পষ্ট। আইকস্টেড্ট মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর নামকরণ করেছেন 'কোলিড' এবং সিংহলীয় আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর নামকরণ করেছেন 'ভেড্ডিড।'

ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে যে সকল জনগোষ্ঠীর বসবাস তাদের মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয় অধিবাসীদের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্টগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাদের দেহ দৈর্ঘ মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, কপাল সংকীর্ণ, মুখ খর্ব, গণ্ডাস্থি উন্নত, নাসিকা লম্বা ও উন্নত কিন্তু নাসামুখ প্রশস্ত, ঠোঁট পুরু, চোখ কালো এবং গায়ের চামড়া পাতলা থেকে ঘন বাদামী। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের নিম্নতর শ্রেণীর অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। বাংলাদেশে সংকর ও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর যে দীর্ঘ-মুণ্ড ধারা বহমান তা মূলত এই নরগোষ্ঠীর। এই গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তাহা জানা যায় নি। বিরজাশংকর গুহ মহাশয়ের মতে, এক সময় এই দীর্ঘমুণ্ডগোষ্ঠী উত্তর আফ্রিকা থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল,

পরে নব্য প্রস্তর যুগে তারা সমগ্র ভারতে বিস্তারলাভ করে এবং আদি অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে তাদের রক্ত সংমিশ্রণ ঘটে।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আরও দু'টি জনধারা এসেছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর নিম্নস্তরে যে কঙ্কালগুলি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একটির দেহ গঠন ছিল সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, মগজ বড়, ভ্রূ-অস্থি স্পষ্ট, কানের পিছনের অস্থি বৃহৎ। দ্বিতীয় জনের লোকদের দেহ গঠন অপেক্ষাকৃত কম সুদৃঢ়, দেহ কিছুটা খর্ব, মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট, নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত। সম্ভবত তারাই হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা। উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের এই দীর্ঘমুণ্ড জনের রক্তধারা প্রবহমান। বাংলাদেশেও সেই ধারা প্রবাহিত।

ভারতবর্ষে দীর্ঘমুণ্ড জনেরা যে জনস্তর গড়ে তুলেছিল, তার উপর আর একটি জনগোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এসেছিল। এই জনেরও প্রমাণ পাওয়া যায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত মুণ্ড কঙ্কাল থেকে। এই নরগোষ্ঠীর মুণ্ডের আকৃতি গোলাকার। এদের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের দীনারীয় ও কতকাংশে আর্মেনীয় জাতির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। এই গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠীকে রিজলী, রমাপ্রসাদ চন্দ অ্যালপাইন (Homo Alpinus) নরগোষ্ঠী বলেছেন। বিরজাশংকর গুহ এদের অ্যালপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফন আইকস্টেডট্ বলেছেন, 'ব্র্যাকিড' বা গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি, উন্নত ও মধ্যম নাসিকা এবং মধ্যম দেহদৈর্ঘের মধ্যে অ্যালপাইন জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্টগুলি প্রকাশ পায়। মূলত বাংলাদেশে যে জন-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতে আদি অস্ট্রেলীয় ও অ্যালপাইন জনগোষ্ঠীর অবদান সর্বাধিক। এই অ্যালপাইন জনগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখা পামির মালভূমি থেকে দক্ষিণ আরব এবং পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আসে আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। এই নরগোষ্ঠীর মুখাবয়ব দীর্ঘ, সুদৃঢ়, নাসিকা সঙ্কীর্ণ ও সুউন্নত, নীচের চোয়াল দৃঢ়। মাথার খুলি ও মুখাবয়ব দেখে মনে হয় এদের দেহ বলিষ্ঠ ছিল। ফন্ আইকস্টেডট্ এই নরগোষ্ঠীর নামকরণ করেছেন 'ইণ্ডিড।' এদের ভাষা, সংস্কৃতি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এই জনের রক্তপ্রবাহ ও দেহগঠনের প্রভাব বাঙালি জাতির মধ্যে প্রায় নেই।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব আসাম, নেপাল, ভুটান এবং বার্মার জনগোষ্ঠীর ভিতর বিদ্যমান। আসামের উত্তর-পূর্বে একটি পৃথক মোঙ্গোলীয় রক্তধারার পরিচয় মেলে। এদের মুণ্ডাকৃতি গোল নয়, বরং দীর্ঘ। কিন্তু এদের চ্যাপটা নাসিকা, উন্নত গণ্ডাস্থি, রক্তিম চোখ, কেশবিহীন দেহ ও মুখমণ্ডল। এই নরগোষ্ঠীর প্রভাব আসাম ও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও রংপুরের অধিবাসীদের বিশেষত নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। উত্তরবঙ্গের কোচ, পোলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জনজাতির দেহগঠন ও মুখাবয়বে মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভারতবর্ষের নরগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আর একটি জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ফিসার সাহেব এদের নামকরণ করেছেন Oriental বা প্রাচ্য। এই নরগোষ্ঠীর গাত্রবর্ণ গৌর, চুল ও চোখ কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা উন্নত ও দীর্ঘ। আফগানিস্থান থেকে নেপাল পর্যন্ত হিমালয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে এই নরগোষ্ঠীর বসবাস। ফন্ আইক্স্টেডট্ এই নরগোষ্ঠীর নামকরণ করেছে 'উত্তর-ইণ্ডিড।' কিন্তু বাংলাদেশে এই নরগোষ্ঠীর কোন প্রভাব নেই।

নৃতত্ত্ববিদ ব্যারন ফন আইকস্টেডট্ ভারতীয় নরগোষ্ঠী সম্পর্কে যে শারীর-পরিমিতি গণনা করেছেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার পরিমিতি বিশ্লেষণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর যে নামকরণ তিনি করেছেন তা লক্ষণীয়। আইকস্টেডটের মতে, ভারতবর্ষে তিনটি নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত এবং প্রত্যেকটি গোষ্ঠীতে কয়েকটি শাখাগোষ্ঠী আছে। (১) ভেড্ডিড—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বলিষ্ঠ গঠনের উত্তর গোণ্ডীয়, দক্ষিণের কৃষ্ণবর্ণ মেলিড এবং শ্রীলঙ্কার ভেড্ডারা এই নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। (২) মেলানিড—এই নরগোষ্ঠীর প্রধান বাসস্থান দক্ষিণ ভারতের সমতলভূমি এবং উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা। উত্তর ভারতের নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী এবং কোলীয়রা, দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়রা এই নরগোষ্ঠীর আত্মীয়। নৃতত্ত্ববিদরা এই নরগোষ্ঠীর দেহ গঠনের বৈশিষ্ট আলোচনায় তাদের সঙ্গে মিশরীয় বা ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর সাদৃশ্যের উল্লেখ করেন। (৩) ইণ্ডিড—এই নরগোষ্ঠীর তিনটি শাখা। (ক) আদি-নর্ডিক, (খ) উত্তর ইণ্ডিড, ফিসার এদের বলেছেন Oriental বা প্রাচ্য, (গ) ব্র্যাকিড। এরা অ্যালপাইন বা অ্যালপো-দীনারীয় গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী। ব্র্যাকিডদের তিনটি উপধারা। (ক) মহারাষ্ট্রের পশ্চিম ব্র্যাকিড (খ) বাংলা ও উড়িষ্যার পূর্ব ব্র্যাকিড (গ) গাঙ্গেয় উপত্যকার দীর্ঘদেহ ব্র্যাকিড।

এই সকল আলোচনার মধ্যে দিয়ে পৌণ্ড্রজাতির নৃতত্ত্ব নিরুপণ করা যেতে পারে। মহাভারতের আদি পর্বে বলা হয়েছে, অসুররাজ বলির পাঁচ পুত্রের নামানুসারে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্ররাজ্যের নামকরণ হয়েছে। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বলা হয়েছে, পুণ্ড্রদেশের মানুষ অসুর ভাষায় কথা বলে। 'অসুরানাম ভবেৎ বাচ গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা।' ড. অতুল সুরের মতে, আর্যরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষদের পরাজিত করে, মিথিলা পর্যন্ত জয় করেছিল। কিন্তু তারা অসুর জাতির কাছে পরাজিত হয়েছিল। এই অসুর জাতির ছিল এক বিশাল হস্তীবাহিনী। তাছাড়া অসুরদের ছিল শক্তিশালী রাজতন্ত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১/১৪) উল্লেখ আছে, অসুরদের একরাট/সম্রাট ছিল। অথর্ববেদে বলা হয়েছে, একরাট একমাত্র প্রাচ্যদেশেই ছিল। এই অসুর জনগোষ্ঠী সম্ভবত মিশর-এশিয় মেলানিড জনগোষ্ঠী। সমসাময়িক কালে পারস্যেও ছিল শক্তিশালী অসুর সাম্রাজ্য। পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠীর মধ্যে ইণ্ডিড রক্তপ্রবাহ অনস্বীকার্য কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাঁর কিছু প্রমাণ মেলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭/১৮) বলা হয়েছে, অন্তান বঃ প্রজাভক্ষীষ্টেতী। ত এতে অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মুতিবাঃ ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি। যে বৈশ্বামিত্রা দসুন্যাং ভূয়িষ্ঠাঃ। অর্থাৎ অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মুতিব প্রভৃতি জাতিগণ বিশ্বামিত্রের বংশধর এবং দস্যুজীবী।

H. H. Risley তার বিখ্যাত 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। Risley পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনজাতির যে পরিমাপ নিয়েছিলেন, তার পরিমাপক সূচি দেওয়া হল।

INDICES :

Nasal—76.1
Nasomalar—111.5
Cephalic—77.7
Fronto-Zygomatic—78.3
Verticocephalic—66.8
Verticobimalar—46.7
Verticofrontal—47.5
Verticobizygomatic—60.6
Height & Weight—308.4
Facial angle—65.0
Nasal height—49.1

Nasal Width—37.4
Bimalar breadth—99.6
Nasomalar breadth—111.1
Cephalic length—183.2
Cephalic breadth—142.4
Minimum frontal breadth—101.2
Maximum bizygomatic breadth—129.2
Height, vertex to inter-supercilliary point—80.2
Height, vertx to tragur —130.1
Height vertex to chin—213.0
Stature in C.M.—162.5
Weight in grammes—5012.8

ড. অতুল সুর তার 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নৃতাত্ত্বিক গড় পরিমাপ অনুযায়ী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শিরসূচক সংখ্যা (Cephalic Index) ৭৭.৮, কৈবর্তদের ৭৭.৫, গোয়ালাদের ৭৭.৩, নমঃশূদ্রদের ৭৮.১, কায়স্থদের ৭৮.৪, ব্রাহ্মণদের ৭৮.৮, সাঁওতালদের ৭৬.১, রাজবংশীদের ৭৫.৪, বাউরীদের ৭৫.১, মুণ্ডাদের ৭৪.৫। পরিসীমা অনুযায়ী শিরসূচক সংখ্যা—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ৭০-৮৫, ব্রাহ্মণ ৭২-৮৭, সদগোপ ৭২-৮৭, কৈবর্ত ৭০-৮৭, সাঁওতাল ৬৯-৮৮, কায়স্থ ৭০-৮৮, নমঃশূদ্র ৭০-৮৯

রিজলী সাহেবের নৃতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত বিশ্বের বহু পণ্ডিত সমর্থন করেন নি। তাঁদের মতে, The Physical anthropologist can not agree upon any Principles of skull measurement. The historical enquirer must not at present lease any a argument on this class of evidence.

অধ্যাপক সাজ্জির মতে, এই পরিমাপ জাতি নির্ণয়ের একটি প্রণালী মাত্র। এর দ্বারা কোন একটি জাতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। বিখ্যাত লেখক হোম্‌স লিখেছেন, 'Of two brothers one will have black eyes and the other blue; one will have a long and the other a round skull.'

একই জাতির মস্তকাদির পরিমাপে রিজলী সাহেবের লব্ধ পরিমাপের ফলাফলের সহিত ওয়াড্যাল সাহেবের লব্ধ পরিমাপ ফলাফলের মিল নেই।

অধ্যাপক হোমরশ্যাম কক্স (Homoersham Cox) লিখেছেন, Unfortunately in the people of India the entries under the

heading locality are in general very vague. In measurements of Nasal Indices there seem to be very great differences, for I find from the fables in the 'People of India' that one observer gives for the kukis of Rangamati the value 85 and other 91.1. It is true the mumber of subject measured was small but the differences must far exceed the probable errors. The existence of such large differences between independent observers excites doubts as to the accuracy of the values of the Nasal Index.

"These Mathods can not however be applied to the statistics of the 'People of India', for the number of measurements for each caste hardly even exceeds on hundred and this is too small a number to obtain a satisfactory frequency curve. (Statistical Theory and Indian Anthropometer).

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের Nasal Index পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণদের Nasal Index ৭৪.৬, বাংলার মুচিদের ৭৪.৯। বাংলাদেশের নমঃশূদ্রদের Nasal Index ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ। পাঞ্জাবের আর্য জাতি এবং দক্ষিণ ভারতের কুর্গ নামক দ্রাবিড় জাতির Nasal Index সমান।

পৌণ্ড্র জনজাতি বাংলাদেশের প্রাচীনতম বাসিন্দা। তাদের মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যেমন মধ্যমাকৃতি দেহদৈর্ঘ্য, উন্নত গণ্ডাস্থি, মধ্য উন্নত নাসিকা, কালো চোখ, তামাটে গাত্রবর্ণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই জনগোষ্ঠীর আদিবাসস্থান ও বিস্তৃতি কোথায় ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে গঙ্গারিডি জনজাতির যে বিবরণ মহাকবি ভার্জিল, ডিওডোরাস, প্লিনি, ভেলেরিয়াস ফ্লাককাস, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় প্রাচীন মনীষীগণ উল্লেখ করেছেন তা মনে করা যেতে পারে পশ্চিম এশিয়া, মিশর, ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সহিত প্রাচীন এই জনজাতির পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। আদি অস্ট্রেলীয় জনপ্রবাহের পরবর্তী সময়ে মেলানিড জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে বসতি বিস্তার করেছিল। ফন আইকস্টেদটের জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলা যায় সম্ভবত পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী মিশর-এশীয় মেলানিড জনগোষ্ঠী।

প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের ভাষাতত্ত্ব

ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস বিশ্লেষণের মধ্যে ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশিলুস্কি ব্লক, লেভি প্রমুখ মনীষীগণ বিশ্বের ভাষাতত্ত্বের যে গবেষণা করেছেন তা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রাচীন জনগোষ্ঠী সমূহের ভাষা একই পরিবারভুক্ত। এগুলি অস্ট্রিক ভাষা। প্রাচীনকালে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর বসবাস ভারতবর্ষ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিষয়ে এ. সি. হ্যাডন তাঁর 'Races of Man' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্ট্রিক এবং মঙ্গোলয়েড জাতিগোষ্ঠীর কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আদিম অধিবাসীদের ভাষা এই সকল জনজাতি গ্রহণ করেছে। এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই ভাষাপ্রবাহ আজও প্রবাহিত। সেই কারণেই ভারতবর্ষের কোল জাতির ভাষার সহিত তালৈঙ, খুমের প্রভৃতি মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীগুলির ভাষার মধ্যে মিল দেখা যায়। ভারতবর্ষেও দ্রাবিড় ভাষা এবং পরবর্তীকালে আর্য সংস্কৃত ভাষার ভিতর অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদ রচনারীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। পশিলুস্কি, ব্লক, লেভি, স্টেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই তথ্যের সু-প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করেছেন। পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে অসংখ্য শব্দ ও পদরচনারীতি অস্ট্রিক শব্দ, ব্যাকরণ ও অস্ট্রিক ভাষা থেকে গৃহীত।

পুণ্ড্রদেশের ভাষা আলোচনায় উপরোক্ত বিষয়টি প্রযোজ্য। পুণ্ড্রদেশের ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার প্রাধান্য। বাংলাদেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি ইত্যাদি বা পন (৮০ টায় এক পন) গণনার রীতি প্রচলিত আছে। এই রীতি অস্ট্রিক রীতি। তাছাড়া পান, সুপারী, কলা, বাঁশ, কড়ি ইত্যাদি দ্রব্য এখনও গণনা করে বিক্রয় করা হয়। এই শব্দগুলি ও গণনা রীতি অস্ট্রিক। আবার গোণ্ড বা গোণ্ডা (৪ সংখ্যায় এক গণ্ডা) অস্ট্রিক শব্দ ও গণনা রীতি। এই গণ্ডা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বীপ্রাকৃত মহাস্থান শিলালিপির গণ্ডক মুদ্রা।

বাংলা কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো), খাঁ খাঁ (করে ওঠা), ঠ্যাং (গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের অংশ), ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, কলি (চুন), পেট, পোপ, ঝাড়, ডোম, চোঙ, মেড়া, বোয়াল, করাত, দা, গড়,

বরজ, লাউ, লেবু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত শব্দই অস্ট্রিক ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রাচীন বাংলার জনপদ বিভাগের পুণ্ড্র/পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ অস্ট্রিক ভাষারই দান। গঙ্গা, দামোদর প্রভৃতি নদ-নদীর নামও অস্ট্রিক। ধান, ঢেঁকি প্রভৃতি শব্দ এবং বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রাম নামও অস্ট্রিক শব্দ ভাণ্ডার থেকে গৃহীত। লেভি সাহেব উল্লেখ করেছে পুলিন্দ-কুলিন্দ, উড্র-পুণ্ড্র, কোসল্-তোসল এই ধরনের জমজ নামকরণ অস্ট্রিক পদ্ধতি। Pulinda-Kulinda/Mekala-Utkala (with the group Udra-Poundra-Munda), Kosala-Tosala, Anga-Vanga-Kalinga-Talinga from the links of a long chain which extends from the eastern confines of kashmir up to the centre of peninsula. The Skeletion of the 'ethnical system' is constitute by the lights of the central plateau; it participates in the life of all the great rivers of India except the Indus in the west and Kaveri in the South. Each of these groups forms a binary whole, each of these binary resites is united with another member of the system. In each ethnic pair the twin bears the same name, differentiated only by the initial K and T; K and P; Zero and V. This process of formation is foreign to Indo-European; it is a foreign to Dravidian; it is on the contrary characteristic of the vast family of languages which are called Austro-Asiatic and which covers in India the group of the Munda language, often called also Kolarian.

'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে গৌড়, পুণ্ড্রদেশের জনসাধারণ অসুর ভাষাভাষী। 'অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভবা।' ড. অতুল সুর মন্তব্য করেন, আর্যরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীব জনজাতিকে পরাজিত করে মিথিলা পর্যন্ত জয় করেছিল কিন্তু তারা অসুর জাতির কাছে পরাজিত হয়েছিল। অসুর জনজাতির বিস্তৃতি প্রাচীন গৌড়পুণ্ড্র থেকে শূরু করে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপের বর্মন রাজবংশের আদি পুরুষগণ অসুর নামেই পরিচিত ছিল। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, সম্বরাসুর, বত্মাসুর, নরকাসুর প্রভৃতি কামরূপ রাজগণ সম্ভবত অসুর ভাষাভাষী ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে নরকাসুরের কাহিনী আছে।

'ইন্দ্রেন হৃতছত্রেন হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা।
হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতম্।।
সভার্য্যো গরুড়ারূঢ় প্রাগজ্যোতিষপুরং যযৌ।'

নরকাসুর বরুনের ছত্র হরণ করে দেবরাজ ইন্দ্রকে অপমানিত করেছিলেন। তাছাড়া নরকাসুর বিভিন্ন রাজাদের পরাজিত করে তাদের রাজকন্যাদের অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বানরাজার কাহিনী উল্লেখ আছে। বলিরাজার ঔরসপুত্র বান সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ব্রতচারী ছিলেন। তিনি শোণিতপুরে রাজত্ব করতেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (প্রদ্যুম্নপুত্র) অনিরুদ্ধেব সঙ্গে অসুররাজ বানের কন্যা ঊষা প্রণয়ে আবদ্ধ ছিল। বানরাজা অনিরুদ্ধকে বন্দী করেছিলেন। এই ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বানরাজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ বানরাজাকে পরাজিত করেছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে, অসুররাজ বলির পাঁচ পুত্রের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্ররাজ্যের নামকরণ হয়েছে। গ্রীয়ার্সন সাহেব এই জনগোষ্ঠীকে 'Outer Aryans' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই জনগোষ্ঠী বেদ বহির্ভূত।

অস্ট্রিক ভাষার ন্যায় দ্রাবিড় ভাষা প্রাচীন পুণ্ড্র জনগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আর্য সংস্কৃত, প্রাকৃতে, অপভ্রংশে দ্রাবিড় ভাষার অনেক শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণরীতি অনুপ্রবেশ করেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, There is of course, the preserve of Kol and Dravidian in the western fringes of the Bengali area and of the Boda and Man-Khmer speakers in the northern and eastern frontiers. There are again some unmistakably Dravidian affinities in Bengali phonetics, morphology, syntax and vocabulary. But there agreements with Dravidians are not confined to Bengali alone but are found in other NIA (West Indo-Aryan) also. A part from that local nomenclature in Bengali may be expected to through some light on the question. The study of Bengali toponomy is rendered extremely difficult from the fact that old names, when they were not sanskrit, have suffered from mutilation to such an extent that it is often impossible to reconstruct their original forms. পুণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গের অসংখ্য স্থান নাম, নামের উপাঙ্গ 'ড়া'। হাওড়া, বাঁকুড়া, বগুড়া, গুঁড়ি, (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি), ভিটা, কুণ্ডু প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় ভাষার।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে, আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর পর তিনটি জনগোষ্ঠী ভারতের জনপ্রবাহে এসেছিল। প্রথম ধারাটি মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে তাদের কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটেছিল। দ্বিতীয় ধারাটি ভারতের উত্তর পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয় ধারাটির সুমেরীয়, আসীরীয় প্রভৃতি ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই ধারাটি অ্যালপো-দীনারীয়। এই আল্পীয় জনগোষ্ঠী পশ্চিম ভারত থেকে শুরু করে উত্তর ও পূর্ব ভারতে বিস্তারলাভ করেছিল এবং নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রদেশে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আল্পীয় ভাষার সংমিশ্রণে যে ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল তা পুণ্ড্রদেশ তথা বাংলার আদি ভাষা ।

মৌর্যযুগে পুণ্ড্রদেশের ভাষা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছিল। তার প্রমাণ মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি। শিলালিপিটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। প্রস্তর ফলকটি ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ। কিন্তু তার ভাষার রীতি পূর্বীপ্রাকৃত। সেই কারণে ফলকে উৎকীর্ণ লিপিকে মহাস্থান শিলালিপি বলা হয়েছে। শিলালিপিটিতে উল্লেখ আছে, নেন [।] স [ং] বগিয় [।]নং [তল দিন স] সম দি। [সু] [মা] তে। সুলিখতে পুডনগলতে। এ [ত] ং [নি] বহিপয়িসতি। সংবগিয়ানং [চ] [দি] নে ********[ধা] নিয়ং। নিবহিসতি। দগ-তিয়া [।] য়কে********** [য়ি] কসি। সুঅ-তিয়ায়িক [সি] পি। গংড [কেহি] [য়ি] কেহি এস কোঠাগালে কোসং ********।

ড. দীনেশচন্দ্র সরকার কৃত মহাস্থান লিপি পাঠোদ্ধারের [বন্ধনী মধ্যস্থ অক্ষরগুলি শিলালিপির অস্পষ্টতার জন্য অনুমিত] নিম্নরূপ বাংলা অর্থ করেছেন ড. সুকুমার সেন। ধান্য সংগ্রহকারীদের দেওয়া নিয়ে যাওয়া (ধান) সব দেওয়া হল। সুমাত সমৃদ্ধ পুণ্ড্রনগর থেকে এই ডেলিভারি দেবে। সংগ্রহকারীদের দেওয়া ধান নিয়ে যাওয়া হবে। সীমান্ত ঘাঁটিতে হাঙ্গাম (হলে), দৈবদুর্বিপাক হলে, নিজেদের মধ্যে হাঙ্গাম হলেও নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ দিয়ে এই কোষ্ঠাগার (অথবা কোষ্ঠাগারে) কোশ (পুরিয়ে দিতে হবে)।

এই ভাষাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় রূপলাভ করেছে। এই ভাষা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃত লক্ষণযুক্ত।

মহাস্থানলিপির কাল থেকে গুপ্তরাজত্বকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ভাষার প্রকৃতি কী ছিল তা জানা যায় নি। তবে অনুমান করা যায় এই সময় প্রাকৃত ভাষার বিস্তার ঘটেছিল। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ঘটেনি। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যে জ্ঞান চর্চার

প্রয়াস ছিল তা মাগধী-প্রাকৃত ও সংস্কৃতে। সপ্তম শতাব্দীতে যখন য়ুয়ান চোয়াঙ কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট ও তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন, এই স্থানগুলিতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রসার বিস্তারলাভ করেছে। য়ুয়ান চোয়াঙের সময় পুণ্ড্রবর্ধনে কুড়িটি বিহারে তিন হাজারের বেশী বৌদ্ধ শ্রমণ ছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনের নিকট পো-সি পো বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের লো-টো-মো-চি বিহার যে বিখ্যাত ছিল য়ুয়ান চোয়াঙের বর্ণনা তার প্রমাণ।

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার পূর্বে পুণ্ড্রদেশে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ এই তিন প্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যতীত পুণ্ড্রদেশে প্রচলিত ছিল শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষা। সহজযানী সিদ্ধাচার্যগণ এই ভাষাতেই কাব্য রচনা করেছেন। কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি সাধকেরা এই ভাষাতেই তাদের দোহাগুলি রচনা করেছিলেন। পাল ও সেন যুগে শিক্ষিত বর্ণসমাজের উচ্চস্তরেই কেবলমাত্র সংস্কৃতি ভাষার চর্চা হত। নবম ও দশম শতকে পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়দেশে সংস্কৃত চর্চা ছাড়াও আরও দু'টি ভাষা প্রচলিত ছিল। একটি শৌরসেনী অপভ্রংশ, অপরটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপ। এটিই প্রাচীন বাংলা ভাষার আদি রূপ। এই ভাষার মধ্যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটব্রহ্ম ভাষার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। শব্দ, উচ্চারণভঙ্গি, বাক্‌ভঙ্গি, পদবিন্যাসরীতিতে এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নবম ও দশম শতকে একই লেখক সৌরসেনী ও মাগধী অপভ্রংশে পদ, দোঁহা ও গীত রচনা করতেন এবং সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারত। পরবর্তীকালে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে যদিও শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চা ছিল তথাপি লোকায়ত প্রাকৃত ধর্মী ভাষা প্রবল ছিল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ শেক-শুভোদয়া।

চর্যাপদ

আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে চারটি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথম পুঁথিটিতে ছিল বিভিন্ন পদকর্তার রচিত ৪৬টি গান। এই বইটির নাম চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়। এই গানগুলির ভাষা ছিল প্রাচীনতম বাংলা। অপর পুঁথিগুলি ছিল সিদ্ধাচার্য সরহ, কাহ্ন রচিত দু'টি দোঁহা সংগ্রহ এবং ডাকার্ণব অর্থাৎ ডাক রচিত দোঁহা সংগ্রহ। শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থ শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন, এই ভাষার মধ্যে প্রাচীনতম বাংলাভাষার লক্ষণগুলি স্পষ্ট। তার ব্যাকরণরীতি বাক্‌ভঙ্গি বাংলা ভাষায় স্বীকৃত ও প্রচলিত।

চর্যাগীতির কবিগণ ছিলেন সিদ্ধাচার্য। এই সিদ্ধাচার্য কবিরা নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। এই কবিদের মধ্যে লুই-পা, কাহ্ন-পা, হাড়ি-পা, শবরী-পা, ভুসুকু, তন্ত্রীপাদ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

চর্যাপদের গীতগুলির মূল্য অপরিসীম। এই গীতগুলিতে ছন্দ এবং অন্তমিল লক্ষ্য করা যায় এবং একটি বিশেষ রাগে গীতগুলি পরিবেশন করা হত। বাংলা পয়ার ছন্দ চর্যাপদের ছন্দের বিবর্তিত রূপ। চর্যাপদের ধ্বনি ব্যঞ্জনা এবং চিত্রময়তা অনন্য। চর্যাপদের গীতগুলি রচিত হয়েছিল বৌদ্ধ সহজ-সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত এবং জীবনচর্যার আনন্দকে ব্যক্ত করার জন্য। পববর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া গান, শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলী, আউল, বাউল গানের মধ্যে চর্যাপদের প্রবাহ সুস্পষ্ট। চর্যাপদের কয়েকটি পদ উল্লেখ করা যাক।

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা করো গুলি গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।।
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।।
তিঅ ধাউ ঘাট পারিলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলি।।

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বসতি করে সবরী বালিকা। ময়ূরের পাখা পরিহিত সবরী, গলায় গুঞ্জের মালা। ওগো, উন্মত্ত সবর, পাগল সবর গোলে ভুল কোরো না। দোহাই তোমার, আমি তোমার গৃহিনী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরুবব মুকুলিত হল, গগন স্পর্শ করল, কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী একাকী শবর এই বনে ঘুরে বেড়ায়। তিন ধাতুর খাট পাতল শবর, মহাসুখে শয্যা বিছাল, শবর ভুজঙ্গ নৈরাত্মা স্ত্রী উভয়ে একত্র প্রেমরাত্রি পোহাল।

কুঁলে কুঁলে মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা।।
মায়া মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা।।
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজবাট জায়ন্তে।।

হে মূঢ়, কুলে কুলে ঘুরে ফিরো না, সংসারে সহজ পথ পড়ে আছে। সামনে যে মায়া মোহের সমুদ্র তার যদি না অন্ত বোঝা যায়, থই না পাওয়া যায়, সামনে যদি ভেলা দেখা না যায়, এ পথের অভিজ্ঞ পথিক যারা, তাদের কাছে সন্ধান জেনে নাও। শূন্য প্রান্তরে যদি না পাও পথের দিশা ভ্রান্ত হয়ে এগিয়ে যেও না, সহজ পথে চল, অষ্টমহাসিদ্ধি তাহলে মিলবে।

লোকায়ত সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের এক সুন্দর চিত্র চর্যাপদে পাওয়া যায়। চর্যাপদে বিবাহ যাত্রার সুন্দর বর্ণনা আছে।

ভবনির্মাণে পড়হ মাদলা।
মনপবন বেণি করণ্ডকশালা।।
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্নু ডোম্বী বিবাহে চলিঅ।।
ডোম্বী বিবাহিঅ অহারিও জাম।
জউতুকে কিঅ আনতু ধাম।। (কাহ্নপাদ)

ভব ও নির্মাণ হল পটহ মাদল। মনপবন বেণি করণ্ডক। জয় জয় দুন্দুভি শব্দ করতে করতে কাহ্নু ডোম্বীকে বিয়ে করতে চলল। ডোম্বীকে বিয়ে করে জন্ম খেলাম অর্থাৎ জাত গেল কিন্তু ভাল যৌতুক পাওয়া গেছে।

প্রাচীনকালের যানবাহনেরও চিত্র ফুটে উঠেছে চর্যাপদে। চর্যাপদে উল্লেখ আছে, খেয়া পারাবারের কাজ নিম্নবর্গের নারীরাও করতেন। একটি গীতিতে জনৈক ডোম্বি পাটনীব কাজ করছেন।

গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই।
তাঁহ বুড়িলি মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।।
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।

গঙ্গা আর যমুনার মাঝে নৌকা বহিতেছে, মাতঙ্গ কন্যা ডোম্বী অবলীলায় পার করছে। বাও গো ডোম্বী, বেয়ে চল। পথে দেরী হয়ে যায়।

সরহপাদের একটি গীত আছে—

কাঅ নাবড়ি ঘান্টি মনা কোড় য়াল।
সদগুরু বঅনে ধর পতিবালা।।
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন উপায়ে পার ন জাই।।
নৌবাহী নৌকা টানঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ন আনোঁ।।

আবার প্রাচীনকালে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বা নগর থেকে দূরে যাবার যান ছিল গরুর গাড়ি বা অশ্ববাহিত যান। সুপ্রাচীন কাল থেকে হস্তী পূর্ব ভারতের অন্যতম বাহন ছিল। চর্যাগীতিতে কাহ্নপাদে আছে ঃ

এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক ব্রাহ্মণ তোড়িউ।।
কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা।।

বন্যহাতি কোন বাধা বন্ধন মানে না। শিখল ছিঁড়ে, খুঁটি ভেঙে সে পদ্মবনে গিয়ে প্রবেশ করে।

হাত্তি ধরবার আগে সারিগান গেয়ে হাতির মনকে বশ করা হত। বীনাপাদের একটি গানে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আলি কালি বেণি সারি মুনিআ।
গঅরব সমরস সান্ধি গুণি আ।।

গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র চর্যাপদে সর্বাধিক দেখা যায়।

আঙ্গন ঘরপণ শুন বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী।।
সুসুরা নিদ গেল বহুরী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।।

কানের গয়না কানে পরে ঘরের বৌ ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে চোর এসে গয়না চুরি করে নিয়ে গেল। শ্বশুর তখনও ঘুমে। ভয়ে ভয়ে বৌ জেগে বসে আছে। মনে তার ভয় ও ভাবনা। একদিকে চোরের ভয়, অন্যদিকে গয়না চুরি গেছে। কার কাছে চাইলেই আর গয়না পাওয়া যাবে। শবরপাদে শবরদের জীবনযাত্রার চিত্রটি অত্যন্ত সুন্দর ও বস্তুময়।

গঅনত গঅনত তইলা বাড়ী হিয়েঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।।
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসম সমতুলা।
সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাযুহোঁ ভোলা।।
চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।
তহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী।।

পাহাড়ের উপর শবর-শবরীদের বাড়ি। বাড়ির চারধারে কার্পাস ফুল ফুটেছে। চিয়া ধান পেকে গেছে। শবর-শবরীদের জীবনে উৎসব লেগেছে।

চর্যাপদের সমকালীন সময়ে ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সিদ্ধাচার্যগণ বেদ বিরোধী ছিলেন। সিদ্ধাচার্য সরহপাদ লিখেছেন--

ব্রহ্মণো হি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পড়িঅউ এ চ্চউ বেউ।।
মট্টী (পাণী) কুস লই পড়ন্ত।
ঘরাই (বইসী) অগগি হুনন্তঁ।।
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অকখি উহাবিঅ কুড় এ ধুমেঁ।।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যথার্থ ভেদ জানে না। তারা মাটি, জল, কুশ নিয়ে মন্ত্র পড়ে। ঘরে বসে আগুনে আহুতি দেয়, কার্যহীন অগ্নিহোমের কটু ধোঁয়ায় চোখ শুধু পীড়িত হয়।

চর্যাপদে থেরবাদী, মহাযানী, কালচক্রযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, দিগম্বর জৈনধর্ম, কাপালিক ধর্ম, নাথ ধর্ম সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়।

থেরবাদী সম্পর্কে বলা হয়েছে—
চেল্লু ভিক্খু জে স্থবির উএসেঁ।
বন্দেহিঅ পব্বজিউ বেসে।।
কোই সুতন্তবক্খান বইটঠো।
কোবি চিন্তে কর সোসই দিটঠো।।

অর্থাৎ শিক্ষার্থী এবং ভিক্ষু স্থবির বা আচার্য্যের উপদেশে প্রব্রজ্যার বেশ গ্রহণ করে। কেউ বসে বসে সুত্রান্ত ব্যাখ্যা করে। কেউ বা দেখে দেখে সর্ব ধর্ম চিন্তা করে।

চর্যাগীতিতে মহাযানীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—
সঅল সহাহিঅ কাহি করি অই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি অই।।

উক্তিটিতে মহাযানীদের সাধনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাধারণ (ধ্যান) সমাধি দ্বারা কী হবে? সুখ-দুঃখের হাত হতে তাতে মুক্তি পাওয়া যায় না।

মহাযানী-বজ্রযানী-কালচক্রযানী প্রভৃতিদের সম্পর্কে দোহা কোষে আছে—
অন্ন তহি মহাজানহি ধাবই।
তহি সুতন্ত তক্কসথ হই।।
কোই মণ্ডলচক্ক ভাবই।
অন্ন চউত্থতও দীসই।।

মহাযানের দিকে অন্যেরা ধাবিত হচ্ছে। সেখানে আছে সূত্রান্ত ও তর্কশাস্ত্র। কেউ কেউ ভাবছে মণ্ডল ও চক্র। দিশা দিচ্ছে চতুর্থ তত্ত্বে।

চর্যাগীতির গীত ও দোঁহাগুলিতে সহজযানী ধর্মমতের আভাস পাওয়া যায়। একইসঙ্গে সমকালীন সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয়। এই তথ্য থেকে আরও একটি তথ্য সুস্পষ্ট হয় যে মধ্যযুগে উত্তর ভারত ও বাংলাদেশে যে মানবধর্মী মরমীয়া সাধকদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যেমন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস; উত্তরভারতে কবির, দাদু, রজ্জব, সুরদাস, হরিদাস প্রভৃতি সকলেই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে একাদশ দ্বাদশ শতকের এই সহজযানি সাধককবিদেব বংশধর।

গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে কিন্তু গঙ্গাবিডি জাতির উল্লেখ নেই। গঙ্গাবিডি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনায়। ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিলেন। সেই সময় পাঞ্জাব কতকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। সেগুলি জয় করে তিনি বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। বিপাশার অনতিদূরে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি রাষ্ট্র ছিল মগধ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত। নন্দ বংশীয় সম্রাট ধননন্দ তখন মগধে রাজত্ব করতেন। তার পিতা মহাপদ্মনন্দ যিনি উগ্রসেন নামেও পরিচিত ছিলেন, মগধের সম্রাট পদে আসীনকালে কাশী, মিথিলা, ইক্ষবাকু, অস্মক, কুরু, পাঞ্চাল, হৈহয়, শূরসেন প্রভৃতি রাজ্য জয় করে 'একরাট' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। সেই সময় নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চলে এক শক্তিশালী জাতি রাজত্ব করত। তাদের রাজধানী ছিল গঙ্গানগর (City of Gange)। গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সম্রাট ধননন্দ নিম্ন-গাঙ্গেয় জনজাতির সঙ্গে এক কনফেডারেশন গঠন করেছিলেন। সেই কনফেডারেশনের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (Palibothra)। বিদেশী গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকেরা এই নিম্নগাঙ্গেয় জনজাতিকে 'গঙ্গারিডি' নামে উল্লেখ করেছেন। যে সকল গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ গঙ্গারিডি জাতি সম্পর্কে লিখে গেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন —

টলেমি ল্যাগাস ঃ আলেকজাণ্ডারের অন্যতম প্রধান সেনাপতি এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন টলেমি ল্যাগাস। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব ২৮৩ অব্দ পর্যন্ত তিনি মিশরে রাজত্ব করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'লাইফ অফ আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট'। টলেমি ল্যাগাস আলেজাণ্ডারের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং পুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি ছিলেন আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সঙ্গী। মূল পুস্তকটি বিনষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর রচনা থেকে ঐতিহাসিকগণ সমকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিয়ে গেছেন। টলেমি ল্যাগাসের জীবন ও রচনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি লক্ ও টেলর সাহেব রচিত 'দ্য ডিক্সনারি অফ বায়োগ্রাফি' গ্রন্থ থেকে। তারই রচনার উপর নির্ভর করে কার্টিয়াস রুফাস (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক।) গঙ্গারিডি জনজাতি সম্পর্কে বিবরণ লিখে গেছেন।

মেগাস্থেনিস (৩৫০-২৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) ঃ গঙ্গারিডি জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থেনিস (৩৫০-২৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। পাটলিপুত্রে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন। তার রচিত গ্রন্থের নাম 'ইণ্ডিকা।' এই গ্রন্থে তিনি ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন জনজাতি, রাজ্য, নদ-নদী, পর্বতমালা, প্রাণী ও উদ্ভিদকুল সম্পর্কে বিবরণ লিখে গেছেন। মেগাস্থেনিসের লিখিত বিবরণে জানা যায়, গঙ্গারিডিদের বিশাল রণহস্তী বাহিনী ছিল। সেইজন্য কোন বিদেশী রাজা এই দেশ জয় করতে পারেনি।

ডিওডোরাস (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) ঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস 'বিবলিওথিকা হিসটরিকা' নামে ৪০ খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিশ্ব ইতিহাস লিখে গেছেন। তার লেখায় গঙ্গারিডি জাতির কথা উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, গঙ্গার অবাহিকায় গঙ্গারিডিরা শ্রেষ্ঠ জাতি। আলোকজাণ্ডার প্রায় সমগ্র এশিয়া জয় করেও গঙ্গারিডিদের সঙ্গে যুদ্ধে বিমুখ হয়েছিলেন। গ্রীক বাহিনী পূর্ব ভারতে অগ্রসর হয়নি। ডিওডোরাস লিখেছেন, আলোকজাণ্ডার 'ফেগেলাস' নামে এক দেশীয় নৃপতির নিকট থেকে গঙ্গারিডি জাতির খবর পেয়েছিলেন। ফেগেলাস আলেকজাণ্ডারের গুপ্তচর বাহিনীর একজন ছিলেন। প্রথমে ইনি একটি মরুভূমিতে পৌঁছেছিলেন। এই মরুভূমি অতিক্রম করতে তার বার দিন সময় লেগেছিল। এরপর ভারতবর্ষের নদী সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর ও বত্রিশ স্টেডিয়া প্রশস্ত গঙ্গা নদী। এই গঙ্গার অববাহিকায় প্রাসী ও গঙ্গারিডিদের রাজ্য। এই রাজ্যের অধিনায়ক ছিলেন জান্দ্রামেস (Xandrames)। তার অধীনে কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দু'লক্ষ পদাতিক, দু'হাজার রথ ও চার হাজার রণহস্তী বাহিনী ছিল। ডিওডোরাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রাসী ও গঙ্গারিডি কনফেডারেশনের অধিনায়ক ছিলেন শূদ্র বংশীয়। গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের বর্ণনার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ও সিংহলী গ্রন্থসূত্রের মিল পাওয়া যায়।

ভার্জিল (৭০—১৯খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শ্রেষ্ঠ মনীষী রোমান মহাকবি ভার্জিল। তিনি তাঁর ইনিড (Aeneid) কাব্যগ্রন্থে গঙ্গারিডি সৈন্যদের বীরত্বের বর্ণনা করেছেন। তার অন্যতম রচনা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত জর্জিস (Georgies) কাব্যগ্রন্থে তিনি লিখেছেন, In foribus Pugnam ex auro solidoque elephanto Gangaridum faciam Victorisquc arma Quirini

ইংরাজী অনুবাদ

"On the door will I represent
In solid gold and ivory
The battle of Gangaridae"

গঙ্গারিডিরা সমৃদ্ধশালী ও যোদ্ধা জাতি হিসাবে যে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছিল মহাকবি ভার্জিলের রচনায় তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

প্লিনি (২৩-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ গেইয়াস প্লিনিয়াস সেকাণ্ডাস যিনি প্লিনি নামেই ইতিহাস বিখ্যাত, ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত 'হিসটরিয়া ন্যাচারালো' নামে এক বিশ্বকোষ লিখে গেছেন। তার রচনায় তিনি গঙ্গারিডি জাতির কথা উল্লেখ করেন। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি লিখেছেন, গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। প্লিনির বর্ণনায় গঙ্গারিডি রাষ্ট্রে পর্তেলিস (Portalis) নামে একটি বাণিজ্য বন্দরের উল্লেখ আছে। বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী প্লিনি বর্ণিত পর্তেলিস। প্লিনি তার রচনায় কলিঙ্গী, গঙ্গারিডি, মল্ল, তাম্রলিপ্তি, প্রাসী, পাঞ্চাল প্রভৃতি একশত স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী, তাদের রাজ্য, রাজধানী ও সৈন্যবাহিনীর উল্লেখ করে গেছেন। প্লিনি বর্ণিত একশত ভারতীয় জনজাতি বা কৌম জনগোষ্ঠীরগুলির নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

Isari (ইসরী), Cosyri (খসীর), Izgi, Ghisiotosagi (কিরাত?), Brachmanae (ব্রাহ্মণগণ), Maccocalingae (ম্যাকোকলিঙ্গী অর্থাৎ মাহিষক-কলিঙ্গী?), Calingae (কলিঙ্গী), Mandei (মন্দ্য), Malli (মল্ল), Gangaridae (গঙ্গাঋদ্ বা গঙ্গাঋদ্ধ), Gangarides-Calingae (গঙ্গাঋদ্-কলিঙ্গী), Modogalingae (মধ্যকলিঙ্গী), Modubae (মৌতিব), Uberae (ভর), Galmodroesi, Preti (প্রেত), Calissae (কালীশ), Sasuri (সসুর), Passalae (পাঞ্চাল), Colubae (কোলুট), Orxulae (অক্ষুল), Abalae (অবল), Taluctae (তাম্রলিপ্তি), Andarae (অন্ধ), Dardae (দরদ), Setae (শাতক) Prasi (প্রাসী বা মগধ), Monedes (মহানদী তীরবর্তীগণ), Suari (শবর) Pygmies (বামন), Cesi (ফস) Centriboni (ক্ষত্রিবনীয়), Megallae (মাবেল), Chrysei (করোঞ্চ), Parasangae (পরসঙ্গ), Asangae (অসঙ্গ), Bari (ধার), Surae (সুর), Naltecorae (মালতিক) Singahae (সিংহ), Rarungae (ররুঙ্গ), Maruni (মরুণ) Nareae (নায়র), Oraturae (ওরাতুর), Veretatae (বরতত), Odomboerae (ওদম্বরী), Salabastrae (সলবস্ত্র), Horatae (হোরত), Charmae (খর্মা), Pandae (পাণ্ডা), Syrieni (সুরিয়ণী), Derangae (ঝারেঙ্গা), Posingae (পসিঙ্গ),

Bazae (বুন্দা), Gogiarei (কোকারি), Umbrae (উমবানি), Nereae (নারোনি), Brancosi (ব্রাঙ্কোসি), Nobundai (নুবিতো), Cocondae (কোকোনদ), Nesei (নিসা), Pedatrirae (পদত্রির), Solobriasae (শূলবিয়স), Olostrae (ওলস্ত্র), Amatae (ওমত) Bolingae (ভৌলিঙ্গ) Gallitalutae (গিহ্লোট), Dimuri (দুম্বা), Megari (মোকর), Ordabae (অর্দব), Mesae (মজরি), Uri (হৌর) Sileni (সুলল), Organagae (অর্ঘনাগ), Abaoratae (অববর্ত), Sibarae (সৌভীর), Suartae (স্বার্ত), Sarophages (সরভাম), Sorgae (সর্ব), Baraomatae (বরাহমত), Umbrittae (অম্বষ্ঠ), Asene (অসেন), Soleadae (শৈলদ), Sonrae (সুন্দর), Samarabriae (সমরবীর), Sambruceni (সম্বরসেন), Bisambritae (বিষমবৃত্ত), Osii (ওস), Antixene (অন্তিক্ষণ), Taxilae (তক্ষশীলা), Amanda (অমন = গান্ধার?) Peucolatae (পুষ্কলবতী), Arsagalitae (আর্যগলিত), Geretae (গৌরী), Asoi (আশয়), Gedrosi (গেড্রোসী), Arachotae (আরাখোটি), Arii (আর্য)Paropamisadae (পরোপমিসড)।

কার্টিয়াস রিউফাস (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী) ঃ রোমান ঐতিহাসিক কার্টিয়াস রিউফাস 'ডি ভারবাস গেস্টো আলেকজান্ড্রি ম্যাগনি' নামক আলেকজাণ্ডারের জীবনী গ্রন্থে গঙ্গারিডি জাতির বীরত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। কার্টিয়াস লিখেছেন, গাঙ্গেয় জনজাতির অবস্থান ও তাদের বীরত্বের সংবাদ পাওয়ার পর আলেকজাণ্ডার ও তার সৈন্যবাহিনী আর পূর্বভারতে অভিযান চালাতে সাহসী হয় নি। বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আলেকজাণ্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

টলেমি ক্লডিয়াস (খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী) ঃ গ্রীক ভৌগোলিক, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমি ক্লডিয়াস (Ptolemy Claudious : 139 - 161 A.D.) তার 'জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস' নামক ভূগোল গ্রন্থে 'ইণ্ডিয়া ইনট্রাগাঙ্গেম' নামক বিবরণী ও মানচিত্রে ভারতের নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গারিডি রাষ্ট্র ও গঙ্গে বন্দরের উল্লেখ করেছেন। টলেমির হিসাব অনুযায়ী 'গঙ্গে' বন্দরের অক্ষাংশ ১৪৬ ডিগ্রি ।

ভেলেরিয়াস ফ্লাককাস (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী) ঃ গঙ্গারিডি জাতির উল্লেখ আছে ভেলেরিয়াস ফ্লাককাস রচিত 'অরগণটিকা' কাব্যগ্রন্থে। ভেলেরিয়াস ফ্লাককাস খ্রীষ্ট্রীয় প্রথম শতাব্দীর রোমান কবি। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি লিখেছেন, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গঙ্গারিডি যোদ্ধারা পৌরানিক বীর জ্যাসনের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করেছিল। গঙ্গারিডি যোদ্ধাদের সাহস ও বীরত্বের উল্লেখ তিনি তার কাব্যগ্রন্থে করেছেন। ভেলেরিয়াস ফ্লাককাসের রচনা থেকে প্রমাণিত হয়, গঙ্গারিডি দেশ ও জাতির পরিচিতি সুদূর রোম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

স্ট্রাবো ঃ ঐতিহাসিক স্ট্রাবোর রচনাতে গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি সম্পর্কে এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন গঙ্গার বিস্তার ছিল একশত স্টেডিয়া। এবং গভীরতা ছিল একশত ফুট। গঙ্গা এবং শোন নদীর সংযোগস্থলে পালিবোথরা অর্থাৎ পাটলীপুত্র নগরের অবস্থান ছিল। এই নগরের দৈর্ঘ্য আশি স্টেডিয়া (নয় মাইল তিনশত চল্লিশ গজ) এবং প্রস্থ ছিল পনের স্টেডিয়া। তির নিক্ষেপের জন্য নগরের প্রাচীরে রন্ধ্র ছিল। নগর রক্ষা এবং দুষিত জল নির্গমনের জন্য পরিখা বেষ্টিত ছিল এই নগর। নগরের সাধারণ নাগরিকরা ছিল সরল, মিতাচারি এবং সুখী।

আরিয়ান (খ্রীষ্টীয় ১ শতাব্দী) ঃ আরিয়ানের রচনা থেকে সমকালীন ভারতবর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে অসংখ্য নগর ছিল। এই সকল নগরের মধ্যে 'পালিবথরা' নগর ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। গঙ্গা এবং শোন নদীর সংযোগস্থলে ছিল এই নগর। এই নগর চারশত হাত প্রশস্ত এবং ত্রিশ হাত গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। নগর প্রাচীরে পাঁচশত সত্তরটি বুরুজ এবং চৌষট্টিটি দরজা ছিল। তার রচনা থেকে জানা যায় যে ভারতীয়রা ছিল স্বাধীনচেতা এবং ভারতবর্ষে কোন ক্রীতদাস ছিল না।

গেইয়াস জুলিয়াস সলিনাস (খ্রীষ্ট্রীয় ৩য় শতাব্দী) ঃ বিখ্যাত লেখক ও ব্যাকরনবিদ। সমসাময়িক পৃথিবীর এক বৃত্তান্তে তিনি গঙ্গারিডি দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'পলিহিস্টর'।

এছাড়া খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের এক অজ্ঞাতনামা মিশরীয় নাবিক নাবিকদের সুবিধার জন্য গ্রীক ভাষায় এক পথনির্দেশ সংবলিত গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থের নাম 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী' (সমুদ্রের পথ নির্দেশিকা)। এই গ্রন্থে গাঙ্গেয় জনপদে অবস্থিত 'গঙ্গে' (Ganga) নামক একটি বাণিজ্য নগরের উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী পূর্বঘাট অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে 'দশারিন অর্থাৎ দশার্ণ (উড়িষ্যা) অতিক্রম করার পর পূর্বমুখে ফেরার সময় ডাইনে মুক্ত সমুদ্র এবং বামে উপকূল রেখে জাহাজ চালালে 'গঙ্গে' নগর পড়বে। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের রচয়িতা জাতিতে গ্রীক এবং মিশরের অধিবাসী। অজ্ঞাতনামা এই নাবিক ও বণিক বাণিজ্য উপলক্ষে মিশর থেকে ভারতবর্ষে কয়েকবার এসেছিলেন। মিশরে মায়স হর্মস বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে আরব ও পারস্যের উপকূল

অতিক্রম করে তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, 'গাঙ্গে' বন্দরে তেজপাতা, সুগন্ধি অঞ্জনতৈল, প্রবাল, মুক্তা এবং মসলিন বস্ত্রের বেচা কেনা হত। এখানকার প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'ক্যালটিস'।

সমকালীন ভারতীয় লেখকগনের রচনায় গঙ্গারিডি নাম উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু তাদের রচনায় সমকালীন সময়ে পূর্ব ভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় পুণ্ড্রদেশ ও তার সভ্যতার উল্লেখ আছে।

যে সকল ভারতীয় লেখকগণের রচনায় সমকালীন সময়ে নিম্নগাঙ্গেয় সভ্যতার বিবরণ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

পাণিনি ঃ আলেজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কিছু পূর্বে পাণিনি পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ধাতুপাঠ, গণপাঠ প্রভৃতি ব্যাকরণ শাস্ত্র রচনা করেন। তার একটি শ্লোকে প্রাচ্যপুর শব্দের উল্লেখ আছে। 'পুরে প্রাচ্যম' (৬/২/৯৯)। পাণিনি মগধ ও কলিঙ্গেরও উল্লেখ করেছেন। 'প্রাচ্যপুরম' গঙ্গা তীরবর্তী পুণ্ড্রদেশের নগর ছিল। এই প্রাচ্যপুরমকে গ্রীকরা 'গঙ্গা' নগর নামে অভিহিত করেছিল।

পতঞ্জলি ঃ পাণিনি ভাষ্যকার ও যোগশাস্ত্রের রচয়িতা পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার রচিত 'পাতঞ্জল মহাভাষ্য' ও 'পাতঞ্জল দর্শন' প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়েছে। তিনি নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকাকে (গাঙ্গ অনুপ) উন্মত্ত-গঙ্গ, লোহিত-গঙ্গ নামে উল্লেখ করেছেন। এই উন্মত্ত গঙ্গ ও লোহিত গঙ্গই গ্রীক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাষ্ট্র।

বেদব্যাস ঃ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস গঙ্গারিডিদিগকে সমুদ্র উপকূলের ম্লেচ্ছজাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মহাভারতের সভাপর্বে উল্লেখ আছে, পাণ্ডুনন্দন ভীম বহু দেশ বিজয় পূর্বক লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছ নরপতিদিগকে পরাজিত করে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরুবস্ত্র, কম্বল, মণিমুক্তা, কাঞ্চন, রজত বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করেছিলেন। ম্লেচ্ছ রাজগণ বিপুল ধনসম্পত্তি ভীমকে সমর্পণ করেছিলেন এবং ভীম সেই সমস্ত ধনরত্ন যুধিষ্ঠিরকে অর্পণ করেছিলেন (মহাভারত, সভাপর্ব অধ্যায়, বর্ধমান রাজবাটী বঙ্গানুবাদ)। মহাভারতেই উল্লিখিত আছে পৌণ্ড্র সম্রাট বাসুদেবের নাম। মহাভারতীয় যুগে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছিল শক্তিশালী পুণ্ড্র সাম্রাজ্য।

বাল্মীকি ঃ গঙ্গা জনপদ বা গঙ্গারিডিকে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে রসাতল বা পাতাল বলেছেন। সতীশচন্দ্র মিত্র তার 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, মহারাজ সগরের নামানুসারে সগর বংশীয়দের অধিকৃত

দ্বীপের নাম সগরদ্বীপ বা সাগরদ্বীপ হিসাবে পরিচিত হয়েছে। এখানে মহর্ষি কপিলের আশ্রম ছিল। শ্রীধাম গঙ্গাসাগরের তীর্থনগর অতি প্রাচীন। সাগরদ্বীপের বিভিন্ন অংশে পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রীক ও রোমান লেখকদের গঙ্গা জনপদ ও গঙ্গা নগরটি সম্ভবত এখানেই অবস্থিত ছিল।

কৌটিল্য ঃ সমকালীন সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন কৌটিল্য। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'অর্থশাস্ত্র'। অর্থশাস্ত্রে পুণ্ড্রদেশের নাম উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, পূর্বভারতে পুণ্ড্রদেশের অবস্থান এবং পুণ্ড্রদেশের দুকূল (বস্ত্র) বিখ্যাত। দুকূল (বস্ত্র) শ্যামবর্ণ এবং মণির মত সুদৃশ্য। এছাড়া পুণ্ড্রদেশে পত্রোর্ণ (জাত) ও কার্পাসিক বস্ত্রও বিখ্যাত। কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে হীরামণিরও উল্লেখ করেছেন।

গঙ্গারিডি নামের উৎস ঃ

'গঙ্গারিডি' শব্দের অর্থ 'গঙ্গাঋদ্ধ'। গ্রীক ব্যাকরণ অনুযায়ী 'গঙ্গারিদ' (গাঙ্গেয়)শব্দের একবচনে 'গঙ্গারিদেশ' এবং বহুবচনে 'গঙ্গারিদই'(গাঙ্গেয়গণ)। মেগাস্থেনিস প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকগণ 'গঙ্গারিদই' (Gangaridai) এবং 'গঙ্গারিদেশ' (Gangarides) দু'টি শব্দই ব্যবহার করেছেন। রোমানরা জাতিবাচক 'গঙ্গারিদই' শব্দটিকে ল্যাটিন বানানে 'গঙ্গারিদেই' (Gangaridae) রূপে ব্যবহার করেছে। দেশবাচক শব্দ হিসাবে গঙ্গারিডি ও গঙ্গারিদই এই দু'টি শব্দই ব্যবহার হয়ে আসছে।

'গঙ্গারিডি' শব্দের উৎস বিষয়ক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত তথ্য সম্পর্কে অনেক গবেষক আলোকপাত করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, আচার্য সুকুমার সেন তাদের মধ্যে অন্যতম। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'স্টাডিজ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুইস্টিকস' গ্রন্থে গঙ্গারিডি বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, দেশীয় 'গঙ্গার' শব্দের সহিত গ্রীক বিভক্তি 'ইদ' যোগে 'গঙ্গারিদ' শব্দটি গ্রীকরা ব্যবহার করেছেন। 'ইদ' বিভক্তির এক বচন 'ইদেস' যোগে 'গঙ্গ ারিদেশ' এবং বহুবচন 'ইদই' যোগে 'গঙ্গারিদই' থেকে ল্যাটিন বানানে 'Gangaridae' । গঙ্গা শব্দের উৎপত্তি 'গঙ্গাল' থেকে। 'আল' প্রত্যয় যোগে গঙ্গার সঙ্গে সম্বন্ধ সূচক 'গঙ্গাল' শব্দের সৃষ্টি। যার অর্থ গাঙ্গেয় জনগোষ্ঠী। 'র' ও 'ল' এর অভেদক্রমে পূর্বভারতের 'গঙ্গাল' শব্দ পশ্চিমভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে 'গঙ্গার' এ পরিবর্তিত হয়েছে। গ্রীকরা 'গঙ্গার' শব্দটি গ্রহণ করে এবং গ্রীক বিভক্তি 'ইদ' যোগে 'গঙ্গারিদ' শব্দ গঠন করে।

আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, 'বঙ্গাল' শব্দের অর্থ 'বঙ্গঋদ্ধ' অর্থাৎ কার্পাসপুষ্ট দেশ। 'গঙ্গাল শব্দের অর্থ 'গঙ্গাঋদ্ধ' অর্থাৎ গঙ্গাপুষ্ট দেশ। (বঙ্গ ভূমিকা ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-১২)। তার মতে গঙ্গা শব্দের সঙ্গে 'Reid' ঋদ যোগে গঙ্গারিদ শব্দের উৎপত্তি।

ড. অতুল সুরের মতে, বৈদিক শব্দ 'বঙ্গৃদ' (বঙ্গ + ঋদ্) এর মতো 'গঙ্গারিদ' (গঙ্গা + ঋদ) শব্দটিও ইন্দো-এরিয়ান ভাষাসম্ভূত।

'ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠযাতিথিগ্বস্য বর্তনী।

ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনত্‌পুরোহনানুদঃ পরিষৃতা ঋজিশ্বনা।।'

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১/৫৩/৮

ড. সুরের মতে 'বঙ্গৃদ' শব্দটি যেভাবে গঠিত 'গঙ্গারিদ' শব্দটিও একইভাবে গঠিত।

কোন কোন গ্রীক লেখক যেমন ডিওডোরাস 'গন্দারিদই' (Gandaridai) শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্লুটার্ক ব্যবহার করেছেন, 'গন্দারিতই' (Gandaritai) শব্দ। জাতিবাচক ও দেশবাচক 'গন্ধার' (গান্ধার) শব্দটির প্রভাবে গঙ্গারিদই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছিল। টলেমির ম্যাপে উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত Gandarae (গন্দারি) নামক স্থানটিকে গন্ধারদের দেশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যভারতের Gondali (গোণ্ডালি) স্থানটিকে গোন্ডজাতির দেশ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। পূর্ব ভারতে গন্ধার বা গোন্ড জাতির জনপদ কোন কালে ছিল না। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, মেগাস্থেনিসের রচনার পাঠোদ্ধারে ভুলবশত ডিওডোরাস গন্ধার শব্দের প্রভাবে 'গন্ধার' দেশীয় অর্থে 'গন্দারিদৈ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে উত্তর পশ্চিম ভারতের গান্ধার রাজ্য গ্রীকদের নিকট পরিচিত ছিল। ই. এ. শোয়ানবেক, জে. ডব্লিউ, ম্যাক্রিণ্ডল, এফ. জে. মোনাহান প্রমুখ বিদেশী ঐতিহাসিকগণ এবং যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, কালিদাস দত্ত, নীহাররঞ্জন রায়, অতুল সুর, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশীয় ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ 'গঙ্গারিদ' শব্দটিকে উল্লেখ করেছেন।

গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অবস্থান ক্ষেত্র

টলেমি (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) লিখেছেন, গঙ্গারিডিদের বাসভূমি ছিল গঙ্গার মোহনা সমীপবর্তী প্রদেশ। তাদের রাজধানী ছিল গঙ্গা (Ganga)। টলেমি লিখেছেন, গঙ্গার মোহনা পাঁচটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে

পতিত হয়েছে। তাঁর অঙ্কিত ভারতের আন্তগাঙ্গেয় অংশের (Indicae intra Gangem pars) নক্সায় গঙ্গার যে গতিপথ উল্লেখ করেছেন, তার পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত বন্দব। পূর্বদিকে সর্বশেষ পদ্মা মেঘনার ধারা। এর মধ্যবর্তী নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় গাঙ্গেয় জনপদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। টলেমিব মতে পদ্মা মেঘনার ধারাটি গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের পূর্ব সীমা। মেগাস্থেনিস (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) এবং ডিওডোরাস (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক) উল্লেখ করেন, গঙ্গা গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের পূর্ব সীমা। সলিনাসের (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক) বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গার শেষ প্রান্তে যে জাতির বসবাস তাদের নাম গাঙ্গেয় (Gangarides)। সলিনাসের পূর্বে মেগাস্থেনিস (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) এবং প্লিনি (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) লিখেছিলেন, গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি (Gangarides) দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মিশরবাসী গ্রীক নাবিক তার 'ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রের পথনির্দেশিকা' (পেরিপ্লাস মারিস ইরিথ্রিয়াই) গ্রন্থে গাঙ্গেয়দের জনপদে 'গঙ্গে' নামে একটি বাণিজ্য নগরীর উল্লেখ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, গঙ্গার মোহনাসমীপে ছিল এই 'গঙ্গে' বাণিজ্য নগরী। আজকের 'গঙ্গানগর' প্রাচীন 'গঙ্গে'। টলেমির ম্যাপ অনুযায়ী দীনেশচন্দ্র সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তব সম্মত। বিনয় ঘোষ তার পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে এই মত সমর্থন করেছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, পূর্বে পদ্মা ও পশ্চিমে ভাগীরথী গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের সীমানা। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী টলেমির নক্সায় গঙ্গার পঞ্চমোহনার বিচার বিশ্লেষণ করে সমগ্র বঙ্গোপদ্বীপই গঙ্গারিডি রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উত্তরপূর্ব সীমায় গঙ্গা যেমন পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গায় সাগরমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পশ্চিম সীমার গঙ্গার অপর শাখাগুলি বিহারের পূর্ণিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত থেকে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুরের মধ্য দিয়ে অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, সরস্বতী, কংসাবতীকে সংযুক্ত করে বর্তমান হুগলী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চিমে সমুদ্রে পতিত হয়েছিল।

এই সকল বিষয় আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, প্রাচীন উপবঙ্গ বা সমগ্র গঙ্গোপদ্বীপেই গঙ্গারিডিদের রাষ্ট্র ছিল। বর্তমান মালদহ, বিহারের পূর্বদিকের কিছু অংশ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরকালে অঙ্গ, কজঙ্গল, ঔদুম্বরিক, রাঢ়, বঙ্গ ও সমতট গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শৌর্যে গঙ্গারিডি জাতি

গঙ্গারিডি জাতি শৌর্য ও বীরত্বে ছিল অনন্য। মহাকবি ভার্জিল (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক) লিখেছিলেন,

"In foribus Pugnum Ex auro Solidoque elephanto
Gangaridum facium. victorisque arma Quirini."
(virgil, Geong, 111-27)

ইংরেজি অনুবাদ ঃ

On the door will I represent
In solid gold and ivory
The battle of the Gangaridae
And the arms of our victorious quirinius.

"রাখিব দুয়ার ভরি যতনে উৎকীর্ণ করি
নিটোল সুবর্ণ আর গজদন্ত সনে
গঙ্গারিডি রণে।" (বঙ্গানুবাদ ঃ সরোজকুমার দত্ত)

রোমান কবি ভ্যালেরিয়াস ফ্ল্যাক্কাস তার 'আর্গোনটিকা' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন, পৌরাণিক বীর জ্যাসনের বিরুদ্ধে গঙ্গারিডিরা কৃষ্ণসাগর উপকূলে যুদ্ধ করেছিল।

গঙ্গারিডিদের ছিল পদাতিক, অশ্ব, রথ, হস্তীবাহিনী ও নৌবাহিনী। মেগাস্থেনিস লিখেছেন, গঙ্গারিডিদের বিশাল হস্তীবাহিনীর জন্য কোন বিদেশী রাজা তাদের জয় করতে পারেনি। ঐতিহাসিক ডিওডোরাস লিখেছেন, আলেকজাণ্ডার গঙ্গারিডিদের বিশাল হস্তীবাহিনীর সম্মুখীন হতে চান নি। ডিওডোরাস আরো লিখেছেন, প্রাসী ও গঙ্গারিডি দু'টি পৃথক রাজ্য হলেও তারা ছিল মূলত একটি জাতি। তারা নিজেদের মধ্যে এক কনফেডারেশন গড়ে তুলেছিল। এই যুক্তরাজ্যের রাজা জান্দ্রামেস। এই যুক্তরাজ্যের ছিল ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০০০০ পদাতিক, ২০০ রথ, ৪০০০ রণহস্তী।

কার্টিয়াস রুফাস (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) তার 'লাইফ অফ আলেকজাণ্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন, গঙ্গারিডি ও প্রাসী এই দুই রাজ্যের রাজা ছিলেন এ্যাগ্রামেস (Agrammes)। তার সৈন্যবাহিনীতে ছিল ২০০০০০ পদাতিক, ২০০০০ অশ্বারোহী, ২০০০ চার ঘোড়ার রথ, ৩০০০ রণহস্তী।

প্লুটার্ক লিখেছেন, প্রাসী ও গঙ্গারিডির রাজা একই ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, Kings of the Gandaritai and the Praisioi এই উভয় রাজার সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৮০০০০ অশ্বারোহী, ২০০০০০ পদাতিক, ৮০০০ রথ ও ৬০০০ রণহস্তী।

সলিনাস ও প্লিনির বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬০০০০০ পদাতিক, ৩০০০ অশ্বারোহী, ৯০০০ রণহস্তী।

গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের নৌবাহিনীও ছিল। গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে মহাকবি কালিদাস তার 'রঘুবংশ'- রচনায় গাঙ্গেয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নৌযুদ্ধে নিপুণতার বিষয় উল্লেখ করেছেন।

'বঙ্গান উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান্ জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতেহন্তরেষু চ।।'

গঙ্গারিডি ঃ আলোচনা ও পর্যালোচনা

গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনায় কয়েকটি দিক উঠে আসে। পূর্ব ভারতের একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে গ্রীক ও রোমান মনীষী ও ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন, ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে তারা কী নামে পরিচিত ছিল। তারা কোন জনগোষ্ঠী। কীভাবে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হল অথবা বিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান বঙ্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কি-না তা গবেষণা-সাপেক্ষ। গঙ্গারিডি শব্দটি বিদেশী নামকরণ। 'গঙ্গারিডি' সভ্যতার সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মেগাস্থেনিসের (৩৫০-২৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রচনায়। ৩০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি পাটলিপুত্রে গ্রীক দূত হয়ে আসেন। এই সময়ই তিনি তার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে গঙ্গারিডি জনজাতিব উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে গঙ্গারিডি জনজাতির উল্লেখ করেন গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী), রোমান কবি ভার্জিল (৭০-১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), প্লিনি (২৩-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ), ভেলেরিয়াস ফ্লাক্কাস (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী), কার্টিয়াস (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী), টলেমি (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী), সলিনাস (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী)। সমকালীন সময়ে ভারতে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কৌটিল্য, পাণিনি, পতঞ্জলী, কপিল প্রমুখ মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাদের রচনায় 'গঙ্গারিডি' নামের উল্লেখ নেই। অথচ এই সকল মনীষীগণ তাদের রচনায় সমকালীন সময়ে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনপদের উল্লেখ করেছেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কিছু পূর্বে পাঞ্জাবে পাণিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ধাতু পাঠ, গণপাঠ প্রভৃতি ব্যাকরণ শাস্ত্র লিখেছিলেন। পাণিনি একটি শ্লোকে 'প্রাচ্যপুর' এর উল্লেখ করেন। এই সময় পূর্বভারতে পাটলিপুত্র, তাম্রলিপ্ত, মহাস্থানগড়, প্রাগ্জ্যোতিষপুর প্রভৃতি জনপদ ছিল। পাণিনি তার রচনাতে মগধ ও কলিঙ্গের ও উল্লেখ করেছেন। ('দ্ব্যঞ্মগধকলিঙ্গপুরমসাদ্ অন্' ৪/১/১৬৮)।

মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর 'মহাভারত' মহাকাব্যে পূর্বভারতে 'পুণ্ড্রদেশ' এর সম্রাট বাসুদেবের নাম উল্লেখ করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরক ও মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত একযোগে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, পৌণ্ড্র সম্রাট বাসুদেব (৮ম খ্রীঃ পূঃ) ঐতিহাসিক চরিত্র। মহাভারতে আরও উল্লিখিত আছে, পাণ্ডুনন্দন ভীম মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করার পর পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছ নিবাসী রাজা মহৌজাকে পরাজিত করে বঙ্গদেশের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। ভীম রাজা সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, কর্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি প্রভৃতি ম্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করেছিলেন। মহাভারত থেকে জানা যায় ভীম 'লৌহিত্য দেশ' ও সাগরতীরবর্তী ম্লেচ্ছ নরপতিদের পরাজিত করে বিপুল ধন-সম্পদ করায়ত্ব করেছিলেন। মহাভারতে উল্লিখিত 'লৌহিত্য দেশ' এর উল্লেখ পাওয়া যায় পতঞ্জলির রচনাতেও। ড. সুকুমার সেনের মতে, প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বঙ্গভূমি উক্ত নামে পরিচিত ছিল। পতঞ্জলির সমকালীন 'উন্মত্তগঙ্গ', 'লোহিতগঙ্গ' এবং গ্রীক বর্ণিত গঙ্গারিডি অভিন্ন।

নিম্ন-গাঙ্গেয় ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায় মহর্ষি বাল্মীকির রচনাতেও। সাগরদ্বীপকে কেন্দ্র করে যে জনপদ গড়ে উঠেছিল, বাল্মীকি তাকে পাতালরাজ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সতীশচন্দ্র মিত্র তার 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মহারাজ সগরের নামানুসারে সগর বংশীয়দের অধিকৃত দ্বীপের নাম সগরদ্বীপ বা সাগরদ্বীপ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। এখানেই ছিল মহর্ষি কপিলের আশ্রম।

গ্রীক বর্ণিত গঙ্গারিডি দেশ ও জনজাতির সমকালীন সময়ে পূর্ব ভারতে পৌণ্ড্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র, বৌধায়ণ স্মৃতি, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', জৈন কল্পসূত্র ও বিভিন্ন পুরাণে পৌণ্ড্রদেশের নামোল্লেখ আছে। পুণ্ড্রদেশের উল্লেখ আছে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকদের রচনাতেও। কৌটিল্যের সময়ে পুণ্ড্রদেশের শাসক ছিলেন সোমদত্ত। কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র'-এ আরও একজন পৌণ্ড্র শাসকের নাম পাওয়া যায়। উক্ত শাসকের নাম রাজা শতানন্দ। সমকালীন সময়ের এই প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে, গঙ্গারিডি রাজ্য ছিল পৌণ্ড্রদেশের দক্ষিণাংশ। গঙ্গারিডি সভ্যতাকে বলা যেতে পারে পৌণ্ড্রসভ্যতা। তার প্রমাণ পাওয়া যায় জৈন কল্পসূত্রে। মহাবীরের সমকালীন সময়ে বাংলাদেশের অধিকাংশই পুণ্ড্রবর্ধনীয়া নামে পরিচিত ছিল। এই সময় পুণ্ড্রবর্ধনে জৈন ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব

বিস্তার করেছিল। সরোজকুমার দত্তের মতে, পুণ্ড্রবর্ধনে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বেই পুণ্ড্রদেশে এক উন্নততর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রখ্যাত গবেষক নরোত্তম হালদারের মতে, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ দক্ষিণ পুণ্ড্রবর্ধনকে বিদেশীরা গঙ্গারিডি রাজ্য নামে অভিহিত করেছিল। সমগ্র গাঙ্গোপদ্বীপ ছিল গঙ্গারিডিদের অধিকারে। তাদের রাজধানী ছিল গঙ্গানগর। গঙ্গানগর ছিল একটি গাঙ্গেয় বন্দর। নরোত্তম হালদারের মতে, গঙ্গারিডি জাতি বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পূর্বপুরুষগণ। ড. অতুল সুর এই মত সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, নরোত্তম হালদারের এই সিদ্ধান্ত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের তথ্য দ্বারা সমর্থিত। দ্রাবিড়দের ন্যায় পুণ্ড্ররা প্রাচীন ভারতের একটি প্রসিদ্ধ জাতি। সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতা আর গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত গঙ্গারিডি বা গাঙ্গেয় সভ্যতা ছিল প্রাচীন পুণ্ড্র সভ্যতা। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে এই পুণ্ড্র জাতির আধিপত্য ছিল।

ড. অতুল সুর তার 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আদম সুমারী অনুযায়ী বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে সকল জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তার তালিকা দিয়েছেন।

স্থান	মে	হু	ব	বাঁ	বী	২৪	ন
প্রথম	১	১	৫	৯	২	১২	১
দ্বিতীয়	২	৫	২	৩	৫	১	৬
তৃতীয়	৩	৩	৩	৭	৩	৩	৩
চতুর্থ	৪	৬	৬	৬	৮	৫	১১
পঞ্চম	৫	২	৭	১১	৯	৬	১০

টীকা—জেলাঃ মে = মেদিনীপুর, হু = হুগলি, ব = বর্ধমান, বাঁ = বাঁকুড়া, বী = বীরভূম, ২৪ = ২৪ পরগণা, ন = নদীয়া।

জাতি ঃ—১ = কেবর্ত, ২ = সদ্‌গোপ, ৩ = ব্রাহ্মণ, ৪ = তাঁতী, ৫ = বাগদি, ৬ = গোয়ালা, ৭ = তিলি, ৮ = ডোম, ৯ = বাউরী, ১০ = নমঃশূদ্র, ১১ =চামার, ১২ = পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় ২৪ পরগণা জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌণ্ড্রজাতির আধিপত্য প্রথম স্থান ছিল। অপরদিকে মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তদের প্রথম স্থান ছিল। খ্রীষ্টপূর্বকালে এই জনগোষ্ঠী ছিল নগরসভ্যতার স্রষ্টা।

প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের রাজবৃত্ত

যে কোন দেশের ইতিহাস রচনার রাজবৃত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির ইতিহাস অনুসন্ধানকালে ঐতিহাসিকগণ রাজবৃত্তের অনুসন্ধানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজবৃত্তের ইতিহাস অর্থাৎ রাজা, রাজবংশ, যুদ্ধবিগ্রহ, সন-তারিখ, রাষ্ট্রের উত্থান পতন ইতিহাসের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলি মিশর, সুমের, ব্যাবিলন, চীন ও ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধানেও সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত।

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা পুণ্ড্রসভ্যতা। মহাস্থানগড় ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয় এই সভ্যতা মিশর, ব্যাবিলন ও সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্বে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু তার রাজবৃত্তের বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নি। মহাভারতে পৌণ্ড্রসম্রাট বাসুদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট বাসুদেবের সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র পূর্বভারতব্যাপী বিস্তৃত ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি কৌরব পক্ষে যোগদান করেছিলেন। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্রাট বাসুদেবের বৈরিতা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার বৈরিতার অন্যতম কারণ ছিল শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সম্রাট নরকাসুর নিহত হয়েছিলেন। নরকাসুর সম্রাট বাসুদেবের মিত্র ছিলেন। বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সম্রাট বাসুদেব দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন। সম্রাট বাসুদেবের রাজত্বকাল অষ্টম খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কোন এক সময়কালে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

মহাভারতে আরও একজন পৌণ্ড্র শাসকের নাম পাওয়া যায়। তিনি বাসুদেবের পুত্র সুদেব। বিদর্ভ সমরে তিনি এক অক্ষৌহিনী সৈন্য সহ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন।

পুণ্ড্রদেশের রাজবৃত্ত আলোচনায় ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। হরিবংশে যে সকল পুণ্ড্র রাজন্যবর্গের উল্লেখ আছে তারা হলেন পুরু, মহাবীর্য্য, প্রাচিন্বাণ, প্রবীর, মনস্যু, অতনু, সুধন্বা, সুবাহু, রৌদ্রাশ্ব, সভানর, কালানল, সৃঞ্জয়, পুরঞ্জয়, জন্মেজয়, মহামণি, মহামনা, তিতিক্ষু, উষদ্রথ, ফেণ, সুতপা, বলি এবং পুণ্ড্র।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত পৌণ্ড্র রাজন্যবর্গ হলেন অনু, সভানর, কালানল, সৃঞ্জয়, পুরঞ্জয়, জন্মেঞ্জয়, মহামণি, মহামনা, তিতিক্ষু, উষদ্রথ, হেম, সুতপা, বলি এবং পুণ্ড্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত পৌণ্ড্র রাজন্যবর্গের নাম যথাক্রমে অনু, সভানর, কালানল, সৃঞ্জয়, জন্মেঞ্জয়, মহাশানা, মহামনা, তিতিক্ষু, উষদ্রথ, হেম, সুতপা, বলি ও পুণ্ড্র।

অগ্নিপুরাণে উল্লিখিত পৌণ্ড্ররাজগণের নাম যথাক্রমে অনু, সভানর, কালানল, সৃঞ্জয়, পুরঞ্জয়, জন্মেঞ্জয়, মহাশানা, মহামনা, উশীনর, তিতিক্ষু, উষদ্রথ, পৈল, সুতপা, বলি এবং পুণ্ড্র।

ব্রহ্মপুরাণে যে সকল পৌণ্ড্র রাজার নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন পুরু, সুধীর, মনস্যু, অভয়দ. সুধন্বা, সুবাহু, রৌদ্রাশ্ব, কক্ষেয়ু, সভানর, কালানল, সৃঞ্জয়, পুরঞ্জয়, জন্মেঞ্জয়, মহাশানা, মহামনা, তিতিক্ষু, উষদ্রথ, হেম, সুতপা, বলি এবং পুণ্ড্র।

বায়ুপুরাণে উল্লিখিত পুণ্ড্ররাজগণের নাম অনু, সভানর, কালানল, সৃঞ্জয়, পুরঞ্জয়, জন্মেঞ্জয়, মহাশানা, মহামনা, তিতিক্ষু, উষদ্রথ, হেম, সুতপা, বলি এবং পুণ্ড্র।

'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'অসুরানাং ভবেৎ বাচ গৌড়পুণ্ড্রাদ্ভাবা সদা।' পুণ্ড্র জনগোষ্ঠীর ভাষা অসুর ভাষা। কোল গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির নাম অসুর বুলি। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থাদিতে পুণ্ড্র রাজণ্যদের অসুর বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ এবং হরিবংশে উল্লেখ আছে মহারাজ পুণ্ড্রের পিতা ছিলেন অসুররাজ বলি। আর্যপূর্বকালে পূর্বভারতের রাজগণ আর্যদের নিকট অসুর নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণ শোনিতপুররাজ বান এবং প্রাগজ্যোতিষপুর সম্রাট নরকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টপরবর্তীকালেও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের শাসকগণ নিজেদের অসুরবংশীয় বলে পরিচয় দিতেন।

সমসাময়িককালে পারস্যে গড়ে উঠেছিল অসুর সাম্রাজ্য। নিনেভা শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে অসংখ্য মূর্তি, পাথরের ভাস্কর্য ও ছবি পাওয়া গেছে। যুদ্ধ ও শিকারের ছবিই বেশী। এগুলি থেকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক ও চেহারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। শহরের বৈভব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জানা যায়।

অসুরদের উন্নত ভাষা ছিল। মাটির উপর বাটালি দিয়ে অক্ষর লেখা হত। পরে মাটির ফলকটিকে পোড়ানো হত। পোড়া মাটির ফলকে লিখিত ইতিহাস থেকে অসুরদের অনেক কথা জানা যায়। অসুরদের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন টিগ্‌লাৎ পিলেসের। তার সাম্রাজ্য পারস্য থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

টিগ্‌নাৎ পিলেসের মৃত্যুর দুশো বছর পরে অসুর নাসিরপাল আসিরিয়া বা অসুরদেশের রাজা হন। একদিকে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, অন্যদিকে শিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ ছিল।

অসুরদের শেষ শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন অসুর বানিপাল। তিনি আরবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং মিশর জয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের অনুরাগী। তিনি নিনেভা নগরীতে একটি বিশাল গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। এটি পৃথিবীতে প্রথম গ্রন্থাগার।

পুণ্ড্রজনগোষ্ঠীর নৃতত্ত্ব আলোচনায় কতকগুলি দেহলক্ষণ সুস্পষ্ট। যেমন দেহদৈর্ঘ্য মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ, কপাল সংকীর্ণ, গণ্ডাস্থি উন্নত, নাসামুখ প্রশস্ত, চোখ কালো, গায়ের চামড়া সাধারণত পাতলা থেকে ঘন বাদামী। দক্ষিণ ভারতীয় জনগোষ্ঠী এবং উত্তর ভারতের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীব এই দেহবৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। এই জনগোষ্ঠীর বিস্তৃতি একসময় মিশর থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জনগোষ্ঠীকে জনতত্ত্ববিদগণ আদি ভূমধ্যসাগরীয় মেলানিড জনগোষ্ঠী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পুণ্ড্র জনগোষ্ঠী মিশর-এশীয় এই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আর্যদের নিকট তারা দস্যু, অসুর নামে অভিহিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন কৌমের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে পুণ্ড্রকোম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতে পুণ্ড্রকোমের উল্লেখ আছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে পুণ্ড্র জনপদকে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতি বহির্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সকল গ্রন্থ থেকে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা যায় সেকালে আর্য ভাষাভাষী ও আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা পূর্বভারতে পুণ্ড্র. বঙ্গ, সুহ্ম প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল না। প্রাচীন কালে পূর্ব ভারতের কোমগুলির ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ভিন্নতর ছিল এবং আর্য জনগোষ্ঠীর কাছে অপরিচিত ছিল। জনতত্ত্বের দিক থেকেও পুণ্ড্র জনগোষ্ঠী অন্যতর জনের লোক। তার ইঙ্গিত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে। আবার পুণ্ড্রদেশে আর্যীকরণের ক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। মনু পুণ্ড্রকোমের জনগোষ্ঠীকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই জনগোষ্ঠীকে দ্রাবিড়, শক প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

খ্রীষ্টপূর্ব কালে গ্রীক ও রোমান লেখকেরা আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান সম্পর্কিত রচনায় বিপাশা নদীর পূর্ব তীরে প্রাচ্য (Prasisoi) এবং গঙ্গারাষ্ট্রের (Gangaridai) উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্য রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল

পাটলীপুত্র (Paliborthra)। গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গা (নগর) (Gange)। পেরিপ্লাস ও টলেমির রচনা থেকে জানা যায় গঙ্গানগর সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বৃহৎ বন্দর ছিল। ডিওডোরাস, কার্টিয়াস, প্লুতার্ক, সলিনাস, প্লিনি, টলেমি, স্ট্র্যাবো প্রমুখ গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে গঙ্গারাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীরে বিস্তৃত ছিল। প্রাচ্যরাষ্ট্র ছিল তার পশ্চিমে। গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনায় প্রাচ্যরাষ্ট্র ও গঙ্গারাষ্ট্রের শক্তিশালী পদাতিক, রথারোহী, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গবেষক নরোত্তম হালদারের মতে এই গঙ্গারিডি রাজ্য ছিল প্রাচীন পুণ্ড্ররাষ্ট্রের অন্তর্গত।

মহাস্থানগড়, বানগড় প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ থেকে পুণ্ড্রদেশের সভ্যতা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষে ২৫ ফুট মাটির গভীরতার মধ্যে ১৭টি নির্মাণ স্তরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। প্রথম নির্মাণস্তরের সময়কাল সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক। সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িককালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাকিস্তানে প্রত্নতত্ত্ববিদ মহম্মদ রফিক মুঘল সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িককালের ভারতের শতাধিক স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। এই সকল স্থানের বাইরেও বহু সভ্যতার নিদর্শন অনাবিষ্কৃত আছে। সাম্প্রতিককালে যেমন পাকিস্তানে মেহেরগড় ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তেমনই পূর্ব ভারতে পুণ্ড্র সভ্যতার বিভিন্ন স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পাণ্ডু রাজার ঢিবি ছাড়াও দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন বা তারও পূর্বেকার। দেউলপোতায় আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। বিভিন্ন মাতৃকা মূর্তি, প্রাচীন লিপি ও চিত্রযুক্ত শিলমোহর, মৃৎপাত্র এবং তাম্রমুদ্রা এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। দেউলপোতায় আবিষ্কৃত তাম্রনির্মিত কতকগুলি মাদুলির প্রতিকৃতির সঙ্গে মিশরীয় স্কারাব মাদুলির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হরিনারায়ণপুরে তাম্রশ্মীয়কালের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। হরিনারায়ণপুরে যে সকল শিলমোহর ও মৃৎপাত্রগুলির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে মিশরীয় ও ক্রিটিয় সভ্যতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এই সকল বিষয় আলোচনা কালে পরিস্ফুট হয় যে খ্রীষ্টপূর্বকালে পুণ্ড্র সভ্যতা পূর্বভারতে বিস্তৃত ছিল। পুণ্ড্র সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা যথা মিশর, সুমের, ব্যাবিলন ও ক্রিটিয় সভ্যতার যোগাযোগ ছিল।

পুণ্ড্রদেশের জনতত্ত্ব বিষয়ের সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা মিশর, সুমের ও সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। পুণ্ড্রজনগোষ্ঠী মিশর-এশীয় মেলানিড জনগোষ্ঠী। প্রাচীনকালে মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। ভেলেরিয়াস ফ্লাককাস তার অরগনটিকা কাব্যে লিখেছেন গঙ্গারিডি দেশের বীরেরা ১৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছিল। তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ভার্জিলের 'জর্জিকাস' কাব্যে।

খ্রীষ্ট পূর্ব ৩৫০০ বছর পূর্বে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা। ৩৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজা মিনিস (Menes) সর্বপ্রথম মিশরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে মিশরীয় সভ্যতার সূচনা করেন। তার রাজধানী ছিল মেমফিস। তার উপাধি ছিল ফ্যারাও। পরবর্তী ফ্যারাও জোসার (Zoser)। তার রাজত্বকালে মিশরীয় সভ্যতা প্রসারিত হয়েছিল। মিশরীয় সভ্যতা উন্নতির শিখরে আরোহন করেছিল ফ্যারাও খুফু ও তার উত্তরাধিকারী খাফরা এবং মানকুরাও এর রাজত্বকালে (৩১০০-৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এই সময়কালে মিশরে ফ্যারাও খুফু, খাফরা, মানকুরাও তাদের পিরামিডগুলি নির্মাণ করান। এই সময়কালে গড়ে উঠেছিল সিন্ধুসভ্যতা (৩৫০০-১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং সুমেরীয় ও মেসোপটেমিয় সভ্যতা। (৩০০০-১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এই সভ্যতাগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল তা মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত মিশরীয় শিলমোহর থেকে জানা যায়। এই সময় পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্থলপথ ও নৌপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সম্প্রতি মহাস্থানগড়ে খননকার্যের ফলে সেখানে একটি নৌবন্দরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

সমসাময়িককালে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা হামুরাবির রাজত্বকাল ২১২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। হামুরাবি সুমেরীয় নগরগুলি জয় করে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সূচনা করেছিলেন। উল্লেখ করা যায় যে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সমসাময়িককালে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকার উত্তর অংশে আসিরীয় বা অসুর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সেমিটিক জাতির রাজধানী ছিল নিনেভা নগর। আসিরীয়রা ছিল সাহসী যোদ্ধা। তির ধনুক এবং লোহার বল্লম নিয়ে তারা যুদ্ধ কবত। বাহুবলে তারা ব্যাবিলন ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্য জয় করে এক

বিস্তির্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। অসুরগণ শুধুমাত্র সাহসী যোদ্ধা ছিলেন না, তারা ছিলেন শিল্প, ভাস্কর্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সম্রাট অসুর বানিপাল তাঁর রাজধানী নিনেভায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থাগার। বিভিন্ন ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অসুর জাতির উল্লেখ আছে। অসুর জাতি সাহসী যোদ্ধা এবং উন্নত নগর সভ্যতার অধিকারী ছিল। আর্যপূর্বকালে এই অসুর জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং উন্নততর সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে অসুররাজ বলির পাঁচ পুত্রের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। গবেষক অতুল সুরের মতে আর্যরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষদের পরাজিত করে মিথিলা পর্যন্ত জয় করেছিল কিন্তু অসুর জাতির কাছে তারা পরাজিত হয়েছিল। অসুরদের ছিল শক্তিশালী রাজতন্ত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।২৪) উল্লিখিত আছে অসুরদের একরাট/সম্রাট ছিল। অথর্ববেদে বলা হয়েছে একরাট একমাত্র প্রাচ্য দেশেই ছিল। এই সময়কালে প্রবীর, মনস্যু, অতনু, সুধন্বা, সুবাহু, কালানল, সৃঞ্জয়, পুরঞ্জয়, মহামনা প্রমুখ পৌণ্ড্র রাজগণ রাজত্ব করেছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ঐতিহাসিককালে ভগবতী গ্রন্থ থেকে জানা যায় পুণ্ডরাজ মহাপৌম আজীবিক ধর্মসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেন ভগবতী গ্রন্থে উল্লিখিত পুণ্ড যথার্থই পুণ্ড্র। মহাপৌম ছিলেন পূর্বভারতের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থ থেকে প্রাক্ মৌর্যকালে পুণ্ড্ররাজ সোমদত্তের কথা জানা যায়। কৌটিল্য লিখেছেন, পুণ্ড্রদেশ ছিল পদ্মা-মেঘনার উত্তরে এবং তার রাজধানী পুণ্ড্রনগর। কৌটিল্য তার 'অর্থশাস্ত্রে' গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উল্লেখ করেছেন। 'অর্থশাস্ত্র' থেকে আরো একজন পৌণ্ড্ররাজার নাম পাওয়া যায়। তার নাম রাজা শতানন্দ।

পঞ্চম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধনের দু'জন সামন্ত শাসক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। এই দু'জন শাসক হলেন চিরাতদত্ত ও ব্রহ্মদত্ত। ৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উপরিক মহারাজ নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজপুত্র দেব ভট্টারক।

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পুণ্ড্ররাজ দেবসেনের নাম উল্লেখ আছে। সোমদেব এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ১০৬৩-১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে। কাশ্মীরি কবি সোমদেব রচিত গ্রন্থে বর্ণিত গ্রন্থ রচনার ইতিহাস থেকে জানা যায় গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'বৃহৎকথা' গ্রন্থটি

বর্তমানে নেই। কয়েকটি সংকলন গ্রন্থে এই গ্রন্থের সারাংশ রক্ষিত আছে। তম্মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থটি বুধস্বামী রচিত 'বৃহকথা শোক সংগ্রহ' গ্রন্থটি অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত। মূলগ্রন্থটি সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে। ঐ সময়কালেই রাজা দেবসেনের রাজত্বকাল।

একাদশ শতাব্দীতে কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশের রাজা জয়ন্তের নাম উল্লিখিত আছে। সম্ভবত তিনি পুণ্ড্রদেশের শেষ শাসক। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পুণ্ড্রনগরের সামন্তরাজার কন্যা কল্যাণদেবীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি পঞ্চগৌড়াধিপতিদের যুদ্ধে পরাজিত করে জয়ন্তকে তাদের অধিরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পঞ্চ গৌড় ছিল গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, উৎকল। রাজা জয়ন্তের শাসনকাল সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক তথ্যের প্রমান পাওয়া যায়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবন এলাকায় জটার দেউলের নিকটবর্তী স্থানে একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। এই লিপিতে লিখিত আছে, ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয়ন্ত এই দেউল নির্মাণ করান। তিনি সম্ভবত পুণ্ড্রদেশের শেষ শাসক।

পুণ্ড্রদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

দেশ ও জনজাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার অর্থনীতি। এই অর্থনীতি ব্যক্তিব জীবনযাপন, শিক্ষা ও ধর্মকর্মের সঙ্গেও অপরিহার্যভাবে জড়িত। বিভিন্ন বর্ণ, জাতি, ও জনগোষ্ঠী নিয়ে পুণ্ড্রদেশের যে জনসমাজ তার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয়।

পুণ্ড্রদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনায় সর্বপ্রথম কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্য পৌণ্ড্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পুণ্ড্রবণিকেরা কৃষি ও শিল্পজাত সামগ্রী নিয়ে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে নয়, স্থল ও নৌপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

কৃষি

ধান ঃ পুণ্ড্রদেশের সর্বপ্রাচীন মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) প্রস্তর লেখখণ্ডটি থেকে অনুমান করা যায়, পুণ্ড্রদেশের মানুষের অন্যতম প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল ধান। মহাস্থানগড়ের শিলালিপিটি একটি রাজকীয় আদেশ। কিন্তু এই শিলালিপি থেকে প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের অর্থনীতির কয়েকটি বিষয় জানা যায়। শিলালিপিটি থেকে জানা যায়, কোন এক রাজা আদেশটি দিয়েছিলেন পুণ্ড্রনগরের মহাপাত্রকে এবং তাকে আদেশটি কার্যকরী করতে বলা হয়েছিল। মহাস্থানগড় শিলালিপি থেকে জানা যায়, পুণ্ড্রনগরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে সংবঙ্গীয়দের মধ্যে (ষড়বর্গীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু) দৈবদুর্বিপাকে নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়েছিল। এই দৈবদুর্বিপাক থেকে ত্রাণের জন্য দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমত গণ্ডক মুদ্রায় অর্থ দেওয়া হয়েছিল ঋণ হিসাবে। দ্বিতীয়ত রাজকীয় শস্যভাণ্ডার থেকে ধান্য বিতরণ করা হয়েছিল ঋণ হিসাবে। ধানই ছিল পুণ্ড্রদেশের সর্বপ্রধান কৃষিজাত ফসল। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী পুণ্ড্রদেশে প্রথম ধান চাষ শুরু করেছিল। রূপশাল, চামরমণি, মালাবতী প্রভৃতি ধান সময় থেকেই চাষ সেই শুরু হয়। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন লেখমালায় 'ক্ষেত্রকরাণ্', 'কর্ষকান্', 'কৃষকান্', প্রভৃতি কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই

সময় জনসাধারণ যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তার মধ্যে কৃষকেরা ছিল একটি বিশেষ শ্রেণী। অষ্টম শতকের খালিমপুর তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, এযু চতুর্থ গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-যষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক চৌরোদ্ধবণিক দৌস্সাধসাধ্নিক-দূত-খোল-গমাগমিকা ভিত্বরমান-হস্তাশ্ব-গোমহিযাজাবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তারিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদায়ুক্তক-বিনিযুক্তকাদি-রাজপাদ-পোজীবী-নোহন্যাংশ্চা-কীর্তিতান-চাটভট-জাতীয়ান-যথাকালধ্যাসিনো-জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহোত্তর-মহোত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়-ব্যবহারিণঃ-সকরনান-প্রতিবাসিনঃ-ক্ষেত্রকরাণংশ্চ, ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।'

খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকেই পুণ্ড্রদেশে ভূমির চাহিদা ছিল। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল তাম্রপট্টোলী পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয়, কৃষি জমির চাহিদাই ছিল সর্বাধিক। ধনাইদহ পট্টোলী (৪৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ), দামোদরপুরে প্রাপ্ত প্রথম পট্টোলী (৪৪৩-৪৪ খ্রীঃ), দ্বিতীয় পট্টোলী (৪৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), তৃতীয় পট্টোলী (৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ), ধর্মাদিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় পট্টোলী (সপ্তম শতক), সমাচার দেবের খুগ্রাহাটি পট্টোলীতে (সপ্তম শতক) খিলক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। কয়েকটি পট্টোলীতে খিলক্ষেত্র ও বাস্তুক্ষেত্রের প্রার্থনা করা হয়েছে, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলী (৪৪৭-৪৮ খ্রীঃ)। পট্টোলীগুলি থেকে ভূমির পরিমাপের বিষয়গুলি জানা যায়। কুল্যবাপ, দ্রোনবাপ, আঢ়বাপ বা আঢকবাপ, উন্মান প্রভৃতি মান শস্য ও ভূমি সম্পর্কিত। এক কুল্য, এক দ্রোন বা এক আঢ় বীজবপনের জন্য যতটুকু ভূমির প্রয়োজন তার পরিমাপ। ভূমির পরিমাপের জন্য দামোদরপুরে প্রাপ্ত তৃতীয় পট্টোলীতে (৪৮২-৮৩ খ্রীঃ) নল মানদণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় (অষ্টক নবকন লাভ্যাম, ৮ X ৯ নল)। ধান যে পুণ্ড্রবর্ধনের সর্বপ্রধান শস্য তা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

ইক্ষু ঃ পুণ্ড্রদেশের অন্যতম কৃষিজাত দ্রব্য আখ। পুণ্ড্রদেশের একপ্রকার বিখ্যাত আখের নাম ছিল 'পৌণ্ড্রিক', সাধারণত যাকে 'পুঁড়ো' আখ বলা হয়। 'সুশ্রুত' গ্রন্থে পুণ্ড্রক নামক ইক্ষুর উল্লেখ আছে। উত্তর ও মধ্যবঙ্গে পুণ্ড্রজাতি পুঁড়ো নামে অভিহিত। আখ থেকে এদেশে প্রচুর গুড় উৎপন্ন হত। গুড় থেকেই গৌড় শব্দের উৎপত্তি। গ্রীক লেখক ইলিয়ন ও লুকেন খ্রীষ্টপূর্বকালে পুণ্ড্রদেশ থেকে ইক্ষুদণ্ড পেষণ-জাত গুড় রপ্তানির কথা উল্লেখ করেছেন।

সর্ষপ ঃ পুণ্ড্রদেশের অন্যতম শস্য ছিল সর্ষপ। বপ্য-ঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলিতে 'সর্ষপ-যানক' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল রাজাদের রাজত্বকালে বিভিন্ন লিপি থেকেও সর্ষপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহুয়া ঃ দিনাজপুর জেলার বানগড়ে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে মহুয়ার উল্লেখ আছে। মদনপালদেবের মনহলি তাম্রপট্টে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের খলাবর্তমণ্ডলে এক গ্রাম দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত তাম্রপট্টে লিখিত আছে, সতলঃ...সাম্রমধকঃ সজলস্থলঃ সর্গতোষরঃ। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন পুণ্ড্রবর্ধনে মহুয়ার চাষ ছিল। এই মহুয়া গাছের আয় দুই প্রকার। খাদ্য হিসাবে এবং মহুয়া বৃক্ষ জাত আসবাব থেকে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুণ্ড্রদেশের মহুয়া আসবাবের উল্লেখ আছে।

বাঁশ ও বিভিন্ন কাঠ ঃ বাঁশ ও অন্যান্য কাঠও ছিল পুণ্ড্রদেশের সাধারণ মানুষের অন্যতম আয়ের উৎস। শবরীপাদের চর্যাগীতিতে বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়ে যে জনসাধারণ ঘর বাঁধত তার উল্লেখ আছে। 'চারিপাশে ছাইলারে দিয়া চঞ্চালি।' সন্ধাকর নন্দীর রামচরিতেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

পান, সুপারি, নারিকেল ঃ পুণ্ড্রদেশের অন্যতম কৃষিজাত উৎপাদন ছিল, পান, সুপারি ও নারিকেল। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে 'সতলা। ....সাম্রপনসা। সগুবাক-নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা সগর্তোষরা। লক্ষণসেনের তর্পণদীঘি শাসন থেকে জানা যায় এই সময় সাধারণ জনের অন্যতম আয়ের উৎস ছিল ঝাট-বিটপ ও গুবাক-নাকিরেল। অনুশাসনটিতে একটি দত্তভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। দত্তভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলহিষ্ঠি গ্রামে। ভূমির পরিমাণ ১২০ আঢ়াবাপ, ৫ উন্মান। বার্ষিক আয় ১৫০ কর্পদকপুরাণ (চার কড়িতে এক গণ্ডা, ষোল গণ্ডায় এক কর্পদকপুরাণ), আনুলিয়া শাসনে আর একটি দত্তভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের অন্তর্গত মাথরণ্ডিয়া-খণ্ডক্ষেত্র; ভূমির পরিমাণ ১ পাটক, ৯ দ্রোণ, ১ আঢ়াবাপ, ৩৭ উন্মান এবং ১ কাকিনিক; বার্ষিক আয় (উৎপত্তিমূল্য) ১০০ কর্পদক পুরাণ। আয়ের অন্যতম উৎস ঝাট-বিটপ এবং গুবাক-নারিকেল। সুন্দরবন শাসনে দত্তভূমির পরিমাণ ৩ ভূদ্রোণ, ১ খাড়িকা, ২৩ উন্মান, ২৷৷০ কাকিনিকা। বার্ষিক আয় ৫০ পুরাণ। উক্ত ভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের কান্তল্লপুর চতুরকের মণ্ডলগ্রামের অন্তর্গত। আয়ের অন্যতম উৎস ঝাট-বিটপ, এবং গুবাক-নারিকেল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

বিশ্বরূপসেন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে ১১টি ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন। দু'টি ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন রামসিদ্ধি পাটকে। ভূমির পরিমাণ ৬৭.৭৫ উন্মান, বার্ষিক আয় ১০০ পুরাণ। আয়ের এক পঞ্চমাংশ পান বরজ থেকে হত। বিনয়তিলক গ্রামে দত্ত ২৫ উন্মান ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৬০ পুরাণ। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রপট্টোলী থেকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বিক্রমপুর ভাগে পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামে দু'টি ভূমিখণ্ড দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত ভূমির আয় ৬২৭ পুরাণ। প্রধান উল্লিখিত উৎপন্নজাত পণ্য ছিল গুবাক-নারিকেল।

আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল ঃ প্রাচীন পুণ্ড্রদেশে আম, পনস্ অর্থাৎ কাঁঠাল, ডালিম, খেজুর, নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। য়ুয়ান চোয়াঙ উল্লেখ করেছেন, পুণ্ড্রবর্ধনে প্রচুর কাঁঠাল উৎপন্ন হত। সুপারী ও নারিকেল উৎপন্ন হত গঙ্গা-পদ্মা, ভাগীরথী-করোতোয়া এবং সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে ডালিম ক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। খেজুরের উল্লেখ পাওয়া যায় ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির ফলকে কলা গাছের চিত্র থেকে অনুমান করা যায় এদেশে প্রচুর কলা উৎপন্ন হত।

পাট, শন, রেশম, কার্পাস ঃ পুণ্ড্রদেশে পাট, শন, রেশম ও কার্পাসের চাষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে পৌণ্ড্রদেশের দুকূল অর্থাৎ শন বস্ত্র ছিল বিখ্যাত। কৌটিল্যের রচনা থেকে জানা যায়, পৌণ্ড্রদেশের দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মত সুদৃশ্য। এই দুকূল বস্ত্র অত্যন্ত সুক্ষ্ম। কার্পাস বস্ত্রের জন্য পুণ্ড্রদেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার গাঙ্গেরী, সিলহটি, মেঘ-উদুম্ব বস্ত্র পৃথিবী বিখ্যাত। খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে পুণ্ড্রদেশ রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এখানকার সর্বোত্তম রেশম বস্ত্রের নাম 'পত্রোর্ণ'। 'অমরকোষ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'পত্রোর্ণ' সাদা অথবা ধোয়া কৌষেয় বস্ত্র। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আরও জানা যায়, পুণ্ড্রদেশে সুক্ষ্ম 'দুকূল' ও 'পত্রোর্ণ' বস্ত্র ব্যতীত মোটা ক্ষৌমবস্ত্রও ছিল।

চর্যাগীতিতেও কার্পাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। শবরপাদের একটি পদে উল্লেখ আছে—

হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।।

তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উত্রলা।
ফিটেলি অন্ধ্যারি রে আকাশ ফুলিআ।।

অর্থাৎ বাড়ির বাগানে কার্পাস ফুল ফুটেছে। সেই কারণে আনন্দ। যেন ঘরের চারপাশ উজ্জ্বল হল। আকাশের অন্ধকার দূর হল।

শান্তিপাদে উল্লেখ পাওয়া যায়,—

তুলাঁ ধুঁনি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুঁনি ধুঁনি সুনে আহারিউ।
পুন লইয়া অপনা চটারিউ।।

অর্থাৎ তুলা ধুনে আঁশ তৈরী করা হচ্ছে। আঁশ ধুনে আর কিছু বাকী নেই। তুলা ধুনে শূন্যে ওড়াই। আবার তা ছড়িয়ে দিই। এই পদটির গূঢ় অর্থ থাকতে পারে কিন্তু এই পদটির মধ্যে একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। কাহ্নপাদে তাঁত বিক্রয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্রীপাদে তাঁত শিক্ষকের বর্ণনা আছে।

এলাচ, তেজপাতা, লবঙ্গ ঃ প্রাচীন পুণ্ড্রদেশে যে এলাচ, তেজপাতা ও লবঙ্গের চাষ হত তা গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। টলেমি লিখেছেন, গঙ্গা বন্দর থেকে প্রচুর তেজপাতা ও পিপ্পলি রোমান ও মিশরীয় বণিকরা ক্রয় করে নিয়ে যেতেন। প্লিনির (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী) রচনা থেকে জানা যায় রোম দেশে এক পাউণ্ড পিপ্পলীর দাম ছিল ১৫ দিনার (১৫টি স্বর্ণমূদ্রা)। সন্ধাকর নন্দীর রামচরিতে উল্লেখ আছে বরেন্দ্রভূমি তথা পুণ্ড্রবর্ধনে উৎকৃষ্ট এলাচ উৎপন্ন হত। এদেশের এলাচ ও লবঙ্গ এশিয়া, মিশর ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে রপ্তানি হত। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকেও পুণ্ড্র দেশের এলাচ ও লবঙ্গ উৎপন্নের বিষয়টি জানা যায়। রাজশেখর তার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে যে ১৬টি জনপদের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে পুণ্ড্রদেশ উল্লেখযোগ্য। রাজশেখর পুণ্ড্রদেশে উৎপাদিত অগুরু, দ্রাক্ষা ও কস্তুরিকার উল্লেখ করেছেন।

শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য

পুণ্ড্রদেশে শিল্পজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে বস্ত্রশিল্প ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে লিখেছেন, পুণ্ড্রদেশের বস্ত্র ছিল সূক্ষ্ম এবং মণির মত সুদৃশ্য। 'অমরকোষ' এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকেও পুণ্ড্রদেশের 'দুকূল', 'পত্রোর্ণ', 'গাঙ্গেরী', 'সীলহটি' প্রভৃতি রেশমজাত, শনজাত ও কার্পাসজাত বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বস্ত্রশিল্পের পরেই উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলি হল কারুশিল্প, রত্নশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, মৃৎশিল্প, নৌশিল্প, লৌহশিল্প, কাংস্যশিল্প, অলংকার শিল্প ও কাষ্ঠশিল্প। পুণ্ড্রদেশে সোনা, রূপা, মণিমানিক্য, দামী পাথরের অলংকারের ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর অলংকরণ থেকে তা অনুমান করা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে সোনা, হীরা, মুক্তা ও দামী পাথরের অলংকারের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একটি অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনির একটি তালিকায় অন্যান্য জনপদগুলির সঙ্গে পৌণ্ড্রক ও ত্রিপুর জনপদের উল্লেখ করেছেন। রত্নপরীক্ষা, বৃহৎসংহিতা, নবরত্নপরীক্ষা, রত্নসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে পণ্ড্রদেশ যে এক সময় হীরার জন্য বিখ্যাত ছিল তার উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে গাঙ্গেয় মুক্তা ও মহাভারতে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদগুলিতে সমৃদ্ধ মণি মুক্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতেও অন্তপুরের নারীদের মূল্যবান অলংকার-সজ্জায় উল্লেখ পাওয়া যায়। পুণ্ড্রদেশের লৌহশিল্প ছিল উল্লেখযোগ্য। কৃষিকাজ ও কৃষিসমাজের অন্যতম হাতিয়ার লৌহশিল্প। লাঙ্গল, কুঠার, কোদাল, বিভিন্ন লৌহপাত্র, খুন্তি, বর্শা, তরোয়াল প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র পুণ্ড্রদেশে লৌহশিল্পের প্রমাণ। মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় মহাস্থানগড়, চন্দ্রকেতুগড়, পাহাড়পুরে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়া মাটির ফলক ও মৃৎপাত্রে। প্রাচীন পুণ্ড্রদেশে কাঠশিল্পের প্রচলন ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে কাঠের তৈরী স্তম্ভ, খিলান শিল্পনৈপুণ্যে ছিল অসাধারণ। প্রাচীনকালে কাঠের তৈরী নৌকা ও সমুদ্রগামী জাহাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে নৌশিল্পের বিষয়টি আলোচনা করা যায়। ঈশানবর্মার হড়াহা লিপিতে (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) লিখিত আছে, গৌড়ান সমুদ্রাশ্রয়ান। সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও বাণিজ্যের জন্য পুণ্ড্রদেশে নৌযানের প্রচলন ছিল। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর লিপিতে (৫০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দ) নৌযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল ও সেন যুগের বিভিন্ন লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান প্রভৃতি উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় সেকালে নৌশিল্প ছিল উল্লেখযোগ্য।

বনজ সম্পদ

পৌণ্ড্রদেশে বহুসংখ্যক মানুষ বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জন করত। এখানেই অবস্থিত ছিল বিখ্যাত 'আঙ্গিবীয়' মহা-অরণ্য। দণ্ডকারণ্য,

নৈমিষারণ্য প্রভৃতি যে তেরটি মহা-অরণ্যের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে, তার একটি হল এই আঙ্গিরীয় মহা অরণ্য। তাছাড়া হিমালয়ের তরাই অঞ্চল ও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে যে অরণ্য সেখান থেকে তারা কাঠ, মধু, মোম সংগ্রহ করত।

পশুপালন ও মৎস্য শিকার

কৃষি ও বাণিজ্যের সঙ্গে পশুপালনও ছিল বহু সংখ্যক মানুষের জীবিকা। গরু, মহিষ, প্রভৃতি পরিবারের সম্পদ হিসাবে গণ্য হত। পুণ্ড্রদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীক ছিল হাতি। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে প্রাসী ও গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের সম্রাটদের হস্তীবাহিনীর উল্লেখ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, হস্তীর পরিচর্যার জন্য হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়া মাটির ফলকগুলিতে যে সকল গৃহপালিত জীবজন্তুর চিত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে গরু, শুকর, ঘোড়া, উট, হাঁস উল্লেখযোগ্য।

পুণ্ড্রদেশে অসংখ্য মানুষ ছিল মৎস্যজীবী। মৎস্যের অন্তর্দেশীয় ব্যবসা ছিল। বিভিন্ন প্রকার মৎস্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ভবদেব ভট্টের রচনায়। শুকনো মৎস্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মৎস্যের মূল্য ও চাহিদা যে যথেষ্ট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন দান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলি থেকে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলিতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নৌজীবী

পুণ্ড্রদেশে সেযুগে বহু সংখ্যক নৌজীবী মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নদীগামী নৌকা ও সমুদ্রগামী জাহাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর হড়াহা লিপিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসের রঘুবংশ, পাল ও সেনযুগের বিভিন্ন লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান (Fleet of boats) প্রভৃতির উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয়, নৌশিল্প ও নৌজীবী বহু সংখ্যক মানুষ এই সময় ছিল। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর লিপিতে (৫০৭-৮ খ্রীঃ) পোতাশ্রয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে খেয়া পারাবারের 'পারানি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। খেয়া পারাবার থেকে রাষ্ট্রের আয় হত।

হাট বাজার

হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয়গৃহ, হট্টবর, আপন, মালপ ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ বিভিন্ন লিপিমালায় পাওয়া যায়। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের উল্লেখ থেকে অন্তর্বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যায়। কোটালীপাড়া ও দামোদরপুর পট্টোলিতে উল্লেখ পাওয়া যায়, নব্যাবকাশিকা ও কোটিবর্ষ বণিক এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পুণ্ড্রদেশের সমৃদ্ধ, বিচিত্র বিপণিমালা শোভিত বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ আছে। ইরদা লিপি, দামোদর লিপি, খালিমপুর লিপি এবং গোবিন্দকেশবের ভাটেরা লিপি থেকে হাটবাজার সমেত ভূমি বা গ্রাম দান-বিক্রয়ের বিষয়টি জানা যায়। এই সকল হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হত। ভূমিজাত উৎপন্ন শস্য, মৎস্য, পান, সুপারি, নারিকেলের বিস্তৃত ব্যবসা ছিল। বণিকেরা দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারতে এই সকল সামগ্রী ব্যবসা উপলক্ষে নিয়ে যেতেন।

ব্যবসা বাণিজ্য

পুণ্ড্রদেশের বণিকেরা একদিকে যেমন স্থলপথে ভারতের বিভিন্ন নগরের সঙ্গে বাণিজ্য করত অপরদিকে সমুদ্রপথেও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, মিশর , গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় ঐতিহাসিকদের রচনায় তার উল্লেখ আছে। 'মহাস্থান', 'কোটিবর্ষ' 'গঙ্গে' প্রভৃতি প্রাচীন নগর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'গঙ্গে' বন্দরে তেজপাতা, সুগন্ধি অঞ্জন তেল, প্রবাল, মুক্তা, মসলিন ও বিভিন্ন মসলা বিক্রয় হত। রোমে এ দেশের রপ্তানীজাত এক সের লঙ্কার দাম ছিল ত্রিশ স্বর্ণদিনার। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে উল্লিখিত আছে, পাটলীপুত্র থেকে বাণিজ্য উপলক্ষে বণিকেরা পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন। চর্যাপদের অসংখ্য পদে পুণ্ড্রদেশের নৌবাণিজ্য বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা' সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বারাণসী থেকে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বাণিজ্যিক পথ ছিল। য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণীতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কজঙ্গল (উত্তর রাঢ) থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে গিয়েছিলেন। বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা' গ্রন্থে গৌড় থেকে গুজরাট

পর্যন্ত বাণিজ্য পথের উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ, কামরূপ থেকে সমতট এই বাণিজ্য পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায় য়ুয়ান চোয়াঙের রচনায়।

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, গঙ্গাবন্দর থেকে বণিকেরা 'কোলণ্ডিয়া' নামে বাণিজ্যিক জাহাজে পণ্য সামগ্রী নিয়ে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে যাতায়াত করত। প্লিনির রচনা থেকে জানা যায়, প্রাচ্যদেশ থেকে সিংহলে যেতে কুড়ি দিন সময় লাগত। পরবর্তীকালে বিশেষ গতিসম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজগুলি সাত দিনে এই পথ অতিক্রম করত। প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে এ দেশের সঙ্গে সিংহল, সুবর্ণভূমি, কম্বোজের সঙ্গে যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ মেলে। দক্ষিণ পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে অর্থাৎ সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানগুলিতে বহু সংখ্যক মিশরীয়, গ্রীক ও রোমান নিদর্শন পাওয়া গেছে। চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা প্রভৃতি স্থানে গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় নিদর্শন পাওয়া গেছে। দিনাজপুরে বানগড়ে পাওয়া গেছে কম্বোজ রাজাদের নিদর্শন। এখানেই ছিল পুণ্ড্রদের অন্যতম নগর কোটিবর্ষ। পুণ্ড্রদেশের রাজধানী মহাস্থানগড়ও ছিল অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। সাম্প্রতিককালে খননকার্যের ফলে এখানে একটি নৌ-বন্দরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

মুদ্রা

কোন দেশের সমৃদ্ধি, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের সঙ্গে মুদ্রাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উৎপাদিত সামগ্রী মুদ্রায় বিনিময় হয়। অবশ্য বিনিময় প্রথাও সে যুগে ছিল। তবুও মুদ্রার গুরুত্বই সর্বাধিক। প্লিনির রচনায় উল্লেখ আছে, আধসের পিপ্পলির দাম পনের স্বর্ণ-দিনার এবং এ দেশের বস্ত্রশিল্পের বার্ষিক রপ্তানীর মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা। এই মুদ্রা ছিল সুবর্ণমুদ্রা (দিনার) ও রৌপ্য মুদ্রা (দ্রম্ম)। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন পট্টোলীগুলিতে স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার) অনুযায়ী ভূমির মূল্যের উল্লেখ আছে। পাল যুগের লিপিগুলিতে রৌপ্য দ্রম্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মপালের মহাবোধি লিপিতে লিখিত আছে, 'সহস্রেণ দ্রম্মাণাংঘানিতা।' দ্রম্ম থেকেই দাম শব্দের উৎপত্তি। মহাস্থানগড়ের শিলালিপিতে 'গণ্ডক' মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। গণ্ডক মুদ্রার সঙ্গে 'গণ্ডক' গণনা রীতির সম্পর্ক আছে। মহাস্থানলিপিতে 'কাকনিক' নামে আরও একপ্রকার মুদ্রার পরিচয় আছে। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গঙ্গা বন্দরে 'ক্যালটিস' (Caltis) নামে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন

ছিল। সম্ভবত সংস্কৃত কলিত শব্দেরই রূপান্তর ক্যালটিস। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে Kallais নামে এক প্রকাব মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন পূর্ব ভারতেও এই মুদ্রার প্রচলন ছিল। কনক বড়ুয়া লিখেছেন, আসামেব কলিত বণিকেরা Kaltis স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করত। পুণ্ড্রদেশে শীলমোহর অঙ্কিত ঢালাই করা তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়, বানগড় ও চন্দ্রকেতুগড়ে। মুদ্রাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব যুগের। মহাস্থান শিলালিপিতে ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা 'গণ্ডক' ও 'কাকনিক' নামে যে দু'টি মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মূল্যমান নির্ণয় করা যায়। গণ্ডক মুদ্রা (চার কড়িতে এক গণ্ডা) অর্থাৎ চার কড়ির সমমান ছিল। কৌটিল্যের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিশ কড়ির সমান মূল্য ছিল 'কাকনিক' মুদ্রা।

গুপ্তযুগে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে স্বর্ণ এবং রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল রূপক। বৈগ্রাম পট্টোলীতে উল্লিখিত আছে, আটটি রূপক মুদ্রা অর্ধ স্বর্ণ দিনারের সমান (ষোল রূপক মুদ্রায় এক দিনার)।

পুণ্ড্রদেশে মুদ্রার সর্বনিম্ন মান ছিল কড়ি। ফা-হিয়েনের রচনা ও চর্যাপদে কড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহার করত। ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' গ্রন্থে (১১১৪ খ্রীঃ) উল্লেখ আছে, কুড়ি কড়িতে এক কাকিনী, ষোলো পণে এক দ্রম্ম (এক দ্রম্ম সমান এক রূপক), ষোলো দ্রম্মে এক নিষ্ক (এক নিষ্ক সমান এক দিনার)। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কড়ি সমুদ্র-জাত। উত্তর বঙ্গোপসাগরে কড়ি বিশেষ পাওয়া যায় না। সুতরাং কড়ি বাণিজ্যিক দ্রব্য এবং ভিন প্রদেশ থেকে মূল্য দিয়ে কড়ি আমদানী করা হত।

পুণ্ড্রদেশের বাণিজ্যপথ

যে কোন রাষ্ট্র ও তার সভ্যতার ইতিহাস আলোচনায় বাণিজ্যপথের বিষয়টি বিশেষ প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন পুণ্ড্রদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপি, চৈনিক, গ্রীক, রোমান পর্যটক ও লেখকদের রচনায় পুণ্ড্রদেশের বাণিজ্যপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থলপথ ছাড়াও নদীমাতৃক দেশে জলপথে পরিবহনের উল্লেখ প্রাচীন লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এছাড়া সমসাময়িক প্রাচীন সাহিত্যে সমুদ্রাশ্রয়ী পুণ্ড্রদেশের ইতিহাস, অসংখ্য নৌযান, নৌবিতান, নৌদণ্ডক প্রভৃতির কথা জানা যায়। বস্তুত প্রাচীনকালে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে যাতায়াত ও বাণিজ্য অধিকতর ছিল। পুণ্ড্রদেশের স্থলপথ ও জলপথ তার রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে দেশান্তরে বিস্তৃত ছিল। এই সকল পথে শত শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মানুষ তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ ও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে পুণ্ড্রদেশের জনপদগুলিতে এসেছে। আবার পুণ্ড্রদেশের জনসাধারণও বিভিন্ন দেশে গিয়েছে।

অন্তর্দেশীয় স্থলপথ

ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চোয়াঙ, ইৎসিঙ প্রভৃতি চৈনিক পর্যটকদের বিবরণে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি বিস্তৃত পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান-চোয়াঙ (সপ্তম শতাব্দীতে) বারাণসী, বৈশালী, পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, চম্পক প্রভৃতি পরিভ্রমণ করে কজঙ্গলে এসেছিলেন। কজঙ্গল থেকে তিনি পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ পরিভ্রমণ করে য়ুয়ান চোয়াঙ সমতটে আসেন। তারপর তিনি তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ পরিভ্রমণ করেন। কর্ণসুবর্ণ থেকে য়ুয়ান-চোয়াঙ ওড্র ও কলিঙ্গ দেশে গিয়েছিলেন। য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণে অন্তর্দেশীয় এই পথের উল্লেখ প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কজঙ্গল থেকে একটি বাণিজ্যপথ যেমন পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তেমনি পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ, সমতট ও তাম্রলিপ্তির মধ্যেও বাণিজ্যপথের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বহির্দেশীয় স্থলপথ

এইবার বহির্দেশীয় স্থলপথের আলোচনা করা যাক। সোমদেবের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি বিস্তৃত পথের উল্লেখ আছে। বস্তুত পুণ্ড্রবর্ধন থেকে একটি পথ মিথিলা, চম্পা (ভাগলপুর), পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, বারাণসী, অযোধ্যা হয়ে সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের সমুদ্রবন্দরগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থে এই পথের উল্লেখ আছে।

পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সুদীর্ঘকাল বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। এই পথের বিবরণ পাওয়া যায় য়ুয়ান-চোয়াঙ এবং কিয়া তানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং চীনা রাজদূত চাঙ-কিয়েনের রচনায়। এই পথেই প্রাচীন কামরূপ ও দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলির সঙ্গে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য হত। য়ুয়ান-চোয়াঙের সাতশত বছর পূর্বে চীনা রাজদূত চাঙ-কিয়েন (১২৬ খ্রীঃ পূঃ) দক্ষিণ চীনের য়ুয়ান ও সজেচোয়ান থেকে উত্তর ব্রহ্মা, মণিপুর, কামরূপ, পুণ্ড্রবর্ধন, পাটলিপুত্র, বারাণসী হয়ে আফগানিস্থান পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথের বিবরণ লিখে গেছেন। ব্যাকট্রিয়ার বাজারে তিনি দক্ষিণ চীনের য়ুয়ান ও সজেচোয়ান প্রদেশের রেশমী বস্ত্র ও সুক্ষ্ম বাঁশের অনুসন্ধান পেয়ে জেনেছিলেন এই সকল দ্রব্যাদি দক্ষিণ চীন থেকে ভারতবর্ষের পথে এখানে আসে। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ কামরূপবাসীদের কাছ থেকে এই পথের খবর পেয়েছিলেন। নবম শতকের প্রথম দিকে কিয়া-আন (৭৮৫-৮০৫) নামে এক চীনা পর্যটকের রচনায় টঙ্কিন শহর থেকে কামরূপ পর্যন্ত এক বাণিজ্যপথের বিবরণ পাওয়া যায়। এই পথটি চাঙ-কিয়েন রর্ণিত পথের সঙ্গে মিলিত হয়ে কজঙ্গল ও মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কজঙ্গল থেকে পুণ্ড্রবর্ধন হয়ে কামরূপ পর্যন্ত যে পথের উল্লেখ কিয়া-তান করেছেন সেই পথই সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙের পথ।

পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ হয়ে তিব্বত পর্যন্ত একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। পুড্রবর্ধন থেকে আরও একটি পথ সিকিমের মধ্য দিয়ে তিব্বত এবং চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস্ম গ্রন্থে (প্রথম শতক) এই পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতেরও যোগাযোগ ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ কর্ণসুবর্ণ থেকে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র হয়ে দ্রাবিড়,

চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। এই পথটি পুণ্ড্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথেই পাল রাজারা দক্ষিণ দেশ আক্রমণে গিয়েছিলেন। অপরদিকে চোল, চালুক্য রাজারা এই পথেই বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন ।

অন্তর্দেশীয় নদীপথ

নদীমাতৃক পুণ্ড্রদেশে অন্তর্দেশীয় নদীপথের উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে। শঙ্খজাতক, সমুদ্দবণিকজাতক, মহাজনকজাতক প্রভৃতি কাহিনীতে উল্লেখ আছে বারাণসী ও চম্পা দেশের বণিকেরা গঙ্গা ভাগীরথী পথে পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের জলপথেও বণিকদের যাতায়াত ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণটিতে কামরূপ থেকে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত জলপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জলপথ সম্ভবত পুণ্ড্রদেশের মধ্য দিয়েই ছিল। করতোয়া প্রাচীনকালে খরস্রোতা ও প্রশস্ত নদী ছিল এবং সমুদ্র পর্যন্ত এই নদীর জলধারা প্রবাহিত ছিল। এই নদীপথেই পুণ্ড্রদেশের বণিকেরা সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হতেন এবং সিংহল ও সুবর্ণভূমিতে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান করতেন।

সমুদ্রপথ

পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, গঙ্গাবন্দর থেকে বাণিজ্য সম্ভার 'কোলণ্ডিয়া' নামক জাহাজে বোঝাই করে বণিকেরা সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্য করতে যেত। প্লিনিও এই বাণিজ্য পথের উল্লেখ করেছেন। শ্রীলঙ্কা প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। সেই কারণে ফা-হিয়েন থেকে ইৎ-সিঙ প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণ তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সমুদ্রপথেই শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন। সমুদ্রপথে পুণ্ড্রদেশের বণিকেরা সিংহল থেকে গুজরাটেও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করত। এছাড়া মালয়, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা ও কম্বোজ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে পুণ্ড্রদেশের বণিকদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল।

পার্বত্যপথ

'তবকাত-ই-নাসিরি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মহম্মদ বখতিয়ার নুদিয়া (নদীয়া) জয় করে (গৌড়ে) লক্ষ্মণাবতীতে নিজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তিব্বত জয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। পথে তিনি প্রশস্ত খরস্রোতা নদী (খরতোয়া-করতোয়া) পার হয়ে দশ দিন সেই নদীর কূল ধরে চলার পর পাথরে তৈরী কুড়িটি খিলানযুক্ত একটি সেতু পার হন। এরপর আরও ষোল দিন চলার পর একটি প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ নগর দেখতে পান। সেইখানে তিনি সংবাদ পান যে এই স্থান থেকে ২৫ ক্রোশ দূরে করপত্তন বা করবত্তন নামে একটি স্থানে পঞ্চাশ হাজার তুরস্ক সৈন্য আছে। সেখানকার বাজারে প্রতিদিন ১৫০০ টাঙ্গা (টাট্টু) ঘোড়া বিক্রয় হয়। লক্ষ্মণাবতীতে যে সব ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি ওখানকার বাজার থেকেই কেনা। ওখান থেকে একটি পার্বত্য পথ তিব্বত দেশে গিয়েছে। তিব্বত থেকে কামরূপ পর্যন্ত এই পার্বত্য পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং এই পথে পঁয়ত্রিশটি গিরিবর্ত্ম আছে। বখতিয়ার তিব্বত পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি। মাঝপথেই পর্যুদস্ত হয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন। মিনহাজ তার বিস্তৃত বিবরণ লিখে গেছেন। বখতিয়ারের এই ব্যর্থ অভিযান গৌহাটির নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কানাই-বরশীবোয়া নামক স্থানে পাথরের গায়ে খোদিত একটি শিলালিপিতেই উল্লেখ আছে।

শাকে ১১২৭ (১২০৬, ২৭শে মার্চ আনুমানিক)
শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগতা তুরস্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ।

যাই হোক এই পথ যে তিব্বত পর্যন্ত ছিল, কোন সন্দেহ নেই।

পুণ্ড্রদেশে ধর্ম ও লোক উৎসব

ভারতীয় সমাজ শ্রেণী, বর্ণ ও কৌমভেদে বিভক্ত। বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ ও কৌমের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারও বিভিন্ন রূপে বর্তমান। সেই সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রেক্ষাপটে সুদীর্ঘ ইতিহাসও আছে এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা সমসাময়িক রূপ পরিগ্রহ লাভ করে। আবার বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সঞ্চারিত হয় এবং মিলন ও বিরোধের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হয়। হিন্দুধর্ম প্রভাবিত ভারতবর্ষে যে ধর্ম সাধনা তা আর্য এবং অনার্য এই দুই ধর্ম সাধনার মিলন রূপ। মানব সভ্যতার আদি কাল থেকে অনেক স্তর অতিক্রম করে যে ধর্ম সাধনা বহমান তা বৈচিত্র্যে সমধিক। বস্তুত ভারতীয় ধর্ম সাধনায় বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর্য ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকেরা পারস্পরিক বিরোধ এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তাদের ধর্মসাধনা ও ধর্মপ্রচার করেছিলেন। প্রাক্-আর্য অধিবাসীরা কখনই তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে আর্য ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধধর্মের প্রবাহে বিসর্জন দেয় নি। চলমান আর্য প্রবাহ স্বীকৃতি লাভের পরও সেই আর্য প্রবাহের মধ্যে অনার্যরা তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতির চর্চা করেছিল। ক্রমে ক্রমে চলমান প্রবাহে তা স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে কখনও অবিকৃত রূপে আবার কখনও বিবর্তিত রূপে। সেই প্রক্রিয়া আজও প্রবহমান। আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম লোকায়ত অনার্য ধর্মের বহু আচার অনুষ্ঠান, দেবদেবী গ্রহণ করেছে। মূলত পূর্ব-ভারতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং আজও তা বহমান। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদের অসংখ্য জন ও কোমের এক কথায় বাঙলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। আর্য-ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতেই আত্মসাৎ করিয়াছি। পরলোক সম্পর্কে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান সমস্তই আমাদের প্রতিবাসীর।'

লোকায়ত ধর্ম

পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা বৃক্ষ, পাথর, বিশেষ স্থানের উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করত। তুলসী গাছ, বটবৃক্ষ প্রভৃতির উপর দেবত্ব আরোপ আজও বহমান। বিভিন্ন ব্রত, পূজা ও শুভানুষ্ঠানে যে বৃক্ষপল্লব, বিশেষত আম্রপল্লব, ধানের ছড়া, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, কলাগাছ, সিঁদুর, ঘট ও ঘটের উপর আঁকা মঙ্গলচিহ্ন, এই সমস্তই প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের ধর্ম ও বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। বস্তুত প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসে অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রভাব প্রবল। প্রাচীন পুণ্ড্রদেশে যে সকল দেবদেবীর পূজার্চনা হত সেগুলির মধ্যে ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা, শিব ও কালী অন্যতম। তাছাড়া গ্রামীণ ও কৃষিজীবী সমাজে পৌষপার্বণ নববর্ষের উৎসব তো ছিলই। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, যে ধর্ম ও সংস্কৃতি বাঙালীর জীবনের গভীরে বিস্তৃত, যে জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করে গ্রামের কুটির, চাষীর মাঠে, বারোয়ারীতলায়, বটবৃক্ষের ছায়ায় অথবা জনহীন শ্মশানে দুঃখ, সুখ, মৃত্যুর লীলায় বিস্তৃত, সেই ধর্ম ও সংস্কৃতি তার প্রাণপ্রাচুর্যে আজও প্রবহমান।

থান বা স্থান গ্রামদেবতার পূজা

প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের গ্রামীণ জীবনে থান বা স্থানের উপর দেবত্ব আরোপ করে সেখানে কোন দেবতার পূজা করা হত। এই দেবতা কোন স্থানে নিরাকার, আবার কোন স্থানে মূর্তিরূপী। মূর্তিরূপী দেবতা কালী, ভৈরবী, শিব, শীতলা, মনসা, অথবা শ্মশানচণ্ডী। এই দেবতা গ্রাম দেবতা। গ্রামের অধিবাসীরা তাদের মঙ্গল কামনায় এই গ্রাম দেবতার পূজা করেন। আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রথম দিকে এই সকল গ্রাম দেবতা পূজার বিরোধী ছিল। মনু এই সকল দেবতার পূজারীদের পতিত আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সকল অনার্য গ্রাম দেবতারা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকৃত হয়।

বৃক্ষপূজা

বৃক্ষপূজাও প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের এক ধর্মীয় উৎসব। গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে আছে, 'ত্বয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবনো বসতু বা লক্ষ্মী। পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা'। অর্থাৎ হে কুগ্রামের বটগাছ, তোমার মধ্যে বৈশ্যবর্ণের (কুবের) অথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকুক বা না থাকুক, মূর্খ গ্রাম্য লোকের কুঠারাঘাত থেকে মহিষের শৃঙ্গ তাড়না তোমাকে রক্ষা করে। সদুক্তিকর্ণামৃতেও উল্লেখ আছে;

তৈস্তৈর্জীরোহারৈর্গিরি সংশ্রয়ার্মচয়িত্বা।
দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্বা।
তুম্বীবীনা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহ্নি জীর্ণে পুরানীং
হালাং মালুরকৌষের্যুবতি সহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি।

অর্থাৎ গ্রামের লোকেরা জীববলি দিয়ে পাথরের পূজা করে, কান্তার দুর্গার পূজা করে রক্ত দিয়ে, বৃক্ষতলায় ক্ষেত্রপালের পূজা করে, তাদের যুবতীদের নিয়ে দিনের শেষে তুম্বীবীনা বাজিয়ে নাচ গান করে, বেলের খোলায় মদ পান করে আনন্দ করে।

কৃষিপ্রধান পুণ্ড্রদেশে বিভিন্ন বৃক্ষদেবতার পূজার্চনা হত। আখমাড়াই ঘরের দেবতা পণ্ডাসুর বা পুণ্ড্রাসুর নামে খ্যাত। কৃষিজীবী পুণ্ড্রজাতি একদা বহুল পরিমান আখ চাষ করত। একপ্রকার আখের নামও পুঁড়। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এখনও কোন কোন স্থানে পণ্ডাসুরের পূজা হয়। এই দেবতা পড়াসর (পরাশর) নামে খ্যাত।

হোলী উৎসব

হোলী উৎসব উত্তর ভারতের ন্যায় পূর্ব ভারতের প্রাচীন উৎস। জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থে হোলী উৎসবের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্র (তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী), মালতীমাধব নাটক (অষ্টম শতাব্দী) এবং আলবিরুনীর (একাদশ শতক) রচনায় হোলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। হোলী প্রাচীনকালে ছিল কৃষিসমাজের পূজা। যৌবনের লীলাময় নৃত্যগীত এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন হোলী উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়। রামগড় গুহার এক লিপিতে (খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) ঝুলন উৎসবের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাক্ বৈদিক যুগের নৃত্যগীতোৎসব এ ভাবেই বর্তমান হোলীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

যাত্রা উৎসব

রথযাত্রা, স্নানযাত্রা প্রভৃতি উৎসবগুলিও আর্যপূর্ব পুণ্ড্রদেশের জনগোষ্ঠীর ধর্মোৎসব। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বৌদ্ধ সংযুক্তনিকায় গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আর্য ব্রাহ্মণরা এই সকল সামাজিক উৎসবের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু এই সকল লোকায়ত ধর্মের জনপ্রিয়তা ছিল। ক্রমেই এই সকল উৎসব ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সমাজে স্বীকৃত হয় । চন্দ্রকেতুগড়ে অনেক পোড়ামাটির খেলনা রথ পাওয়া গেছে। এই রথের উপর আসীন অগ্নি, কুবের প্রভৃতি দেবতা। নীহাররঞ্জন

রায়ের মতে, রথযাত্রা প্রাক্-আর্যযুগের একটি উৎসব। এই লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ আজও প্রবহমান। 'কালবিবেক' গ্রন্থে দশহরার স্নানযাত্রা, মাঘীসপ্তমী স্নানযাত্রা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রত উৎসব

আর্যপূর্বকালে পুণ্ড্রদেশের জনজীবনের উৎসবগুলির মধ্যে ব্রত উৎসব সুপ্রাচীন এবং এই ধর্মোৎসব প্রাক্-আর্য কোমগুলির মধ্যে প্রচলিত ছিল। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, যারা ব্রত ধর্ম পালন করত, আর্য ব্রাহ্মণরা তাদের ব্রাত্য নামে অভিহিত করেছে। ব্রতোৎসবগুলি অবৈদিক এবং গ্রামীণ কৃষি সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। আদি বৌদ্ধ ধর্ম এবং আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই অনুষ্ঠানগুলির বিরোধী ছিল। এই সকল গ্রাম্য লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান নারীদের মধ্যেই বেশী প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে লৌকিক ব্রতানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি পায়। সম্ভবত পুরাণ রচনাকালে এই স্বীকৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সময় ব্রাহ্মণেরা অবৈদিক এই সকল অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতেন। কোন কোন ব্রতোৎসব এখনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যতীতই নিষ্পন্ন হয়। মেয়েরাই এই সকল পূজা অনুষ্ঠান করে। কয়েকটি ব্রতের উল্লেখ করা হল ঃ

বৈশাখ মাস—অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত, জলসংক্রান্তি ব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, দশপুতুল ব্রত, পৃথিবী পূজা ব্রত, সন্ধ্যামণি ব্রত, অশ্বত্থ পাতার ব্রত, শিবপূজা ব্রত, গোকুল ব্রত, চম্পা-চন্দন ব্রত, হরিচরণ ব্রত, ধান গোছানো ব্রত।

জ্যৈষ্ঠ মাস—জয়মঙ্গল ব্রত, সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত, অরণ্য ষষ্ঠী ব্রত।

আষাঢ় মাস—ষট্পঞ্চমী ব্রত, বিপদতারিণী ব্রত।

শ্রাবণ মাস—লোটন ষষ্ঠী ব্রত, মনসা ব্রত।

ভাদ্র মাস—ভাদুরি ব্রত, তিলকুজারি ব্রত, অনন্ত চতুর্দশী ব্রত, চাপড়া ষষ্ঠী ব্রত।

আশ্বিন মাস—জিতাষ্টমী ব্রত, দুর্গাষষ্ঠী ব্রত, কোজাগরী ব্রত।

কার্তিক মাস—কুলকুলটি ব্রত, ইতুপুজা ব্রত।

অগ্রহায়ণ মাস—যমপুকুর ব্রত, নাটাইচণ্ডী ব্রত, মূলাষষ্ঠী ব্রত, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, তুষতুষলি ব্রত।

পৌষ মাস—পাটাই ষষ্ঠী ব্রত।

মাঘ মাস—শীতল ষষ্ঠীর ব্রত, ভৈমী একাদশীর ব্রত, তারণ ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত।

ফাল্গুন মাস—শিবরাত্রি ব্রত।

চৈত্র মাস—নীলষষ্ঠী ব্রত।

এই সকল ব্রতগুলি মূলত আর্যপূর্ব প্রাচীন কোমদের গুহ্য যাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির পূজার পরিচায়ক। যেমন—পুণ্যিপুকুর ব্রত বারিবর্ষণের জন্য গুহ্য যাদুশক্তির পূজা, শিবপূজা প্রজনন শক্তির পূজা, ভাদুরি ব্রত কৃষিসংক্রান্ত গুহ্য যাদুশক্তির পূজা, তিলকুজারি ব্রত কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা, কুলকুলটি ব্রত গুহ্য যাদু শক্তির পূজা, ইতুপূজা ব্রত প্রজনন শক্তির পূজা, যমপুকুর ব্রত কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা। তারণ ব্রত, তুষতুযালি ব্রতও সেই ইঙ্গিত বহন করে।

চড়ক

চড়ক একটি প্রাচীন প্রাক্-আর্য ধর্মোৎসব। নীল বা চড়ক পূজার দেবতা শিব। চড়ক উৎসবের বিশেষ কতকগুলি অঙ্গ হল জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, কাঁটা, ছুরি, বঁটির উপর ঝাঁপ, বাণফোঁড়া, চড়কগাছে দোলা, ভূত তাড়ানো। চড়কের গাজনও এই পূজা-উৎসবের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। গাজনের সময় ব্রত গ্রহণ করে যারা সন্ন্যাসী হয়, তারা ভক্ত। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল, সকলেই ব্রত গ্রহণের অধিকারী। শ্রেণীভেদে তিন দিন থেকে পনের দিন পর্যন্ত ব্রত গ্রহণের নিয়ম। ব্রতধারী দিনে উপবাস এবং সন্ধ্যায় ফলমূল আহার করে। ব্রতধারীর চিহ্ন কাঁধে উত্তরীয়, হাতে বেত্রদণ্ড। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভক্তরা অপরাহ্নে নির্দিষ্ট পুকুরে একসঙ্গে স্নান করে, পরস্পরের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে ব্রত গ্রহণ করে। চড়কপূজা আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

অম্বুবাচী

অম্বুবাচী পার্বণ আর্যপূর্ব যুগের অনার্য, অব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠান। পৌণ্ড্র জনসমাজের মধ্যে অম্বুবাচী পার্বণ পালনের রীতি সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে পৃথিবী ঋতুমতী হয়। এই সময় হলকর্ষণ বা মাটি খোঁড়া হয় না, যাতে পৃথিবীর অঙ্গে কোনরূপ আঘাত লাগে। এই বিশ্বাস প্রাক্-আর্য কৌম গোষ্ঠীর প্রজনন শক্তির পূজা ও তার আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

ঘটলক্ষ্মী পূজা

পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন লোকধর্মে ঘটপূজা প্রচলিত ছিল। মূলত লোকধর্মে ঘটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী শস্য ও সমৃদ্ধির দেবী। আদিম লৌকিক লক্ষ্মী পরবর্তীকালে পৌরাণিক লক্ষ্মী দেবীতে রূপান্তরীত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃত।

ষষ্ঠী পূজা

ষষ্ঠী প্রাচীন প্রাক্-আর্য জনগোষ্ঠীর লৌকিক দেবী। ষষ্ঠী দেবীর মূর্তিপূজা প্রচলিত নেই। পরবর্তীকালে ষষ্ঠী দেবী বৌদ্ধধর্মে হারীতী দেবীর কল্পনায় বিবর্তিত। বিনয়পিটক, সূত্রপিটক এবং ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা গ্রন্থে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ষষ্ঠীদেবী প্রজনন শক্তির প্রতীক। নারীরা সন্তান কামনা ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীর পূজা করে। সাধারণত কোন পুকুরঘাটে ষষ্ঠীর পূজা করা হয়। এই পূজা অনার্য নারীরাই করে। কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ষষ্ঠী পূজা করে না।

শীতলা পূজা

পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠীর মধ্যে শীতলা পূজা জনপ্রিয়তম। শীতলা মহামারীর দেবী। সম্ভবত বৌদ্ধ হারীতীর মারীনিবারক যাদুশক্তির পূজা বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির কালে গর্দভবাহিনী শীতলা দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। একদা প্রাচীন পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারলাভ ঘটেছিল। পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজা পার্বণ প্রচলিত ছিল। এখনও তার পরিবর্তিত স্রোতধারা প্রবহমান। সাধারণত বসন্তকালেই শীতলা পূজা সমধিক প্রচলিত। কারণ এই সময় হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। মহামারী এই সকল রোগে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হত। তাই দেবীকে তুষ্ট করার জন্য পূজা হত। শীতলা পূজা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বহির্ভূত পূজা।

মনসা পূজা

পূর্বভারতে প্রচলিত পূজাগুলির অন্যতম মনসা পূজা। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, 'সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক, মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব, এ তথ্য নিঃসন্দেহ।' মনসা সর্পদেবী। নদীমাতৃক পুণ্ড্রদেশে সর্পভীতি ও সর্পদেবীকে তুষ্ট করার জন্যও মনসা পূজার প্রচলন

আর একটি কারণ হতে পারে। মনসা অনার্য জনগোষ্ঠীর আরাধ্য দেবী। মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে প্রমাণিত হয়, বৈদিক সমাজে মনসা দেবীর পূজার প্রচলন ছিল না। পাল রাজত্বকালে মনসা পূজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে গৃহীত হয়। সেন রাজত্বকালেই মনসা পূজা প্রসারলাভ করে।

ধর্মঠাকুর

ধর্মঠাকুর প্রাক-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম ধর্মপূজার স্বীকৃতি দিলেও এই পূজা অনার্য অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ধর্মঠাকুরের প্রতীক পাদুকা চিহ্ন এবং পুরোহিতেরা অনার্য জনগোষ্ঠীভুক্ত। ধর্মঠাকুরের পূজার স্থানে গাজনের নাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই সকলই প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও লোকউৎসব। শূন্য পুরাণে লিখিত আছে, ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি, নিরঞ্জন। তার বাহন শাদা কাক। কর্মাকৃতি পাষাণখণ্ড প্রতীকেই তার পূজা হয় এবং পাষাণখণ্ডের উপর পাদুকা চিহ্ন আঁকা থাকে। প্রাক্ আর্য যুগের ধর্মঠাকুর বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে কখনও সূর্য, কখনও শিব, কখনও মহিষবাহন যমরাজরূপে পূজিত। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধ ও সংঘের সঙ্গে ধর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বৌদ্ধত্রয়ীর মধ্যম শব্দ ধর্ম এবং তার পূজা প্রাক্-আর্য কোমের ধর্মপূজা থেকে গৃহীত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ধর্ম শব্দটি সম্ভবত অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর।

তন্ত্রধর্ম

জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পূর্বে পুণ্ড্রদেশে ছিল তন্ত্রধর্ম। বেদের উৎপত্তির বহু পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্র মন্ত্রকলা নয়। তন্ত্রের ভাষা অনার্য ভাষা। বেদের মতোই লোক পরম্পরায় মুখে মুখে তার প্রচার ছিল। শব সাধন, পঞ্চমুণ্ডি-আসন, তন্ত্রধর্মে স্বীকৃত ছিল। পুণ্ড্রদেশ যখন বৌদ্ধধর্মে প্লাবিত হয়েছিল, তখন তন্ত্র ধর্মও বৌদ্ধধর্মকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভাস্কর্য, লোকনাথ, মৈত্রেয়ী, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি বোধিসত্ত্ব মূর্তি এবং তারা, মারীচি, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি বৌদ্ধদের শক্তিমূর্তিতে প্রাক্‌বৌদ্ধ তন্ত্রধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

জৈনধর্ম

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পুণ্ড্রদেশে জৈনধর্মের প্রসার ঘটে। 'বৃহৎকথাকোষ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু পুণ্ড্রবর্ধনের

অন্তর্গত দেবকোটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভদ্রবাহুর শৈশবে শ্রুতকেবলী গোবর্ধন দেবকোট ভ্রমণকালে ভদ্রবাহুকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করার অভিপ্রায়ে তার পিতার অনুমতিক্রমে সঙ্গে করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে ভদ্রবাহু দীক্ষিত হয়ে শ্রুতকেবলী পদ লাভ করেছিলেন। 'দিব্যাবদান' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সম্রাট অশোক পুণ্ড্রবর্ধনের নির্গ্রন্থদের (জৈনদের) অপরাধে পাটলীপুত্রের আঠার হাজার আজীবিকদের হত্যা করেন। এই সকল তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ, তৃতীয় শতকেই পুণ্ড্রদেশে জৈনধর্মের প্রসার লাভ ঘটেছিল। জৈন 'কল্পসূত্র' গ্রন্থ থেকে জৈন গোদাস-গণীয় ভিক্ষুদের চারটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারটি শাখার নাম তামলিত্তিয়া, কোডিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্ধনীয়া এবং খব্বাডিয়া। সুতরাং পুণ্ড্রদেশে জৈনধর্মের প্রভাব ও প্রসার যে হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। জৈন 'আচারঙ্গসূত্র' থেকে জানা যায়, মহাবীর এবং তার শিষ্যবর্গ বজ্রভূমি (রাঢ়দেশ)পবিভ্রমণ করেছিলেন। এই গ্রন্থসূত্র থেকে প্রমাণিত হয়, প্রাক্-আর্য কৌম সমাজে জৈনধর্মের প্রচার খুব সহজে হয়নি। জৈন আয়ারঙ্গ বা আচারঙ্গসূত্রে মহাবীর ও তার শিষ্যবর্গের বজ্রভূমিতে ধর্মপ্রচারকালে দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে জৈনধর্ম প্রসারলাভ করে।

দক্ষিণ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল খাড়িমণ্ডল। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যে সকল জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে ঋষভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ এবং পার্শ্বনাথের মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলি দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। দক্ষিণ ২৪ পরগণার আটঘরায় আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়ামাটির জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। কঙ্কণদীঘি থেকে সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে লাল পাথরের জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি (১১শ শতাব্দী)। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপির নিকট কাঁটাবেনিয়ায় পাওয়া গেছে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের একটি বিশাল দিগম্বর প্রস্তর মূর্তি। লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনের নিকটবর্তী ঘাটেশ্বর গ্রামে পাওয়া গেছে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তি। কৃষ্ণকালী মণ্ডল তার 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়' গ্রন্থে লিখেছেন, মূর্তিটি নগ্ন, সুগঠিত, অপূর্ব শান্ত ভঙ্গিমায় সর্পফণা ছত্রতলে দণ্ডায়মান। মূর্তিটি উচ্চতায় সাড়ে তিন ফুট এবং প্রস্থে পৌনে দুই ফুট। মূর্তিটির দুই পাশে বার জন করে মোট ২৪ জন তীর্থঙ্করের ছোট ছোট মূর্তি খোদিত। তার নীচে ছয় জন করে বার জন তীর্থঙ্করের যোগাসনে বসা ছোট ছোট মূর্তি। প্রথম

তীর্থঙ্কর আদিনাথের এই মূর্তিটির পাদপাঠের উপর আদিনাথের বিশেষ লাঞ্ছন চিহ্ন, একটি উপবিষ্ট বৃষমূর্তি দেখা যায়। এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করে যে পুণ্ড্রদেশে একদা জৈন ধর্মের প্রভাব খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

গুপ্তযুগে জৈনধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় পাহাড়পুর পট্টোলীতে। এই পট্টোলী থেকে জানা যায় পঞ্চম শতাব্দীতে বটগোহালীতে একটি জৈন বিহার ছিল। বটগোহালী বর্তমান পাহাড়পুর সংলগ্ন গোয়ালভিটার প্রাচীন নাম। য়ুয়ান চোয়াঙের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধনে দিগম্বর নির্গ্রন্থ জৈনদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বসবাস ছিল।

য়ুয়ান চোয়াঙের পরবর্তীকালে জৈন ধর্মের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ লিখিত বিবরণ নেই। কিন্তু গুপ্ত ও পাল যুগে পুণ্ড্রবর্ধনে বহু জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালেও জৈন ধর্ম পুণ্ড্রবর্ধন থেকে বিলুপ্ত হয়নি। উত্তর পুণ্ড্রবর্ধনে দিনাজপুর জেলার সুরহোর গ্রামে প্রাপ্ত ঋষভনাথের মূর্তি এবং দক্ষিণ পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রাপ্ত জৈন মূর্তিগুলি তার প্রমাণ। দিনাজপুর জেলার সুরহোর গ্রামে প্রাপ্ত ঋষভনাথের মূর্তিটি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, মূর্তির পাথরে বৃহৎ লাঞ্ছন আছে এবং ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে উপস্থিত।

আজীবিক ধর্ম

একদা পুণ্ড্রদেশে প্রসার লাভ করেছিল আজীবিক ধর্ম। মখলিপুত্র গোসাল (খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতক) এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। 'ভগবতী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় মখলিপুত্র গোসাল ও মহাবীর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এই দুই ধর্ম প্রচারক একই সঙ্গে বজ্রভূমিতে ছ'বছর অতিবাহিত করেছিলেন। রাঢ়দেশ পরিভ্রমণকালে মহাবীর এই ধর্ম সম্প্রদায়ের অনেক ভিক্ষুর দেখা পেয়েছিলেন। পাণিনির বর্ণনায় রাঢ়দেশে আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের একাধিক শিলালিপিতে আজীবিক ধর্মের উল্লেখ আছে। 'ভগবতী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, পুণ্ডরাজ মহাপৌম আজীবিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আচার্য নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, 'ভগবতী' গ্রন্থে উল্লিখিত পুণ্ড যথার্থই পুণ্ড্র। মৌর্য যুগে পুণ্ড্রদেশে নির্গ্রন্থ জৈন এবং আজীবিক সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করত।

বৌদ্ধধর্ম

পুণ্ড্রদেশে জৈন ও অজীবিক ধর্মপ্রবাহের সমসাময়িককালে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বুদ্ধদেব স্বয়ং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে পুণ্ড্রবর্ধনে ছ'মাস বসবাস করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। য়ুয়ান চোয়াঙ পুণ্ড্রবর্ধন পরিভ্রমণকালে অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপ লক্ষ্য করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাস্থান শিলালিপিতে। মহাস্থান শিলালিপিতে ছবগ্গীয় বা ষড়বর্গীয় থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুকের উল্লেখ আছে। আপদকালে রাজকীয় কোষাগার এবং শস্যভাণ্ডার থেকে তাদের সাহায্যের জন্য ধান্য, গণ্ডক ও কাকনিক মূদ্রা প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভ করত। দ্বিতীয় খ্রীঃ পূর্বাব্দে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁচী স্তুপের দু'টি লিপিতে। লিপি দু'টিতে লিখিত আছে, পুঞবাচন বা পুণ্ড্রবর্ধনবাসী ঋষিনন্দন নামে এক পুরুষ ব্যক্তি এবং ধর্মদত্তা নামে এক মহিলা সাঁচী স্তুপের বেষ্টনী ও তোরণ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করেচিলেন। তিব্বতি জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, নাগার্জুন পুণ্ড্রদেশে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী ছিল। ইৎ-সিঙের (৪র্থ শতক) বর্ণনায় জানা যায়, মহারাজ শ্রীগুপ্ত চৈনিক শ্রমণদের জন্য একটি চীনা মন্দির নির্মাণ করেন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করেন। মন্দিরটি মৃগস্থাপন স্তুপের (মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো) সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। আচার্য নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, স্তূপটি উত্তরবঙ্গের কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধনেই তার অবস্থিতি। মহাস্থানগড়ে বলাই ধাপ স্তূপের নিকট গুপ্তযুগের সময়কার যে ধাতব মঞ্জুশ্রী মূর্তিটি পাওয়া গেছে, তা উক্ত কালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রমাণ দেয়। ষষ্ঠ শতকে বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর পট্টোলী থেকে জানা যায়, মহারাজ বৈন্যগুপ্ত সামন্তশাসক রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহাযানী ভিক্ষুদের ভূমি দান করেছিলেন। উক্ত ভূমির আয় থেকে অবলোকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত আশ্রম বিহারের ব্যয়নির্বাহ হত। য়ুয়ান চোয়াঙের বর্ণনা থেকে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্ধনে বিশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। সবচেয়ে বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল পো-সি-পো মহাবিহার। মহাবিহাবটি মহাস্থানগড়ের তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এই বিহারে

৭০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বহু জ্ঞানী শ্রমণ বসবাস করতেন। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ছিলেন মহাযানীপন্থী। পো-সি-পো মহাবিহারের নিকটেই ছিল অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। মহাস্থানগড়ের নিকট ভাসু বিহার য়ুয়ান চোয়াঙ বর্ণিত পো-সি-পো মহাবিহার। কর্ণসুবর্ণের নিকটে ছিল লো-টো-মো-চি বিহার (রক্তমৃত্তিকা বিহার)। য়ুয়ান-চোয়াঙ লিখেছেন, পুণ্ড্রবর্ধনে হীনযানপন্থী ও মহাযানপন্থী উভয় মতাবলম্বী বৌদ্ধরা বসবাস করতেন।

পাল রাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম পুণ্ড্রবর্ধনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। খালিমপুর লিপিতে উল্লিখিত আছে, সর্বজ্ঞতাকে যিনি রাজশ্রীর ন্যায় স্থিরভাবে ধারণ করেছিলেন, সেই বজ্রাসনের (বুদ্ধদেবের) বিপুল করুণা প্রতিপালিত বহুমারসেনা সমাকুল দিঙমণ্ডল বিজয় সাধনকারী দশাবল তোমাদের রক্ষা করুন। বস্তুত অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল ব্যাপক। বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়, বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা, বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান। সহজযান মতবাদ, বৌদ্ধশাস্ত্র ও সিদ্ধাচার্যদের দোঁহা ও গানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়েছিল। পাল রাজত্বকালে বিক্রমশীলা ও সোমপুর (পাহাড়পুর) মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল। আচার্য বোধিভদ্র এই মহাবিহারে বসবাস করতেন। বোধিভদ্রের গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ নালন্দায় প্রাপ্ত একটি লিপি থেকে জানা যায়, বিপুলশ্রীমিত্রের পরম গুরুর গুরু আচার্য করুণাশ্রীমিত্র' সোমপুর বিহারে বসবাস করতেন। পুণ্ড্রবর্ধনের জগদ্দল মহাবিহারও ছিল প্রসিদ্ধ। এই মহাবিহারে পূজিত হতেন অবলোকিতেশ্বর। এই মহাবিহারে দানশীল, শুভঙ্কর গুপ্ত প্রমুখ বৌদ্ধ আচার্যগণ বসবাস করতেন। বালান্দাতে অনুলিখিত একটি অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বালান্দায় একটি মহাবিহার ছিল। দিনাজপুরের বানগড়ের নিকটবর্তী ছিল দেবীকোট বিহার। আচার্য অদ্বয়বর্জ, উধিলিপি, ভিক্ষুণী মেখলা এই বিহারে বসবাস করতেন। পাহাড়পুরের নিকট দীপগঙ্গে হলুদ-বিহার নামে একটি বিহারের ধ্বংসস্তুপ পাওয়া গেছে। আর একটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তুপ পাওয়া যায় বগুড়ার নিকটস্থ শীলবর্ষে। এই মহাবিহারগুলি ছিল পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র।

পুণ্ড্রবর্ধনে অজস্র বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। মহাস্থানগড়ে মঞ্জুশ্রী মূর্তিটির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া গেছে পাথরে

উৎকীর্ণ গৌতম বুদ্ধ। খুলনার শিববাটি গ্রামে পাওয়া গেছে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। স্থানীয় অধিবাসীরা মূর্তিটিকে শিবজ্ঞানে পূজা করে। ফরিদপুরে মহাবুদ্ধের মূর্তি, বিক্রমপুরে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। পুণ্ড্রবর্ধনে সবচেয়ে বেশী পাওয়া গেছে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গেছে বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা সর্বত্রই। এই সকল স্থানে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে মালদহ জেলার রানীপুর গ্রামে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীর ক্ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর মূর্তি, রাজসাহী চিত্রশালায় রক্ষিত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি, মুর্শিদাবাদের ঘিয়াসবাদে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘিয়াসবাদের মূর্তিটি সর্পফণাছত্রের নীচে দণ্ডায়মান। তার বারটি হাতের সাতটিতে সনাল নীল পদ্মের উপর স্থাপিত শঙ্খ, বৃষ, পুস্তক, লাঙ্গল, গরুড়, মুষিক এবং পাত্র লক্ষ্মণ। কণ্ঠ থেকে জানু পর্যন্ত বৈজয়ন্তীমালা। দু'টি হাত দু'টি মূর্তির উপর অধিষ্ঠিত। দিনাজপুরের সাগরদিঘিতে যে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গেছে সেই মূর্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অবলোকিতেশ্বরের পরেই যে বোধিসত্ত্ব মূর্তি অধিক সংখ্যায় পুণ্ড্রবর্ধনে পাওয়া গেছে, তা হল বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবতা বোধিসত্ত্বমঞ্জুশ্রী। রাজসাহীতে পাওয়া গেছে পশুরাজ সিংহের উপর উপবিষ্ট মঞ্জুশ্রী মূর্তি। মালদহে পাওয়া গেছে স্থিরচক্র-মঞ্জুশ্রীমূর্তি। পুণ্ড্রবর্ধনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে মহাযান-বজ্রযানের বৌদ্ধদেবতা। এই সকল বৌদ্ধ দেবতাদের মধ্যে জম্ভল, হেবজ্র প্রধান। জম্ভল ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভারের দেবতা, হেবজ্র তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা। ধন ও ঐশ্বর্যের দেবতা জম্ভলের ডান হাতে বীজ পুরক, বাম হাতে ধনরত্ন উদ্‌গিরণরত নকুলের গ্রীবাদেশ। পুণ্ড্রবর্ধনে মহাযান বজ্রযানের দেবতা হেরুকের মূর্তিও পাওয়া গেছে। মূর্তিটি সম্বররূপী। পাহাড়পুর এবং মুর্শিদাবাদে পাওয়া গেছে হেবজ্রের অনুপম মূর্তি।

বৌদ্ধ দেবীদের মধ্যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দেবী কখনও বজ্রতারকা কখনও ভৃকুটি তারা। আর একটি তার মূর্তি পাওয়া গেছে, তিনি শ্যামতারা। তার ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি। বজ্রতারার ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব, ভৃকুটি তারার ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ। পাহাড়পুরে পাওয়া গেছে মাটির ফলকে উৎকীর্ণ অষ্টভূজা তারা প্রতিমা। বগুড়ায় পাওয়া গেছে সপ্তম শতাব্দীর ধাতব তারা প্রতিমা। দিনাজপুরে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীর তারা প্রতিমাও এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুণ্ড্রবর্ধনে বজ্রযানী দেবী মারীচী, হারীতী, পর্ণশবরী প্রভৃতির মূর্তি পাওয়া গেছে। ঐশ্বর্যের দেবী হারীতী। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বৌদ্ধমূর্তি

পাওয়া গেছে আটঘরা, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি স্থানে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, হাজার বছর পূর্বে ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধবিহার ছিল। বালান্দা ও হাতিয়াগড় বৌদ্ধবিহার তার প্রমাণ। আটঘরা থেকে পাওয়া গেছে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের বুদ্ধমূর্তি। ভাঙড় থেকে পাওয়া গেছে এক অনিন্দ্যসুন্দর মঞ্জুশ্রী মূর্তি। মূর্তিটি আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ভরতগড়ের এক বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে একটি বৌদ্ধমূর্তি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জটার দেউলের উত্তরে মণি নদীর তটে আট মাইল লম্বা ও দু'মাইল চওড়া একটি গড় আছে। এটি একটি বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপ। এই স্তূপ খননকালে বৌদ্ধ দেবী হারীতীর দু'টি মূর্তি পাওয়া গেছে। জটার দেউলের ষোল কিলোমিটার উত্তরে বাইশহাটার ঘোষেরচকে আবিষ্কৃত হয়েছে দু'টি বৃহৎ বৌদ্ধমঠ। বাইশহাটা থেকে পাওয়া গেছে চতুর্মুখ বুদ্ধমূর্তি। বাইশহাটা মঠবাড়ির উত্তরে দমদমা পাতপুকুর গ্রামে একটি বৌদ্ধস্তূপে পাথরে খোদিত পাঁচটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। কঙ্কনদীঘিতে পাওয়া গেছে বেলে পাথরের প্রবুদ্ধমূর্তি। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা গ্রামে উৎখননে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংশাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী তিলপি গ্রামে পাওয়া গেছে বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। এগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রবল ছিল।

বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম

পুণ্ড্রদেশে বৈদিক ধর্মের প্রচার যদিও গুপ্তপূর্ব যুগে শুরু হয়েছিল কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার গুপ্তযুগে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ধর্মের প্রসার সমগ্র পূর্বভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রলিপিতে লিখিত আছে, ভূতিবর্মার রাজত্বকালে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে দুই শত ব্রাহ্মণ পরিবারকে আহ্বান করে বসানো হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর লোকনাথ পট্টোলী থেকে জানা যায়, ত্রিপুরা জেলায় জঙ্গল কেটে ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপন করানো হয়েছিল। পাল রাজত্বকালের ভূমিদান পট্টোলীগুলিতে পরিলক্ষিত হয়, যে সকল ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছিল, তারা বেদ-বেদাঙ্গে সুপণ্ডিত এবং যাগযজ্ঞে পারদর্শী। এই প্রসঙ্গে দেবপালের মুঙ্গেরলিপি, নারায়ণপালের বাদলস্তম্ভ-লিপি, মহীপালের বানগড়-লিপি উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ বিগ্রহপালের মন্ত্রী কেদারমিশ্র চতুর্বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈদ্যদেবের কামৌলী-লিপিতে উল্লেখ আছে, পুণ্ড্রবর্ধনের ভাবগ্রামের ব্রাহ্মণ ভরতের পুত্র যুধিষ্ঠির শাস্ত্রজ্ঞান

পরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়ত্বের সমুজ্জ্বল প্রতিনিধি। তার পুত্র শ্রীধর তীর্থভ্রমণ, বেদ অধ্যয়ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে ছিলেন শ্রেষ্ঠ। বেদ, বেদাঙ্গ চর্চার উল্লেখ আছে দেবপালের মুঙ্গের লিপিতে, বিগ্রহপালের আমগাছি লিপিতে। মহীপালের বানগড় লিপিতে সংহিতা, তর্কশাস্ত্র, মীমাংসা, ব্যাকরণচর্চার উল্লেখ আছে। উপরোক্ত লিপিগুলি থেকে প্রমাণিত হয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণেরা পাল রাজত্বকালেই পুণ্ড্রবর্ধনে বসতি স্থাপন করেছে। লিপিগুলি থেকে আরও প্রমাণিত হয়, সমসাময়িককালে ব্রাহ্মণ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রচারে ব্রাহ্মণেরা নিবেদিত প্রাণ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পাঠ অনেক ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল। মদনপালের মনহলি লিপিতে বটেশ্বর স্বামীশর্মা কর্তৃক জনৈক ব্রাহ্মণের বেদব্যাস-কৃত মহাভারত পাঠের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন পৌরাণিক ও মহাভারতীয় চরিত্র যেমন পৃথু, সগর, নল, অম্বরীশ, যযাতি, দৈত্যরাজ বলি বা কর্ণের মতো চরিত্রের উল্লেখ আছে দেবপালের মুঙ্গেরলিপি ও কোটালিপাড়া লিপিতে। বাদলস্তম্ভ-লিপিতে উল্লেখ আছে দেবগুরু বৃহস্পতি, অগস্ত্য, পরশুরামের কাহিনী, শিবের দক্ষযজ্ঞ, খালিমপুর লিপিতে উল্লেখ আছে ধনপতি ও ভদ্রার গল্প, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম কাহিনী। উপরোক্ত পৌরাণিক চরিত্র ও দেবদেবীদের আশ্রয় করে এই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়।

সেন রাজত্বকালেই পুণ্ড্রবর্ধনে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেন রাজত্বকালে বেদচর্চা ও যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে। সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্বেদে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এদেশে এসে বসবাস শুরু করেন এবং বৈদিক ধর্মচর্চা করেন। ভট্ট-ভবদেব ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী। এই সময় গুণবিষ্ণু রচনা করেছিলেন 'ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য'। কুলজী-গ্রন্থমালা থেকে প্রমাণিত হয়, সেন রাজত্বকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে দলে দলে ব্রাহ্মণেরা পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গাল, গৌড়, রাঢ়দেশে এসে বসবাস শুরু করে। জীমূতবাহন, ভট্ট-ভবদেব, হলায়ুধ এই সময়েরই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবক্তা।

সমসাময়িক কালেই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্মণসেনের তর্পনদীঘি তাম্রশাসনে বিষ্ণুর বামন অবতার, কৃষ্ণের প্রেমলীলা, নরসিংহ এবং পরশুরাম অবতারের কথা উল্লেখ আছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে অগস্ত্য ঋষির সাহায্যে সূর্যদেব যে বিন্ধ্যপর্বতকে অবনত করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। দেওপাড়া ও নৈহাটি লিপিতে অর্ধনারীশ্বর

শিব, কার্ত্তিক, গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেন রাজত্বকালেই সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, তপণ, পূজার্চনা, তিথি, কোজাগরী পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, অক্ষয়-তৃতীয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায় 'দায়ভাগ', 'কালবিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থে।

বৈষ্ণবধর্ম

গুপ্ত রাজত্বকালেই পুণ্ড্রবর্ধনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব ধর্মের প্রসার ঘটে। বিষ্ণুর নানা রূপের পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণ ও মহাভারতে। 'ভাগবতপুরাণে' সর্বপ্রথম বিষ্ণুর এক বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া হয়। পাল রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও প্রসার ঘটলেও পুণ্ড্রবর্ধনে বৈষ্ণব ধর্ম একটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে প্রাপ্ত এই সময়কার বিষ্ণুমূর্তিগুলিতে বৌদ্ধ মহাযানী প্রভাব সুস্পষ্ট। দিনাজপুর জেলায় সুরোহর গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি তার প্রমাণ। একটি নাগের ফণাছত্রের নীচে বিষ্ণু দণ্ডায়মান। ফণাছত্রের উপরে একটি বুদ্ধসদৃশ মূর্তি। পাদপীঠে নৃত্যরত শিব। বিষ্ণুর গরুড়াসন মূর্তি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে। দিনাজপুর জেলার এখাইল গ্রামে পাওয়া গেছে লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি। আচার্য নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা ও রূপ-কল্পনায় প্রসার দক্ষিণ ভারতেই অধিক ছিল। সম্ভবত সেন রাজত্বকালে এ দেশে লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা ও তার রূপকল্পনার প্রসার হয়েছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ সেন রাজাদের কুলদেবতা। ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। লক্ষণসেন ছিল পরম বৈষ্ণব। বিশ্বরূপ ও কেশবসেন বিষ্ণুনারায়ণকে আবাহন করে রাজপট্ট আরম্ভ করেছিলেন। সেন রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্ধনে বিষ্ণুর দু'টি রূপ, অন্যটি রাধা-কৃষ্ণের রূপ। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বিষ্ণুর দশাবতারের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর দশাবতারের উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থেও।

পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম এ দেশে এক নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। জাতপাতে দ্বিধা-বিভক্ত হিন্দু-সমাজের নিম্নবর্গীয়রা সমাজের উৎপীড়নে অপেক্ষাকৃত সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব এই ধর্মান্তরকে রোধ করার চেষ্টা হিসাবে বৈষ্ণব ধর্মকে তিন ভাবে প্রচার করেন।

এই ধর্মে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিলতা ছিল না। বৈষ্ণব ধর্ম ছিল সাম্যবাদী। ফলে নিম্নবর্গীয় জনসাধারণ এই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। জাতপাতের গোঁড়ামিও ছিল না এই ধর্মে। তাছাড়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ ছিলেন বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা ও কালচক্রযানীর কালচক্র এবং রাধা বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। বৈষ্ণব ধর্মে বৌদ্ধধর্মের এই দিকগুলিও বাংলার নিম্নবর্গীয় জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল।

শৈবধর্ম

শৈব ধর্মও একদা পুণ্ড্রদেশে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। শিব এবং শক্তি প্রাচীন দেবতা। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পশুপতি এবং মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে। পুণ্ড্রবর্ধনে শৈব ও শাক্ত ধর্মের পরিচয় গুপ্তপূর্ব যুগেই পাওয়া যায়। পাল রাজত্বকালেও পুণ্ড্রবর্ধনে লিঙ্গরূপী শিব পূজা সমধিক প্রচলিত ছিল। রাজসাহীতে পাওয়া গেছে একমুখলিঙ্গ শিব। আবার চতুর্মুখলিঙ্গ শিবও পাওয়া গেছে। মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত দশম শতাব্দীর ধাতুর তৈরী চতুর্মুখ লিঙ্গটি ভাস্কর্যের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পুণ্ড্রবর্ধনে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর যে সকল চতুর্মুখলিঙ্গ শিব পাওয়া গেছে, তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল এই চতুর্মুখলিঙ্গ শিবের চারদিকে চারটি শক্তি-মূর্তি উপবিষ্ট।

পুণ্ড্রবর্ধনে শিবের বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে সদাশিব, নটরাজ শিব, চন্দ্রশেখর, উমা-মহেশ্বর উল্লেখযোগ্য। রুদ্র শিব পুণ্ড্রবর্ধনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরে পাওয়া গেছে একাধিক চন্দ্রশেখর শিব। রাজসাহীতে পাওয়া গেছে দ্বিহস্ত এবং চতুর্হস্ত শিব। পুণ্ড্রবর্ধনে নটরাজ শিব মূর্তিও পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কোথাও পাওয়া গেছে দশহস্ত শিব, কোথাও দ্বাদশ হস্ত। তাদের হাতের লক্ষণ ও লাঞ্ছনও পৃথক। দ্বাদশ হস্ত শিবের মূর্তিগুলিতে এক হাতে বীণা, দুই হাতে করতালে নৃত্যের তাল পরিলক্ষিত হয়। পুণ্ড্রদেশে সদাশিবের মূর্তিও পাওয়া গেছে। সদাশিবের রূপ-কল্পনা মহানির্বাণতন্ত্র, গরুড় পুরাণে উল্লিখিত আছে। সেন রাজারা ছিলেন সদাশিবের পরম ভক্ত। উমা, মহেশ্বরের যুগলমূর্তি পুণ্ড্রবর্ধনে বহু সংখ্যক পাওয়া গেছে। শিব-উমার আলিঙ্গন মূর্তি সৌন্দর্য ও আনন্দের পরিপূর্ণ রূপ। আচার্য নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'শিবক্রোড়োপবিষ্টা, সুখাসীনা, আলিঙ্গনবদ্ধা, হাস্যানন্দময়ী উমা

শিবশক্তির তান্ত্রিক সাধকদের ত্রিপুরা-সুন্দরী এবং তার রূপধ্যানই ধ্যানযোগের শ্রেষ্ঠ ধ্যান।'

শাক্তধর্ম

পুণ্ড্রবর্ধনে শৈব ধর্মের সমকালীন সময়ে শাক্তধর্মের প্রসার ঘটেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের দেবীপুরাণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তোত্তর সময়ে জয়দ্রথ-যামল গ্রন্থে ঈশানকালী, রক্ষাকালী, প্রজ্ঞাকালীর সাধনার বর্ণনা পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে পুণ্ড্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত ধর্ম প্রবাহিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তন্ত্রধর্মের প্রসারের মূল উৎস ছিল এই শাক্তধর্ম। পুণ্ড্রবর্ধনে প্রাপ্ত দেবীমূর্তিগুলি মূলত চতুর্ভুজা ও দণ্ডায়মান। বিভিন্ন প্রতিমার চার হাতের বিভিন্ন লক্ষণ। চতুর্ভুজা দেবী মূর্তিগুলি কখনও চণ্ডী, কখনও কালী। আবার দিনাজপুরের মঙ্গলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত দেবীমূর্তি দুই হস্তবিশিষ্ট। রাজসাহীতেও পাওয়া গেছে দুই হস্তবিশিষ্ট প্রতিমা। পুণ্ড্রবর্ধনে উপবিষ্টা শক্তির দেবী প্রতিমাও পাওয়া গেছে। এই প্রতিমাগুলি সর্বমঙ্গলা, ভুবনেশ্বরী, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি। তাদের আসনভঙ্গী, লক্ষণ ও মুদ্রা, হাতের সংখ্যা এবং বাহনও বিভিন্ন। রুদ্র দেবীমূর্তিসমূহের মধ্যে মহিষমর্দিনী-দুর্গাই প্রধান। প্রাচীন মূর্তিগুলি অষ্টভুজা অথবা দশভুজা। মহিষমর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে দিনাজপুরের পোরষ গ্রামে। মূর্তিটির আঠারোটি হাত। মূর্তিটি উগ্রচণ্ডী। দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে পাওয়া গেছে বারোটি হস্তবিশিষ্ট মহিষমর্দিনী মূর্তি। বেতনা গ্রামে পাওয়া গেছে বত্রিশ হস্তবিশিষ্ট চণ্ডিকা মহিষমর্দিনী মূর্তি। মূর্তিটির উপর সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণপতি, শিবের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। পুণ্ড্রবর্ধনে চতুর্ভুজা ও ষড়ভুজা মহেশ্বরী, বরাহী, চামুণ্ডি প্রভৃতি দেবীমূর্তিও পাওয়া গেছে। চামুণ্ডী রূপবিদ্যার মূর্তি পাওয়া গেছে দিনাজপুরের চেতনা গ্রামে। রাজসাহী চিত্রশালায় একটি দেবী মূর্তি আছে। তার পাদপীঠে লেখা আছে চর্চিকা। এখানে দেবী একটি বৃক্ষের নীচে শবাসনের উপর উপবিষ্ট। মূর্তিটি বৌদ্ধ উগ্রতারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সকল মূর্তি পরিকল্পনায় মহাযানী, বজ্রযানী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ছত্রভোগের নিকট কৃষ্ণচন্দ্রপুরে ত্রিপুরসুন্দরী দেবী বৌদ্ধ মহাযানী তান্ত্রিক দেবী। তারা, চণ্ডিকা, কালী প্রভৃতি সম্পর্কেও এই তথ্য প্রযোজ্য। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কঙ্কণদীঘি থেকে পাওয়া গেছে বারাহি মূর্তি। মূর্তিটি ভীষণ দর্শনা, বরাহ আনন। বিশালাক্ষ্মী, কালী, তারা, চণ্ডিকা বৌদ্ধ মহাযানী তান্ত্রিক দেবী।

পুণ্ড্রদেশের রাষ্ট্র-বিন্যাস

কোন রাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাস রচনাকালে তার রাষ্ট্র-বিন্যাসের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের মধ্যে সমসাময়িক সমাজের রূপ ও তার দর্শন পরিলক্ষিত হয়। সমাজের স্বরূপ এবং তার ধ্যান-ধারণার যখন পরিবর্তন হয়, রাষ্ট্রীয় বিন্যাসেরও পরিবর্তন তখন অবশ্যম্ভাবী। জনসমাজের রূপ এবং আদর্শ অনুযায়ী গঠিত হয় রাষ্ট্র। প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের রাষ্ট্রবিন্যাসের আলোচনায় এই বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

পুণ্ড্রদেশের রাষ্ট্র বিন্যাসের স্বরূপ জানা যায় বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রলিপি, রাজকীয় দলিল এবং প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদি যেমন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। মহাস্থানগড়ের শিলালিপি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। এতদ্দ্বারা মনে করা যেতে পারে, এর সময়কালে মৌর্য রাষ্ট্র বিন্যাসের রূপ এখানে প্রবর্তিত ছিল। কিন্তু মৌর্যকালের পূর্বেও পুণ্ড্র জনপদে জন-সমাজ ছিল, রাজা ছিল এবং রাষ্ট্রও ছিল। তারও পূর্বে ছিল কৌম সমাজ ও তার শাসন পদ্ধতি। প্রাচীন কৌম সমাজের শাসন-ব্যবস্থার কিছু রূপ আজও প্রবহমান। গ্রামীণ পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থা প্রাচীন কৌম সমাজের অবদান। কৌম সমাজ ও রাষ্ট্রবিন্যাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল। পুণ্ড্রদেশে রাজতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থাদিতে। মহাভারতীয় যুগে পৌণ্ড্র সম্রাট বাসুদেব কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরব পক্ষে যোগদান করেছিলেন। বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থাদি যেমন অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ এবং হরিবংশ থেকে প্রবীর, সুবাহু, সভানর, পুরঞ্জয়, উষদ্রথ, অতনু প্রমুখ পৌণ্ড্র রাজাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে পুণ্ড্রদেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অথর্ববেদে উল্লেখ আছে একমাত্র প্রাচ্য দেশেই সম্রাট ছিলেন।

পুণ্ড্রদেশের রাষ্ট্রবিন্যাস মুখ্যত রাজতান্ত্রিক হলেও বুদ্ধদেবের সমকালীন সময় থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এখানে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। মহাস্থানগড় থেকে যে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়, দুর্ভিক্ষে অথবা এই জাতীয় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজা রাজকীয় শস্যভাণ্ডার থেকে খাদ্য ও শস্যবীজ দিয়ে প্রজাদের সাহায্য করার আদেশ দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে গণ্ডক এবং কাকনিক মুদ্রায় অর্থ সাহায্যের আদেশ

দেওয়া হয়েছিল মহামাত্রকে। এই ব্যবস্থা একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। পুণ্ড্রদেশের শাসনতন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে পেরিপ্লাস গ্রন্থ এবং টলেমির রচনায়। নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপি থেকেও জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধনের রাষ্ট্রীয় ও সমাজগত অবস্থান।

রাজা ঃ রাজতন্ত্র

প্রাচীন পুণ্ড্রদেশে কৌম শাসনতন্ত্রের পরবর্তীকালে রাজা এবং রাজতন্ত্রই প্রধান ছিল। রাজতন্ত্র ছিল প্রতিষ্ঠিত, মর্যাদা এবং ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ। স্বাধীন নৃপতিগণ ছিলেন মহারাজাধিরাজ। বংশানুক্রমিক রাজবংশের প্রভুত্ব ছিল। সেকালে মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ নামে অভিহিত হতেন। প্রাপ্তবয়স্ককালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতেন যুবরাজ। যুবরাজ রাষ্ট্রকর্মে, সামরিক বিষয়ে রাজাকে সাহায্য করতেন। রাজতন্ত্রে রাজমহিষীরও এক উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। ইর্দা-পট্টোলী তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও অধিকারের সীমা ছিল অসীম। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের তিনিই সর্বময় কর্তা ছিলেন।

সামন্ত-মহাসামন্ত

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত রাজ্য শাসনের জন্য নিযুক্ত সামন্ত শাসক ছিলেন। তিনি কখনও রাজন, কখনও রাজনক অথবা রাজন্যক। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর পট্টোলীতে (৫০৭-৮খ্রীঃ) মহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেনের কথা উল্লিখিত আছে। উক্ত পট্টোলীতে বিজয়সেনকে দূতক, মহাপিলুপতি, মহাপ্রতিহার পুরপালোপরিক প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। 'দূতক'-এর অর্থ রাজকীয় অথবা রাষ্ট্রীয় কর্ম-পরিচালনার জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রতিনিধি। সম্রাট কখনও কখনও রাজকীয় সভায় এই সকল সামন্তরাজাদের আহ্বান করতেন। সামন্ত রাজারা মহারাজাধিরাজের সভায় উপস্থিত হয়ে সম্রাটকে উপঢৌকন প্রদান করতেন এবং তারা নিয়মিত সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান করতেন।

মহামন্ত্রী ও অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান রাজকর্মচারী

সম্রাটকে সকল রাজকার্যে সাহায্য করবার জন্য একজন প্রধান রাজপুরুষ নিযুক্ত হতেন। তিনি সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী অথবা মহামন্ত্রী। রাজতন্ত্রে তিনি

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ভগবান বুদ্ধদেব যখন পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন, তখন পৌণ্ড্ররাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় 'মহাপাত্র' নামে এক প্রশাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বানগড় লিপিতে উল্লিখিত মহামন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকর্মে সহায়তা করার জন্য যে সকল পদাধিকারী ছিলেন, তাদের মধ্যে রাজামাত্য, দূত, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতিহার, মহাক্ষপটলিক উল্লেখযোগ্য। রাজামাত্যগণ ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। রাজার পরমর্শদাতার ভূমিকাও কখন কখন তারা পালন করতেন। সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন মহাসেনাপতি। পদাতিক, হস্তী, রথ, অশ্ব ছাড়াও নৌবাহিনীও ছিল। এই পাঁচটি বিভাগে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষেরা বিভিন্ন বাহিনী পরিচালনা করতেন। মহাপ্রতিহার আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। মহাক্ষপটলিক রাষ্ট্রের হিসাব বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজকীয় অসামরিক বিভাগের হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, রাজকীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ নৌকাধ্যক্ষ এবং রাজকীয় পদাতিক বাহিনীর অধ্যক্ষের নাম বলাধ্যক্ষ। বিচার বিভাগীয় উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন মহাদণ্ডনায়ক। রাজস্ব বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন দেওয়ান। দেওয়ানকে রাজস্ব আদায় বিষয়ে সাহায্য করতেন উপরিক, মণ্ডলপতি প্রমুখ রাজকর্মচারী। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় হত। তাছাড়া কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে জানা যায়, খেয়া পারাপারের ঘাট থেকে রাষ্ট্রের আয় হত। এই বিভাগের অধিকর্তাকে তরিক বলা হত। অরণ্যও ছিল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। উক্ত আয়ের বিভাগীয় অধিকর্তার নাম ছিল গৌল্মিক। কৃষি ও কৃষিযোগ্য ভূমির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারী ক্ষেত্রপ। পররাষ্ট্র-বিষয়ক বিভাগের প্রধান ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক। নগর রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন নগরপাল।

ভুক্তি ও ভুক্তির শাসনযন্ত্র

ভুক্তির শাসনকর্তা মহারাজ স্বয়ং নিযুক্ত করতেন। কখনও রাজপরিবারের সদস্যরাও ভুক্তিপতি হতেন। ৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উপরিক মহারাজ নিযুক্ত হয়ে ছিলেন রাজপুত্র দেবভট্টারক। ভুক্তির প্রধানকে বলা হত উপরিক অথবা উপরিক মহারাজ। মল্লসারুল লিপিতে ভুক্তি উপরিকের অধিকরণে কয়েকজন রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভোগপতিক, পত্তলিক, চৌরোদ্ধরনিক, হিরণ্যসমুদায়িক, আবসাথিক, ঔদ্রঙ্গিক,

ঔর্ণস্থানিক, কার্তাকৃতিক, দেবদ্রোণীসম্বন্ধ, কুমারমাত্র, আগ্রহারিক, তদায়ুক্তক, বাহনায়ক ও বিষয়পতি। বিষয়পতি বিষয় বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী। ভোগপতিরা সম্ভবত কর আদায় কর্তা। চৌবোদ্ধবনিক শান্তিরক্ষা বিভাগের কর্মচারী। ঔর্ণস্থানিক রেশম নির্মিত বস্ত্রশিল্পের নিয়ামক কর্তা। আবসথিক রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য রাজকীয় ঘর-বাড়ির অধ্যক্ষ। দেবদ্রোণীসম্বন্ধ মন্দির, তীর্থঘাট ইত্যাদির অধ্যক্ষ। আগ্রহায়িক ভূমি বিভাগের এবং বাহনায়ক পরিবহন বিভাগের কর্তা।

বিষয় ও বিষয়াধিকরণ

বিভিন্ন পট্টোলী থেকে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। দামোদরপুর পট্টোলীতে উল্লেখ পাওয়া যায় 'কোটিবর্ষ' বিষয়ের। ধনাইদহ পট্টোলীতে 'খাদাপারা' এবং বৈগ্রাম পট্টোলীতে পঞ্চনগরী বিষয় ও বিষয়াধিকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বিষয়' বিভাগের সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন 'বিষয়পতি'। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে এক বিষয়াধিকরণের উল্লেখ আছে। বিষয় শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালনা করতেন বিষয়পতি। দামোদরপুর পট্টোলীতে (৪৪৩ খ্রীঃ) কোটিবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতির সহায়ক নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম সার্থবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল সহায়কগণ বণিক, শিল্পী এবং ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তারা বিষয়পতিকে উপদেশ পরামর্শ দিতেন। মৃচ্ছকটিকের বিবরণ থেকে এই ধারণাও স্পষ্ট হয় যে অনেক ক্ষেত্রে বিষয়পতির সঙ্গে শাসনকার্যের দায়িত্ব তারা পালন করতেন। বিষয়াধিকরণের সভ্যদের সাহায্য করার জন্য একটি পুস্তপালের দপ্তর ছিল। ভূমি দান-বিক্রয়ের বিষয়ে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হত। এই দপ্তরে ভূমির পরিমাপ, সীমা-নির্দেশ, স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত দলিলপত্র সংরক্ষিত থাকত।

বীথী ও বীথী অধিকরণ

মল্লসারুল লিপি থেকে বীথী বিভাগ ও তার অধিকরণ তথ্য জানা যায়। উক্ত লিপি থেকে 'কুলবারকৃত' নামে বীথী অধিকরণ কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থানীয় বীথী অধিকরণে নিযুক্ত দু'জন মহত্তর, তিনজন খাড়গী এবং একজন বাহনায়কের উল্লেখ পাওয়া গেছে উক্ত লিপিতে। খাড়গী'র অর্থ খড়্গধারী প্রহরী। সম্ভবত খাড়গীরা বীথীর শান্তি রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারী।

মণ্ডল

ভুক্তির নিম্মতর বিভাগ বিষয় এবং মণ্ডল সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খলিমপুর লিপিতে লিখিত আছে 'মহান্তপ্রকাশ' বিষয় 'ব্যাঘ্রতটী' মণ্ডলভুক্ত। আবার এই লিপিতেই উল্লিখিত আছে 'তাম্রষণ্ডিকা' মণ্ডল 'পালাক্কট' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বানগড় লিপিতে উল্লিখিত হয়েছে, 'গোকালকা' মণ্ডল 'কোটিবর্ষ' বিষয়ের অন্তর্গত। 'কোটিবর্ষ' বিষয় পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। রামপাল লিপিতে 'নাব্যমণ্ডল' পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। আচার্য নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, মনে হয় ব্যতিক্রম যাহাই থাকুক, বিষয়ই ছিল ভুক্তির অব্যবহিত নিম্মবর্তী রাষ্ট্রবিভাগ এবং মণ্ডল বিষয়ের নিম্নবর্তী বিভাগ। বিষয়ের শাসন কর্তা ছিলেন বিষয়পতি। মণ্ডলের শাসনকর্তা ছিলেন মণ্ডলপতি বা মাণ্ডলিক। নালান্দা লিপিতে পালরাজ দেবপালের রাজত্বকালে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের একজন মণ্ডলাধিপতির নাম পাওয়া যায়। তার নাম বলবর্মন।

তর্পণদীঘি অনুশাসনে বরেন্দ্রী মণ্ডল পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। সুন্দরবন লিপিতে উল্লিখিত মণ্ডলগ্রাম কাতল্লপুর চতুরকে অবস্থিত। উক্ত চতুরক খাড়িমণ্ডলে অবস্থিত। খাড়িমণ্ডল পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। ইদিলপুর লিপিতে উল্লিখিত তলপড়া পাটক এবং মদনপাড়া লিপির পিঞ্জকাষ্ঠি গ্রাম বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে অবস্থিত। বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু বঙ্গ বিষয় অথবা মণ্ডল ছিল কিনা জানা যায় না।

খণ্ডল, পাটক, আবৃত্তি, চতুরক ও গ্রাম

মণ্ডলের নিম্নবর্তী বিভাগগুলি খণ্ডল, পাটক, আবৃত্তি, চতুরক। চতুরক আবৃত্তির নিম্নতর বিভাগ। চতুরক সম্ভবত চারটি গ্রাম নিয়ে গঠিত। সবনিম্ন বিভাগ গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য 'গ্রামিক' নামে এক রাজকর্মচারীর সাক্ষাত পাওয়া যায় (দামোদর লিপি)। গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অষ্টকুলাধিকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় দামোদর পট্রোলী ও ধনাইদহ পট্রোলীতে। অনেক লিপিতে পঞ্চকুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চকুল সম্ভবত পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত সমিতি। গ্রামের শাসনযন্ত্রে মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতিরা সহায়ক ও উপদেষ্টা হিসাবে থাকতেন। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়ে গ্রাম্য অধিকরণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ধনাইদহ লিপিতে উল্লিখিত আছে, গ্রাম্য অষ্টকলাধিকরণের নিকট ভূমি ক্রয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি আবেদন করছেন।

পুণ্ড্রদেশের নগর

পূর্ব ভারতে পণ্ড্রদেশে গড়ে উঠেছিল সুসভ্য নগর সভ্যতা। রাজধানী মহাস্থানগড় শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও নগরজীবনের অন্যান্য সুযোগ সুবিধায় ছিল অনন্য। এছাড়া কোটিবর্ষ, কাকমারী, চপলা, গৌড়, পাণ্ডুয়া, দেবগড়, সোনামুখী, পুষ্পগ্রাম, চন্দ্রকেতুগড়, গঙ্গে, আটঘরা প্রভৃতি শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র পুণ্ড্রদেশে গড়ে উঠেছিল। এই সকল নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য নগরগুলির বাণিজিাক যোগাযোগ ছিল। বিদেশী বণিকেরাও পুণ্ড্রদেশের নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে তাদের ব্যবসা উপলক্ষে যাতায়াত করত। পুণ্ড্রদেশ ও তার বিভিন্ন নগরের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, কলহনের রাজতরঙ্গিনী, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন গ্রীক, রোমান, মিশরীয় ও চৈনিক লেখকদের লিখিত বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।

মহাস্থানগড়

পুণ্ড্রদেশের রাজধানী নগর ছিল মহাস্থানগড়। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদি থেকে প্রমাণিত হয় কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই নগরী পুণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল এবং এই নগরী সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। একাধিক স্থলপথ ও প্রশস্ত করতোয়ার জলপথ দিয়ে বিভিন্ন দেশের বণিকেরা এখানে বাণিজ্য করতে আসত। 'দিব্যবদান', 'রাজতরঙ্গিনী', 'বৃহৎকথামঞ্জুরী' প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ আছে। রামায়ণে উল্লিখিত 'মহাগ্রাম' এই মহাস্থানগড়। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়ার সাত মাইল দূরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে পূর্বীপ্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা এক শিলালিপি। শিলালিপিটিতে এই স্থানের নাম উল্লিখিত আছে 'পুডনগল', যার সংস্কৃত অর্থ হল পুণ্ড্রনগর। বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, বুদ্ধদেব স্বয়ং পুণ্ড্রবর্ধন নগরে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। মহাস্থানগড়কে নিশ্চিতরূপে পুণ্ড্রদেশের রাজধানী হিসাবে সনাক্ত করেন আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন সাহেব মহাস্থানগড়ের পুরাকীর্তি লিপিবদ্ধ করেন।

মহাস্থানগড়ে বেশ কয়েকবার খননকার্য হয়েছে। বর্তমানে বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত যে গড়টি দেখা যায়, খনন করে দেখা গেছে, এর উপর ভাগের

মাটি থেকে সতেরটি নির্মাণস্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি প্রায় হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষে এখনও একটি দুর্গের ভগ্ন প্রাচীর দেখা যায়। প্রাচীরটির পরিধি প্রায় পাঁচ মাইল। প্রাচীরের চারিদিকে গড়খাই। প্রাচীরের মাঝে মাঝে অর্ধ-গোলাকৃতি বুরুজ লক্ষ্য করা যায়। উত্তরের প্রবেশ পথটি এখনও বর্তমান। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোবিন্দ ভিটা, একটি ভগ্ন বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরটি বিশাল। মন্দিরটি পঞ্চম শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। আর একটি অতিকায় স্তূপ বৈরাগী ভিটা। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মানকালীর মন্দির. পরশুরামের প্রাসাদ, জীয়ৎ কুণ্ডু, শীলাদেবীর ঘাট উল্লেখযোগ্য। কিছু দূরে আছে লখীন্দরমেধ। স্থানীয় লোকেরা বলে, লখীন্দরের বাসরঘর। আসলে এটি ষষ্ঠ শতাব্দীর এক বৌদ্ধ বিহার। মহাস্থানগড়ের চার মাইল পশ্চিমে একটি বৌদ্ধ মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেছে। স্যার কানিংহাম এই মহাবিহারকে য়ুয়ান চোয়াঙ বর্ণিত পো-শি-পো মহাবিহার বলে বর্ণনা করেছেন।

মহাস্থানগড় শুধুমাত্র রাজধানী নগর হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল না, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে আন্তর্ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে এই নগরের খ্যাতি বহু শতাব্দী প্রতিষ্ঠিত ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই নগরের পরিধি ছিল ৩০ লি'র (৬ মাইল) অধিক। পুষ্করিনী, পুষ্প ও ফলোদ্যান, বিহার কাননে এই নগর সুশোভিত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই নগরকে বরেন্দ্রীর মুকুটমণি ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। করতোয়া মাহাত্ম্যে পুণ্ড্রবর্ধনপুরকে পৃথিবীর আদি বাসভবন বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে করতোয়া তীরবর্তী মহাস্থানকে পুণ্য পৌণ্ড্রক্ষেত্র বা পৌণ্ড্রনগর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

করতোয়া নদীর তীরে ৩০ মাইল ব্যাপী মহাস্থানের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ। নগরপ্রাকার, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মন্দির, মূর্তি, পরিখা, বিহার, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে এই নগর ছিল সমৃদ্ধশালী। মহাস্থানগড়ে খননকৃত স্থানে বিভিন্ন স্তরে পোড়ামাটির ফলক, অলংকৃত ইট, প্রস্তর নির্মিত জিনিসপত্র, লোহা, তামা ও ব্রোঞ্জের বিভিন্ন জিনিসপত্র, ক্ষেপনীয় বল ও কড়ি পাওয়া গেছে। ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত গোলাকার ও চতুষ্কোণ বহু মুদ্রাও এখানে পাওয়া গেছে। এই মুদ্রাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। মহাস্থানগড়ের নগর পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত উন্নত। নগরটির দু'টি অংশ। একটি অংশ পরিখা ও প্রাকার বেষ্টিত। অন্য অংশটি প্রাকারের বাহিরে নগরের উপকণ্ঠ। নগর

প্রাকারের বাইরে গমনের জন্য উত্তর ও দক্ষিণে দু'টি করে প্রশস্ত নগরদ্বার। উত্তর পশ্চিম কোণে নগরের প্রধান নগরদ্বার। এখনও এই দ্বার তাম্র-দরওয়াজা নামে খ্যাত। পূর্বদিকে এর বিপরীত কোণে শীলাদেবীর ঘাটে যাবার জন্য আর একটি দ্বার। শীলাদেবীর ঘাটই করতোয়া স্নানের তীর্থকেন্দ্র। রামচরিতে পুণ্ড্রনগরের রাজকীয় প্রাসাদ, নাগরিকদের বাসগৃহ, হাট, মন্দির, সভাগৃহ, সৈন্যসামন্তদের আবাসস্থান ও সারি সারি বিপণিগৃহের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা পুণ্ড্রনগরের সমৃদ্ধির ইতিহাস। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, ত্রয়োদশ শতকের হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রনগর কখনও মর্যাদার আসন থেকে বিচ্যুত হয়নি।

কোটিবর্ষ

পুণ্ড্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল কোটিবর্ষ। খ্রীষ্টপূর্বযুগে কোটিবর্ষ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। বায়ুপুরাণে উল্লিখিত 'কোটিবর্ষম' নগরই পৌণ্ড্রদেশের কোটিবর্ষ। হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামনি', পুরুষোত্তমের 'ত্রিকাণ্ডশেষ' প্রভৃতি গ্রন্থে কোটিবর্ষের উল্লেখ আছে। প্রাচীন পুরাণে উল্লিখিত দেবীকোট, বানপুর, শোনিতপুর প্রভৃতি কোটিবর্ষেরই বিভিন্ন নাম। জৈন 'কল্পসূত্রে' বলা হয়েছে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদান পূর্ব ভারতের জৈনদের চারটি শাখায় শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন। তার মধ্যে তিনটি শাখার নাম পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ ও তাম্রলিপ্তির সঙ্গে যুক্ত। কোটিবর্ষ ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্যতম প্রশাসনিক বিভাগ ও শাসনকেন্দ্র। সামরিক প্রয়োজনের দিক থেকেও কোটিবর্ষের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুসলমান বিজয়ের পর পুরাতন কোটিবর্ষ নগরই দেবীকোট—দীব্‌কোট—দীওকোট নামকরণ হয়। সন্ধ্যাকর নন্দী কোটিবর্ষের উল্লেখ করে বলেছেন, এই নগরে অসংখ্য মন্দির ও পূজারী ছিল। তিনি তার রচনায় কোটিবর্ষের কমলশোভিত দীঘির বর্ণনা করেছেন। ষোড়শ শতক পর্যন্ত মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় দীব্‌কোট—দীওকোটের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্তমান দিনাজপুরের বানগড়ই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের কোটিবর্ষ নগর। এই নগরের পশ্চিম দিকে পুনর্ভবা নদী। সমগ্র বানগড় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এই ধ্বংসাবশেষে অসংখ্য মূর্তি, মন্দির, প্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড, স্তম্ভ,

ভিত্তিস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে কম্বোজ রাজাদের একটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। কোটিবর্ষ নগরটি চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের পরেই পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে পরিখা এবং পশ্চিমে পুবর্ভবা নদী। পূর্বদিকে প্রধান নগরদ্বার। নগর থেকে নগরের উপকণ্ঠে যাবার জন্য পরিখার উপর সেতুর ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। নগরের কেন্দ্রস্থলে স্তূপাকৃতি ধ্বংসাবশেষটি সম্ভবত রাজপ্রাসাদ ছিল। কোটিবর্ষের সঙ্গে বারাণসী, উজ্জয়িনী, মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় নগরগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই নগরের সঙ্গে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাচীন নগরের যোগাযোগ ছিল তা নয়, দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলির সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। হেমচন্দ্রের পুনর্ভবা নদীতীরস্থ কোটিবর্ষ এবং বলিবাজ পুত্র বানাসুর ও উষা-অনিরুদ্ধের পুরাণ-স্মৃতি বিজড়িত বানপুর বর্তমান বানগড় প্রাচীন সমৃদ্ধশালী পুণ্ড্রদেশের নগরের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

গৌড়

পুণ্ড্রদেশের অন্যতম নগর ছিল গৌড়। মালদহ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ। কাছেই মহানন্দা নদী প্রবাহিত। গৌড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপে ফিরোজ মিনার, কদম রসুল মসজিদ, চিকা মসজিদ এখনও অক্ষত। এগুলি সবই মুসলমান রাজত্বকালের নিদর্শন। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ দেয়, মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এখানে পাল রাজারা রাজত্ব করত। তার পূর্বে গৌড় ছিল পুণ্ড্রদেশের অন্যতম প্রশাসনিক বিভাগ। পাণিনি-সূত্রে গৌড়পুর স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ে পুণ্ড্রদেশের উৎপন্ন শিল্প ও কৃষির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলিও গৌড়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তৃতীয় শতকে বাৎসায়ন গৌড়ের নাগরিকদের বিলাসব্যসনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায় বরাহমিহিরের 'বৃহৎ-সংহিতা'য়। ভাষার গৌড়রীতির পরিচয় পাওয়া যায় দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ও রাজশেখরের 'কাব্য মীমাংসা' গ্রন্থে। 'ভবিষ্য-পুরাণ' বা 'ত্রিকাণ্ডশেষ' গ্রন্থে গৌড়কে পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত বলা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে গৌড় একটি স্বতন্ত্র জনপদে পরিণত হয়ে তার রাষ্ট্রাধিকার অঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করে। কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে উল্লেখ আছে, রাঢ় গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামসূত্রের টীকাকাব যশোধর লিখেছেন, গৌড়ের বিস্তৃতি ছিল কলিঙ্গ পর্যন্ত। 'শক্তিসংগমতন্ত্রে' উল্লেখ আছে গৌড়ের বিস্তার

ছিল কলিঙ্গ পর্যন্ত। 'কথাসরিৎসাগরে' বর্ধমানকে গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। ঈশাণবর্মন মৌখরীর হড়াহা লিপিতে গৌড়জনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'গৌড়ান্ সমুদ্রশ্রয়ান'। গুর্গি লিপিতেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপিতে আ-সমুদ্র গৌড়ের বিস্তৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত শশাঙ্কের রাজত্বকাল থেকেই গৌড় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করে।

বর্ধমান

পুণ্ড্রদেশের অন্যতম প্রশাসনিক বিভাগ ছিল বর্ধমান। বর্ধমান খ্রীষ্টপূর্বকালের প্রাচীন নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। জৈন 'কল্পসূত্র', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে যে ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'শিবি' অন্যতম। এই 'শিবি' মহাজনপদ বর্ধমান। বর্ধমান নামটি ভগবান মহাবীর বা বর্ধমানের নামানুসারে হতে পারে। মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচারের জন্য এই স্থানে বহুদিন অবস্থান করেছিলেন। এক সময় এখানে জৈন ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মল্লসারুল লিপি, দশম শতাব্দীর ইর্দা লিপি এবং দ্বাদশ শতাব্দীর গোবিন্দপুর লিপিতে উল্লিখিত আছে যে এই নগর ভুক্তি বিভাগের শাসনকেন্দ্র ছিল। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি তার রচনায় গঙ্গারিডিদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে যে 'পার্থলিস' নগরের নাম উল্লেখ করেছেন, সেই স্থানটি বর্তমানে বর্ধমানের পূর্বস্থলী। জৈন 'প্রজ্ঞাপনা' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, রাঢ় জনদের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ। দামোদরপুর-পট্টোলীতে (পঞ্চম শতক) উল্লিখিত আছে কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত।

চন্দ্রকেতুগড়

বাংলার ইতিহাসের এক সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন 'চন্দ্রককেতুগড়'। উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত বসিরহাট রেলপথে বেড়াচাঁপা ষ্টেশন থেকে মাইল খানেক দক্ষিণ-পূর্বে চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ। দীর্ঘকাল প্রকৃতির জঙ্গলে ও মানুষের উদাসীনতার অন্তরালে এই ঐতিহাসিক স্থানটি উপেক্ষিত অবস্থায় পরিত্যক্ত ছিল। গত কয়েক বছরে এই স্থানটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের

সংস্কৃতিতে' চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে লিখেছেন, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে উৎখনন করলে এই স্থান যে ইতিহাসের প্রাচীনতার দিক থেকে মৌর্য যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাতে আর সন্দেহের কোন কারণ নেই।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার আবিষ্কারক) বঙ্গীয় ১৩৩০ সনে (বার্ষিক বসুমতী) 'চন্দ্রকেতুগড়' নামে প্রবন্ধে লিখেছিলেন, যে স্থানটি এখন চন্দ্রকেতুগড় বলিয়া পরিচিত তাহা দূর হইতে দেখিলে একটি পুরাতন পুষ্করিণীর পাড় বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু নিকটে যাইলে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহা যে একটি পুরাতন দূর্গের ধ্বংসাবশেষ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাচীন দুর্গ বা নগরের প্রাকারে এক অংশে মহাকায় অশ্বত্থ ও বটে আচ্ছন্ন। এই অংশে এক স্থানে দুর্গের প্রধান বা সিংহদ্বারের চিহ্ন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সিংহদ্বারের ধ্বংসাবশেষের নিকট হইতে চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ বহুদূর বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লোকে নানাবিধ পুরাবস্তু পাইয়া থাকে। বেড়াচাঁপা স্টেশনের নিকট ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি চাউল ছাটিবার অথবা পাট বাঁধিবার কলে তিনটি অতি পুরাতন নিদর্শন দেখিয়া আসিয়াছিলাম। প্রথম একটি চতুষ্পদ পাথরের চৌকি। বিহার ও মধ্যপ্রদেশে এই জাতীয় পাথরের চৌকির নাম 'গোরেয়া'। গোরেয়ার উপর যে ছোট মূর্তিটি আছে তাহা অত্যন্ত পুরাতন। ইহা মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তি। কৌশাম্বী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রাচীন স্থানে এই জাতীয় মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হাজার হাজার বছর পূর্বে এই জাতীয় মূর্তি ভূমধ্যসাগর হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত মাতৃমূর্তিরূপে পূজিত হইত। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় এই জাতীয় প্রাচীনতম মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

একটি কালো ক্লোরাইট পাথরের স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া [illegible] স্তম্ভটিতে মসৃণ পালিশ আছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় যে তালিকা করেন তাতে চন্দ্রকেতুগড়ের [illegible] বর্ণনা আছে।

Specimens from Chandraketu's Garh, Berachampa, Dist. [illegible] Parganas.

200. Fragment of a Silver Vassel.

201. Fragment of a copper jar badly corroded.

202. Terracotta Plaque representing reeds tied with three bands.

203. Terracotta plaque bearing lower part of the legs of [illegible] wearing anklets.

204. Steatite seal bearing the letter Ma of the Northern Brahmi alphabet of 2nd and 3rd Century B.C.

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ইহার মধ্যে একটি রূপার পাত্রের টুকরো ও একটি শিলমোহর অত্যন্ত প্রাচীন। শিলমোহরটি ছোট ও বহুমূল্য, হরিদবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। এছাড়া একটি মৃৎপাত্রে একত্রবদ্ধ শস্যগুচ্ছ ছিল।

চন্দ্রকেতুগড়ে পুরাবস্তুর অভাব নেই। এখানে পাওয়া গেছে নানা রকমের পোড়ামাটির পুতুল ও মূর্তি যেমন খেলনা পাখি, মাতৃমূর্তি, মিথুন-ভাস্কর্য, বুদ্ধমূর্তি, মুদ্রাঙ্ক, যক্ষিনীমূর্তি, প্রতীক চিহ্ন, মৃৎপাত্র, হাতির দাঁতের পাশা, অলংকৃত সুতাকাটা তকলির চাকা। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত চিত্রলেখ (Pictograph) ও অপঠিত লিপি, উৎকীর্ণ মুদ্রাঙ্কগুলি (শিলমোহর) গবেষণার দাবি রাখে। মৌর্যযুগের লাঞ্ছনযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা (Silver Punchmarked), শুঙ্গ ও কুষাণ আমলের তামার ঢালাই (cast) ও লাঞ্ছনচিহ্নিত মুদ্রা, গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রাগুলি ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি মুদ্রাতে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহের ছবি আছে এবং 'লিচ্ছবিয়' শব্দটি লেখা আছে ব্রাহ্মী অক্ষরে।

১৯৫৬-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খননকার্যের সময় খনা মিহিরের ঢিবি নামক স্থানে ৬৩ ফুট x ৬৩ ফুট পরিমাপের একটি বিশাল উত্তরমুখী মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। মন্দির সংলগ্ন একটি মণ্ডপ আছে উত্তর দিকে ৪৫ ফুট x ৫৪ ফুট। এছাড়া পাওয়া গেছে আরও কয়েকটি মন্দির। এই মন্দিরগুলিই বাংলার প্রাচীনতম মন্দির। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকেতুগড়ে খননকার্যের সময় মাটির উপর থেকে ১৩ ফুট গভীরে ৫ থেকে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের (ছোট মুখ ৫ ইঞ্চি এবং বড় মুখ ৮ ইঞ্চি) এবং ২ ফুট ৭ ইঞ্চি দৈর্ঘের পোড়া মাটির নলযুক্ত ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী পাওয়া গিয়েছে। এই পয়ঃপ্রণালীটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর বলে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করা যায় যে এই রকম পোড়ামাটির নলযুক্ত পয়ঃপ্রণালী ক্রিটে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এটি ইউরোপের প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী। চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংশাবশেষে আবিষ্কৃত পয়ঃপ্রণালী নগরকেন্দ্রিক পূর্ত্ত পরিকল্পনায় ও সভ্যতার এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

চন্দ্রকেতুগড়ে পোড়ামাটির ফলকে লিপিগুলি মূলত ব্রাহ্মী। তবে খরোষ্ঠী লিপিও পাওয়া গেছে। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত শিলগুলি গোলাকার। কোন কোন শিলের বুকে লিখিত বর্ণমালার পাশে ছবি অঙ্কিত আছে। বেশ কয়েকটি অখণ্ড পাত্রের গায়েও লেখা আছে। একটি ভাঙা পাত্রের গায়ে লেখা আছে

'দালিফনজ।' পাত্রটিতে বাখা হত 'কোদ'। 'কোদ' হল শস্যসিদ্ধ জলের ফেনা। একটি শিলে লেখা 'অজ' নামক এক বণিকের নাম। আর শিলের গায়ে লিখিত একজন বণিকের নাম 'জুশত্র' (যশোদহ)। একটি শিলে লিপি থেকে জানা যায় 'দিজন্ম' নামে এক বণিকের কথা। একটি শিলে লেখা ছিল 'বলিপুত্র' নামে এক বণিকের নাম। শিলের উপর একটি নৌযানের ছবি আছে। শিলে লিখিত লিপিগুলি ব্রাহ্মী হরফে। বণিকের জাহাজটির নাম 'জলধিশক্র।'

শিললিপি থেকে জানতে পারা যায় প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য। একটি শিলে লেখা আছে 'গ ন র ঝ দ' (গণরাজ্যাৎ) শব্দটি। এখানে প্রাচীন কালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গঙ্গে বন্দর

সিংহলী পুরাণ এবং টলেমির রচনায় 'গঙ্গে' বন্দরের (Gange) উল্লেখ পাওয়া যায়। তৃতীয় কৃষ্ণের করহাড় অনুশাসনেও 'গঙ্গা' জনপদের উল্লেখ আছে। "দ্বারস্থাংগ কলিঙ্গগঙ্গা মগধৈরভ্যচিতাঞ্জশ্চিরং"। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক অজ্ঞাতনামা মিশরবাসী গ্রীক নাবিকের লেখা গ্রীক ভাষায় 'পেরিপ্লাস টেস্ ইরিথ্রাস থালসেলেস' যার ইংরাজী অনুবাদ 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে গঙ্গা নদী এবং গঙ্গে বন্দরের উল্লেখ আছে। 'পেরিপ্লাস' শব্দের অর্থ সমুদ্রের নিশানা। গ্রীকদের নিকট লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগর 'ইরিথ্রি' বা 'ইরিথ্রিয়ান সী' নামে অভিহিত ছিল। গ্রন্থটির বাংলা অর্থ ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রের পথনির্দেশিকা। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পেরিপ্লাস গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হয়। অনুবাদ করেছিলেন ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ডবলিউ, এইচ. সফ্ (Schoff) পেরিপ্লাস গ্রন্থের আর একটি ইংরাজী অনুবাদ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার । ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের আর একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন কমল চৌধুরী। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে আরব ও ইউরোপীয়রা তাদের ব্যবসা উপলক্ষে ভারতবর্ষে এসেছিল। সমুদ্রপথে বাণিজ্যে ভারতীয়রাও সুদক্ষ ছিল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে পণ্যদ্রব্য এনে ভারতীয় বণিকরা প্রাশ্চাত্য দেশগুলিতে রপ্তানি করত। প্লিনি (প্রথম শতক) লিখেছেন, বড় বড় ভারতীয় জাহাজ সমুদ্রপথে যাতায়াত করত। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার তার গ্রন্থে ইরিথ্রিয়ান সাগর উপকূলে বিভিন্ন বন্দরের উল্লেখ করেছেন এবং এই সমুদ্রপথে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য ও আমদানী রপ্তানীর বিবরণ দিয়েছেন। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের লেখকের নাম জানা যায় নি। কিন্তু তার রচনা থেকে জানা

যায় তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন গ্রীক এবং মিশরদেশে বসবাস করতেন এবং বাণিজ্য উপলক্ষে কয়েকবার মিশর থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। মিশরের মায়স হর্মস বন্দর থেকে পেরিপ্লাসের নাবিক আরব ও পারস্যের উপকূল অতিক্রম করে ভারতবর্ষে পাড়ি দেন। এরপর তিনি পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাটের উপকূল ধরে অগ্রসর হন। তারপর পেরিপ্লাস গ্রন্থকার দশারিণ বা দশার্ণ অর্থাৎ উড়িষ্যা অতিক্রম করে পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং শতমুখী গঙ্গার মুখে তিনি গঙ্গে বা গঙ্গা বন্দর প্রত্যক্ষ করেন। পেরিপ্লাস গ্রন্থে এশিয়া মহাদেশের শেষ জনপদ ক্রাইসি বা সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপেরও উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গঙ্গে বন্দর ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এখানে বিদেশী জাহাজ এসে ভিড়ত এবং দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরে প্রভৃতি মসলা এবং গাঙ্গেরী, সিলহাটি, মসলিন প্রভৃতি দামী বস্ত্র বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। গঙ্গে বন্দর থেকে সোনা, রূপা, মুক্তা, প্রবাল রপ্তানি হত। তাছাড়া এখানকার সুগন্ধী গাঙ্গেয় অঞ্জন তেলের চাহিদাও ছিল বিপুল। ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেনের জন্য স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। এখনকার প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল ক্যালটিস।

টলেমি (Ptolemy 139-161 A.D.) তার 'জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস' গ্রন্থে ইণ্ডিয়া ইনট্রা গাঙ্গেস অর্থাৎ আর্ন্তগাঙ্গেয় ভারত নামক বিবরণী ও মানচিত্রে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গারিডি ও গঙ্গে নামে রাজধানী ও বন্দরের উল্লেখ করেছেন। পেরিপ্লাসের বিবরণের সঙ্গে টলেমির বিবরণের সাদৃশ্য আছে।

গঙ্গে বা গঙ্গা বন্দরের অবস্থানক্ষেত্র কোথায় ছিল এ সম্পর্কে আধুনিক গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। আচার্য সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, প্রাচীন গাঙ্গেয় ভূমি অর্থে গঙ্গা শব্দ অনুমান করা যায়। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, প্রাচীন গঙ্গাসাগর সঙ্গমের তীর্থনগরই গঙ্গানগর। (দি সিটি অফ গঙ্গা, দি প্রশিডিংস অফ দি ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৪৭)। মন্দিরতলা, ধবলাট এবং সমগ্র সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন গঙ্গা বন্দর এখানেই ছিল।

আটঘরা

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমি তার আন্তগাঙ্গেয় ভারতের মানচিত্রে চারটি নগরের নাম উল্লেখ করেছেন। এই নগরগুলি যথাক্রমে পালুরা (Palura),

তিলোগ্রাম্মাম (Tilogrammum), গঙ্গে (Ganga Regia), আগ্গা (Agga)। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুরের নিকটবর্তী আটঘরায় উৎখননে টলেমি বর্ণিত আগ্গা নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে সিলমোহর, প্রস্তরনির্মিত ও বিভিন্ন ধাতু নির্মিত মূর্তি, পোড়মাটির মূর্তি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে মেষবাহন অগ্নিদেবতা, গৌতমবুদ্ধ, জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, যক্ষ-যক্ষিণী, বিষ্ণু, মহিষমর্দিনী, মাতৃকামূর্তি উল্লেখযোগ্য। আটঘরা থেকে পাওয়া গেছে ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ ফলক, পোড়ামাটির টালি, ইট, লাল রঙের ভগ্ন মৃৎপাত্র, পাথরের পুঁতিদানা, হাড়ের তৈরী কিলক, খেলনা পুতুল, নারীমূর্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের মতে নগরটি মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের সমকালীন।

পঞ্চনগরী, সোমপুর, পাণ্ডুয়া, পাহাড়পুর ও অন্যান্য নগর

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পুণ্ড্রদেশের অন্যতম প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল পঞ্চনগরী ও সোমপুর। পঞ্চনগরীর অবস্থান ছিল দিনাজপুর জেলায়। মালদহের কাছে পাণ্ডুয়া ছিল পুণ্ড্রদেশের অন্যতম নগরী। বর্তমান রাজসাহী জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুর ছিল পুণ্ড্রদেশের অন্যতম প্রাচীন তীর্থনগর। এখানে জৈন আচার্য গুহনন্দীর বিহার ছিল। পাল রাজত্বকালে সোমপুর মহাবিহার নির্মিত হয়। সোমপুর মহাবিহার বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান ছিল।

পুণ্ড্রদেশের নগর সম্পর্কে আলোচনায় আরও কয়েকটি নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ আছে পৌণ্ড্রদেশ সাতটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। গৌড়, বরেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি বর্দ্ধমান, নারীখণ্ড, বিন্ধ্যপার্শ্ব। গৌড়দেশের অন্যতম প্রধান নগর ছিল মৌরসিধাবাদ (মুর্শিদাবাদ)। বরেন্দ্রভূমির প্রধান নগর পুট্রিলা, নটারো, চপলা, কাকমারী। নীবৃত বিভাগের প্রধান নগরগুলি ছিল নগর, শ্রীরঙ্গপুর, বিহার। নারীখণ্ডের প্রধান নগরগুলি বৈদ্যনাথ, দেবগড়, সোনামুখী। বরাহভূমের প্রধান নগরগুলি রঘুনাথপুর, ধবল। বিন্ধ্যপার্শ্বের প্রধান নগর সুদর্শন, পুষ্পগ্রাম, বদরী কুড়গ্রাম। এই নগরগুলি ছিল প্রশাসনিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল।

কিভাবে পুণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রজাতি কালের গর্ভে বিলীন প্রায়?

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্র রাষ্ট্রের পতন হয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি, বৈদেশিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় যাদের গৌরবময় নাম, সেই বিশাল পুণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রজাতি কিভাবে বিলীন হল তা আলোচনা করা যাক।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের ২৯শ অধ্যায়ে (১৪-১৬) উল্লিখিত আছে—

'ততস্তু ক্ষত্রিয়া কেচিজ্জামদগ্ন্য—ভয়াদ্দিতাঃ।
বিবিশুর্গিরিদুর্গাণি মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব।।
তেষাং স্ববিহিতং কর্ম তদভয়ান্নানুতিষ্ঠতাম।
প্রজা বৃষলতাং গতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।।
এবং তে দ্রাবিড়াভীরাঃ পুণ্ড্রাশ্চ শবরৈ সহ।
বৃষলত্বং পরিগতাব্যুত্থানাং ক্ষত্রধর্মিণঃ।।'

অর্থাৎ পরশুরামের ভয়ে ভীত হয়ে ক্ষত্রিয় জাতিগুলি পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদেব পরবর্তী বংশধরেরা বৃষলত্বপ্রাপ্ত বা শুদ্রভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এরূপে দ্রাবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শববগণ ক্ষাত্রধর্মচ্যুত হওয়ায় বৃষলত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল।

মহাভারত, সংহিতা এবং পুরাণে আছে যে পরশুবাম ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

পরশুরাম সংহিতাতে উল্লিখিত আছে—

'জামদগ্ন্যস্য ভয়েন ক্ষাত্রধর্মং পরিত্যজেৎ।
কৃষিকর্ম্মাদি কার্য্যঞ্চ কৃত্বা শুদ্রবদাচরেৎ।।

*   *   *   *

পৌণ্ড্রকাদি হি দৃশ্যতে সাবিত্রীপতিতঃ পৃথৌ।।'

অর্থাৎ জামদগ্নোর ভয়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম পরিত্যাগ করে শূদ্রবৎ আচরণ পূর্বক কৃষিকর্ম গ্রহণকারী পৌণ্ড্রকাদি পৃথিবীতে সাবিত্রীভ্রষ্ট হয়েছিল।

কালিকাপুরাণে উল্লিখিন আছে—

'জামদগ্ন্যভয়াদ্ভীত পূর্বক্ষত্রিয় এব বা।
শূদ্রত্বং সমনুপ্রাপ্তাং জল্পীশং শরাংগতাঃ।।'

অর্থাৎ জামদগ্ন্যের ভয়ে ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল।

স্কন্দপুরাণে'র ৪৭শ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে,

'এবং হত্বার্জুনং রাম সন্ধায় নিশিতান্ শরাণ্।
এক এব যযৌ হস্তুং সর্বানেবাতুরান্ ণৃপান্।।
কেচিদগহন মাশ্রিত্য কোচিং পাতালমাবিশন।।'

অর্থাৎ পরশুরাম শরসন্ধান দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে হত্যা করে সমস্ত আশঙ্কাতুর ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশের জন্য গমন করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ অরণ্যে, কেহ পাতালে প্রবেশ করেছিল।

মহাভারত, সংহিতা ও বিভিন্ন পুরাণাদি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আর্য আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের অনার্য শাসকগণ পরাজিত হয়ে পাহাড়, অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধররা কৃষিজীবী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। পরশুরাম আর্য জাতির প্রতিভূ। মহাভারত এবং পুরাণাদি থেকে দেখা যায়, যে সকল জাতি পরশুরামের কাছে পরাজিত হয়েছিল, তারা সকলেই অনার্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। মহাভারতে এই সকল জাতিগুলির উল্লেখ আছে। যেমন দ্রাবিড়, আভীর, পুণ্ড্র, শবর। মহাভারত রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে। আর্যরা সিন্ধু উপত্যকায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে প্রবেশ করলেও সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে তাদের প্রায় দুহাজার বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল। আমরা জানি যে আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ) তখন পূর্বভারতে মগধ সাম্রাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। স্বয়ং আলেকজাণ্ডার মগধের প্রতিপত্তির সংবাদ শুনে পূর্বভারতের দিকে অগ্রসর হন নি। মেগাস্থেনিস যখন পাটলীপুত্র নগরে অবস্থান করেছিলেন, তখন তিনি গাঙ্গেয় অববাহিকায় 'গঙ্গারিডি' জাতির কথা উল্লেখ করেছেন, যে জাতি ছিল স্বাধীন এবং তাদের এক বিশাল শক্তিশালী সৈন্যদল ছিল। 'গঙ্গারিডি' জাতির গবেষক নরোত্তম হালদারের মতে, গঙ্গারিডি রাজ্য ছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের দক্ষিণ অংশ এবং গঙ্গারিডি রাজ্যের শাসকগণ ছিল বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পূর্বপুরুষ।

পৌণ্ড্র সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র মহাস্থানগড়ে বাংলাদেশ এবং ফরাসী সরকারের যৌথ খননকার্যের ফলে ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। সবচেয়ে উপরের স্তরটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের এবং সবচেয়ে নীচে স্তরটি খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের পুরানো। সুতরাং এক সুদীর্ঘকাল পুণ্ড্ররাজ্য তার স্বাধীনতা রক্ষায় সক্ষম হয়েছিল।

আর্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল পঞ্চম শতাব্দীতে। সম্ভবত গুপ্ত রাজারাই প্রথম পুণ্ড্র, বঙ্গ দখল করে আর্য প্রভুত্বের সূচনা করেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজা শশাঙ্ক পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গে এক স্বাধীন শক্তিশালী নৃপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং বলা যেতে পারে গুপ্ত রাজারাই পুণ্ড্রদেশ সর্বপ্রথম দখল করেছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গে এক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই শূন্যতা পূরণে জন্যসাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপালকে গৌড়ের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। এই গোপালই বাংলার বিখ্যাত পাল বংশের প্রথম শাসক। পাল রাজবংশের রাজধানী ছিল গৌড়। গৌড়ের পাশেই ছিল পাণ্ডুয়া প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনের সামন্ত শাসকদের গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্দ্র।

পাল রাজত্বকালে বৌদ্ধ পৌণ্ড্ররা পালবংশের শাসনব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। বিশাল পাল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পাল বংশের পতনের পর বাংলাদেশে সেন বংশের রাজত্বকাল শুরু হয়। সেনরা ছিল ব্রাহ্মণাধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বল্লালসেনের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণদের সমাজের শীর্ষস্থানে রাখা হয়। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে অন্ত্যজ বা শূদ্র শ্রেণীতে চিহ্নিত করে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজিত পৌণ্ড্র জাতি এই অপমান মেনে নেয় নি। পরবর্তীকালে মুসলমান রাজত্বকালে তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলাম ধর্মের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ তাদের আকৃষ্ট করে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঘৃণা, বঞ্চনা ও অপমানের বিরুদ্ধে তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক মহেন্দ্রকরণের মতে মধ্যযুগে ৫ লক্ষ পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ আছে, "The Namasudras, aggregate about 18,61,000 and the pods nearly half a million; but in full large numbers have been converted to Mahamedanism and now call themselves Seikh. There are ten and a half million of Mahamedans in Decca and chittagong Division and it has been shown that the great majority of these are the descendant of converts from the ranks of these two castes.

হুসেন শাহের রাজত্বকালে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, বাংলাদেশের অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মের ঘৃণা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এই ধর্মান্তর গ্রহণ রোধ করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার শুরু করেন। হিন্দুধর্মের যাগ-যজ্ঞ, জটিল ক্রিয়াচার নয়, শুধুমাত্র অন্তরে ভগবৎ ভক্তি থাকলেই ঈশ্বরলাভ হয় তা প্রচার করেন। তাঁর একমাত্র মন্ত্র হল 'হরিবোল, হরিবোল'। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সহজ 'ভক্তিবাদী দর্শন' প্রচারে সক্ষম হলেন। পৌণ্ড্রজাতি এই দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা দলে দলে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্র জাতি ইতিপূর্বে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রোপকূলবর্তী গভীর অরণ্যে ২৪ পরগণা, খুলনা, হাওড়া ও মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তারা তখনও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করত যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ধূর্জটি নস্কর তাঁর 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক' গ্রন্থে লিখেছেন যে ছত্রভোগ অধিপতি পৌণ্ড্র রামচন্দ্র খাঁ নস্করের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যদেব অতিথি হিসাবে ছিলেন। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম এই বৈষ্ণব ধর্মকে গ্রাস করে এবং পৌণ্ড্রজাতি হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে।

একদা বিশাল সভ্যতার ধারক ও বাহক পৌণ্ড্রজাতি এইভাবেই বর্তমান যুগে এক দরিদ্র, তফশিলী হিন্দুজাতি হিসাবে একটি সম্প্রদায়। প্রয়াত ঐতিহাসিক মহেন্দ্রকরণের ভাষায়, "They are a dying race".

পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্রক, পুঁড়ো, পোদ

পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র, পোণ্ড্রক, পুঁড়ো, পোদ মূলত একই জনগোষ্ঠী। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায়। মনু লিখিয়াছেন যে পৌণ্ড্রক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, 'অন্ধ্রা, পুণ্ড্রা, সবরা, পুলিন্দা, মুতিবা, ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি।' মহাভারতেও এই পুণ্ড্রদিগের কথা আছে। সভাপর্বে আছে যে ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকি কচ্ছবাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার পূর্বভাগকে বলিত। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গলার পূর্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গলার পশ্চিম ভাগ। উইলসন সাহেবও স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব নিরুপণকালে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশকেই পুণ্ড্রজাতিতে সংস্থাপন করিয়াছেন।

"Poundras the western provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it include the following districts : Rajashahi, Dinagepore and Rungpore : Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Midnapore and the Jungle Mehals; Ramghur, Pacheti, Palamow and part of Chunar." তারপর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েঙ্গ সাঙ নামক চীন পরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুণ্ড্রদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেব ঐ চীন পরিব্রাজকের লিখিত দিক ও দূরতা লইয়া পৌণ্ড্রবর্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরুপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বলিলে পৌণ্ড্রবর্ধনের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত। তারপর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, 'অনুজায় বিষাণবর্ম্মনে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ড্রাভিযোগায় বিরোচয়ং'। অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবর্ম্মাকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দশকুমারচরিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ। উপরিলিখিত উক্তি কোন মৈথিল রাজার উক্তি। অতএব দশকুমার যখন রচিত হয়, তখনও পুণ্ড্রেরা মিথিলার নিকটবর্তী।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্বকাল হইতে দশকুমারচরিত ও হিয়েন্স সাঙের সময় পর্য্যন্ত পুণ্ড্র নামে প্রবল জাতি বাঙ্গলার পশ্চিমাংশে বাস করিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট পুণ্ড্র নামে কোন জাতি নাই। এই পুণ্ড্রজাতি তবে কোথায় গেল?

সংস্কৃত শব্দে 'ণ্ড' থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার ড়-কার হইয়া যায়। আর ণ-কার লুপ্ত হইয়া পূর্ববর্ত্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দু রূপে পরিণত হয়। যথা—ভাণ্ডের স্থলে ভাঁড়, ষণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শুণ্ডের স্থলে শুঁড়। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশ প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাদির সচরাচর লোপ হয়,—যথা তাম্র স্থলে তামা, আম্র স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তারপর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, শুণ্ড স্থলে শুঁড় হয়, তেমনি পুণ্ড্র স্থলে পুঁড় বা পুঁড়ো হইবে। পুঁড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি।

আমরা পূর্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে পুণ্ড্রেরা অনার্য জাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে, অতএব পুঁড়ো আর একটি অনার্যবংশোদ্ভুত বাঙ্গালী জাতি।

শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত স্থান শব্দ কোথাও থান, কোথাও ঠাঁই, চন্দ্র শব্দ কখন চন্দ্রর, কখন চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালীর উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পুণ্ড্র শব্দ স্থান বিশেষ পুণ্ডর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালীরা শব্দের পরে একটা ঈ-কার বেশীর ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমন সাঁওতাল সাঁওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ ঈ-কার যোগে পুণ্ড্র শব্দ পুণ্ডর হইতে পুণ্ডরীতে পরিণত হয়। পুণ্ডরী বলিয়া একটি বহু সংখ্যক বাঙ্গালী জাতি আছে। পুণ্ড্রেরা এবং পুঁড়েরা যদি অনার্থ তবে পুণ্ডরীরাও অনার্য জাতি।

পোদ শব্দ পুণ্ড্র হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং পুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্মিয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয়।

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিযা থাকিবে যে পুঁড়ো, পুণ্ডরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি

প্রাচীন পুণ্ড্রজাতির সন্তান। পুণ্ড্রেরা অনার্য্য জাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আরও তিনটি অনার্য্যজাতি পাওয়া যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিমত সমর্থন করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন, নৃতাত্ত্বিক অতুল সুর এবং আধুনিক ঐতিহাসিকগণ। পোদ জনগোষ্ঠী এখন পোদ-পৌণ্ড্র নামে জাতীয় স্তরে স্বীকৃত। পোদ শব্দটি সম্ভবত প্রাকৃত পুড শব্দ থেকে এসেছে। পুণ্ড্রদেশের পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিতে। শিলালিপিটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। লিপিটি প্রাকৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মী হরপে উৎকীর্ণ। এই শিলালিপিতে উল্লিখিত পুডনগল শব্দটিকে পুণ্ড্রনগর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে যার অর্থ পুণ্ড্রদের নগর। আর্য ভাষার 'র' ও 'ল' দু'টি শব্দ প্রকৃত ভাষায় 'ল' হয়ে ব্যবহৃত হত।

পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠীর সামাজিক বিন্যাস ও পদবী

ভারতীয় জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক বিন্যাস ও পদবীর ইতিহাস আলোচনায় সর্বপ্রথম লোকেশ্বর বসু মহাশয়ের 'আমাদের পদবীর ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকা আলোচনা করা যাক। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, সমস্ত বর্ণ ও জাতির ইতিহাস একই। রক্তের দিক থেকে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ কৃত্রিম ও মনগড়া, জাতিগুলির ইতিহাসও কাল্পনিক। সেকালে শাস্ত্রগুলি যেমন জাতি ও বর্ণের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিল যা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনই ভ্রান্ত বর্তমানকালের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ জাতি বা বর্ণ বলে কিছু নেই। আবার জাতি-সংকরত্ব একটি অবাস্তব ধারণা। কোন জাতিই সংকর জাতি নয়, অন্যদিকে কোন জাতিই বিশুদ্ধ রক্তধারণ বহন করে আসেনি। বৃত্তি ভাষা-পরিবেশ মানুষের দেহগঠনে বা চরিত্রে পরিবর্তন ঘটালেও রক্তধারা একই থাকে। দেশভেদে কালভেদে জনগোষ্ঠীর বৃত্তি অনুযায়ী অদের জাতিনাম গড়ে উঠেছিল। বর্ণ বিশ্বাসী শাস্ত্রকারগণ সেগুলিকেই বর্ণাশ্রমের মধ্যে স্থান দিতে গিয়ে সংকরত্ব আবিষ্কার করেন।

সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে পদবীর বিষয়টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও তার সূচনাপর্ব মনুসংহিতার সমকালীন। মনু উল্লেখ করেন,

'শর্মদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্য সংযুক্তং।।'

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শর্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্মা, বৈশ্যের ভূতি এবং শূদ্রের দাস ইত্যাদি উপপদ সংযুক্ত হবে। কিন্তু বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, জাতকের কোন চরিত্রের নামের শেষে উপপদ সংযুক্ত হয় নি। মহাভারতে দুর্যোধন, দুঃশাসন বা যুধিষ্ঠির, অর্জুন, কৃষ্ণ, রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত কারো কোন পদবীর উল্লেখ নেই। গোত্র ও প্রবর কারক বহুসংখ্যক ঋষির নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাদের নামের শেষে ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়জ্ঞাপক শর্মা বা বর্মা কোন উপপদের উল্লেখ নেই। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত হেমকুণ্ডন, বিকুণ্ডণ বা বরাহ পুরাণে গোকর্ণ প্রভৃতি বৈশ্যের উপাখ্যান আছে কিন্তু তাদের নামের শেষে বৈশ্যত্বজ্ঞাপক ভূতি শব্দ সংযোজিত হয় নি। পদবীর উৎপত্তিতে টোটেম, দেশজ শব্দ, নামের শেষাংশ, ধর্ম, স্থান, রাজ সরকার প্রদত্ত উপাধিসূচক পদবী, বৃত্তি বা সূত্রে পদবী প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠীর সামাজিক বিন্যাস ও পদবী আলোচনা করা যাক। সুপ্রাচীন কাল থেকেই পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠীর সামাজিক বিন্যাস ছিল সৌভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৌণ্ড্রসমাজে ব্রাহ্মণদের মত ভেদাভেদ ছিল না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিন শত শ্রেণী (জাতি) ছিল এবং তাদের মধ্যে বিবাহাদি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠীর সকল ব্যক্তিই তাদের গুণ, কর্ম অনুযায়ী সামাজিক মর্য্যাদা ভোগ করত। পৌণ্ড্র সমাজের প্রতিটি নাগরিক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে তাদের পছন্দ বা ইচ্ছা অনুযায়ী নিজেদের নিয়োজিত করত।

পরবর্তীকালে তাদের জীবিকাগুলি কিছু সুযোগ-সুবিধার জন্য বংশ-পরম্পরায় পরিবারের উত্তরাধিকারীরাও গ্রহণ করে। ক্রমে ক্রমে জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত উপাধিগুলি তাদের মধ্যে বর্তায়। এইভাবে মধ্যযুগে একই সঙ্গে পারিবারিক উপাধি ও সামাজিক বিন্যাস পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।

এই প্রসঙ্গে বৃত্তি বা পেশা থেকে পদবীর উৎপত্তি বিষয়টিও আলোচনা করা যেতে পারে। মধ্যযুগে জাতি পরিচয় ছিল বৃত্তি অনুযায়ী। ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণে কায়স্থ, বৈদ্য, পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
:রিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা।।

পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর বহু পদবী যেমন মণ্ডল, পুরকাইত, হালদার, বিশ্বাস প্রভৃতি পদবীগুলি বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান। মাণ্ডলিক বা গ্রামপ্রধান থেকে মণ্ডল পদবী, পুরকাইত শব্দের অর্থ উচ্চপদবিশিষ্ট রাজকর্মচারী। লোকেশ্বর বসু 'আমাদের পদবীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'উপরতলার হিন্দুরা কোন কোন পদবীকে প্রাচীন রাজাদের সঙ্গে যুক্ত করে আত্মসন্তোষ লাভ করেন এবং উপাধি বা রাজপদবাচক পদবী নীচু তলায় দেখতে পেলে বিস্মিত হন। অতীত নিয়ে গর্ব করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে পৌণ্ড্র, পাল, কৈবর্ত্তরাই দীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছে এই বাংলাদেশে। এখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর বংশগত উপাধিগুলি যা পরবর্তীকালে পদবী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে তার উল্লেখ করছি।

অধিকারী—অধ্যক্ষ, দলপতি।

আড়ী—যে আড়াল থেকে হিংস্র পশু শিকার করে।

কবি—কবিগানকারী বা কাব্যকার।

কবিরাজ—চিকিৎসক।

করণ—করণিক বা লেখক।

কয়াল—মাপদার/হিসাবরক্ষক।

কান্ডার—নৌকার মাঝি।

কামার—লৌহশিল্পী।

কালসা—কাল সহ, বনিয়াদী।

খাঁ—(ফারসী খাঁদা—শিক্ষিত) অভিজ্ঞ, শিক্ষিত।

গাইন—গায়ক।

গায়েন—গ্রামের মান্য ব্যক্তি।

গারু—(গাবর শব্দ হতে উদ্ভুত) কর্ণধার।

গিরি—পর্বতের ন্যায় উচ্চ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত।

গোলদার—গোলাদার, আড়তদার।

ঘরামী—গৃহনির্মাণ শিল্পী।

চৌধুরী—সামন্ত রাজা।

ছাটই—লাঠিয়াল সৈন্য (ছাট-লাঠি)।

জোদ্দার—জোতদার, কৃষিজমির অধিকারী।

তরফদার—(তরফ-মহাল) তরফের রাজস্বকারী।

তুরকী—অশ্বারোহী।

দরবার—রাজসভাসদ, বিচারক।

দপ্তরী—কাগজাদি সরবরাহকারী। দলিল, পুস্তকাদি বিন্যাসকারী।

দাস—শ্রীকৃষ্ণের সেবক এই অর্থে প্রযুক্ত (বৈষ্ণব উপাধি)।

ধাড়া—বিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ।

নস্কর বা লস্কর—জাহাজের নাবিক, নৌবাহিনীর যোদ্ধা।

নায়ক—নেতা।

নায়া বা নেয়ে বা নাইয়া—নৌচালক।

ডাকুয়া—লোক ডাকিবার কর্মচারী।

ঢালী—ঢালধারী সৈন্য।

পর্বত—উচ্চ সম্মানিত।

পাইক—গ্রাম রক্ষক, লাঠিয়াল সৈন্য।

পাটারী—গোমস্তা, গ্রাম্য করসংগ্রহকারী কর্মচারী।

পাত্র—সভাসদ।

পুরকাইত—পুরকায়স্থ, উচ্চপদবিশিষ্ট রাজকর্মচারী।

প্রামাণিক—বিশ্বাস্য, বিজ্ঞ, প্রধান, গ্রামের মান্য ব্যক্তি।

বর—শ্রেষ্ঠ।

বণিক—ব্যবসায়ী।

বাওয়ালী—বাউল সাধক।

বাঘ—নির্ভীক, তেজশালী।

বক্সী—মুসলমান রাজসরকারের কর্মচারী।

বাগানী—উদ্যানকারী।

বাপুলী—বাউল সম্প্রদায়।

বাছাড়ি—বাছাইকারী, নির্বাচক।

বাড়াই, বাড়ুই—কাঠের মিস্ত্রি।

বায়েন—বাজিয়ে।

বিজলী—ধনুর্দ্ধর, রণজয়ী ব্যক্তি।

বিশ্বাস—রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্মচারী।

বৈদ্য—চিকিৎসক।

বৈরাগ্য, বৈরাগী—বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী।

ভরসা—যাকে নির্ভর করা যায়। আশ্রয়, সাহসী।

ভুঁইয়া—জমিদার, ভূম্যধিকারী।

মণি—রত্ন, শ্রেষ্ঠ।

মণিয়ান—মান্যগণ।

মণ্ডল—গ্রামনায়ক।

মাইতি—পণ্ডিতি সম্পন্ন।

মহন্তী—দলের শ্রেষ্ঠ।

মাঝি—নৌ-চালক।

মিস্ত্রি—কারিগর,

মালি—মাল্যকার, উদ্যানকার।

মৃধা—(মৃধ অর্থে যুদ্ধ) যোদ্ধা।

মিদ্যা/মিদ্দে/মির্দ্ধা—নৌচালক।

রপ্তান—রপ্তনিয়া বা রপ্তানিকারক, বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী।

রঞ্জিত—রণজয়ী ব্যক্তি।

রায়—রাজা, শ্রেষ্ঠ।

শিকারী—শিকারকারী।

সর্দার—দলপতি।

সরদার—প্রভু, শাসনকর্তা, রাজার আদায়কারী কর্মচারী।

সাঁফুই—নির্দোষ, কুলীন।

সানা—সৈনিক।

সিংহ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

হাজরা—হাজারী, সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক।

হালদার—হাবিলদার, সৈন্যাধ্যক্ষ।

পৌণ্ড্রজাতির শ্রেণী বিন্যাস

কুলতন্ত্র নামক প্রাচীন পুস্তকে পৌণ্ড্রজাতিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

'দক্ষিণোত্তর রাঢ়ীয়ৌ বঙ্গজশ্চৌড্র এবহি।
শ্রেণীচতুষ্টয়স্তেতে পৌণ্ড্রজাতিঃ সমুচ্যতে।।'

অর্থাৎ পৌণ্ড্রজাতি দক্ষিণ রাঢ়ীয়, উত্তর রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও ওড্র এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত।

রাঢ়ীয়গণ প্রধানত দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলায় বসবাস করে। এই সকল অঞ্চলে পৌণ্ড্র সম্প্রদায় পুঁড়ো বা পুণ্ডরী নামে পরিচিত। পুঁড়ো এবং পোদ যে একই পৌণ্ড্রজাতি একথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে বাঙালীর উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পুঁড়ো ও পোদের একত্ব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

"The Pundaris or Puros are found mainly in Birbhum, Malda, Rajsahi and Mursidabad. The name seems to indicate that they are in reality Pods, but by residence at a distance from the head quarter of the caste thay have gradually come to lose connection with it, and the Puros of Malda profess to know nothing of the Pods of the 24 Parganas though they admit that they belong to the same caste as Puros of Birbhum." The Census Report, 1901. P. 425. 'নিত্যানন্দ সেবক' পত্রিকার সম্পাদক মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার নিবাসী পুঁড়ো সমাজের পূর্ণচন্দ্র রায় তাহার 'আর্যপৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ' পুস্তিকায় দক্ষিণবঙ্গের পোদ এবং উত্তরবঙ্গের পুঁড়ো একই জাতিগোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গজগণ বাঙলা পোদ নামে পরিচিত। এই শাখাই সংখ্যায় সর্বাধিক। ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, হাওড়া ও নদীয়া জেলার পৌণ্ড্রসমাজের প্রায় সকলেই বঙ্গজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ওড্রজগণ প্রধানত মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় বসবাস করে। মেদিনীপুর জেলা বহুদিন উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে এই স্থানের মানুষের চালচলন, আচার ব্যবহার এমনকি ভাষার উপরও উড়িষ্যার

প্রভাব পবিলক্ষিত হয়। আশ্চর্যভাবে লক্ষণীয় বঙ্গজ ও ওড্রজ পৌণ্ড্রদের মধ্যে একদা বিবাহাদি হত না।

স্মরণাতীত কাল থেকে ২৪ পরগণা, খুলনা এবং হাওড়া জেলার পৌণ্ড্রজাতি নিজেদের পদ্মরাজ বলে পরিচয় দিত। অপবদিকে রাটীয় পৌণ্ড্রগণ তাদের পুণ্ডরীক নামে এখনও পরিচয় দেয়। পুণ্ডবীকেব অর্থও পদ্ম।

মেদিনীপুর অঞ্চলের পৌণ্ড্রগণ বহুকাল পূর্ব থেকে নিজেদের 'বলাই' নামে পরিচয় দিত। প্রাচীন দলিলপত্র, সবকারী রেকর্ড প্রভৃতিতে তাদের Sub-Caste 'বলাই' নামে উল্লিখিত ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এবং হান্টার সাহেবের মেদিনীপুর জেলার বিবরণীতে (Statistical Account of Bengal, Midnapore, P-50) মেদিনীপুর জেলায় পৌণ্ড্রগণ 'বলাই' নামে উল্লিখিত হয়েছে। বলাই বালেয় শব্দের অপভ্রংশ। মহারাজ বলির পুত্র পুণ্ড্রের বংশধর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ 'বালেয় ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত। হরিবংশ, গরুড়পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎসপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে বলিবংশীয় পৌণ্ড্রাদি পঞ্চক্ষত্রিয় বালেয় ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত।

'অঙ্গ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈবচ।
পুণ্ড্র কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।।'

হরিবংশ ৩১/১৫

'বলি সুতপসো জজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গকাঃ।
সুহ্মপৌণ্ড্রাশ্চ বালেয়া অনপান স্তথাঙ্গতঃ।।'

গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ড ১৪৩/৭১

'অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গসুহ্মপুণ্ড্রাখ্য বালেয়ং ক্ষত্রমজনাত।'

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ খণ্ড

'অঙ্গং স জনয়ামাস বঙ্গং সুহ্মং স্তথৈবচ।
পুণ্ড্রকলিঙ্গঞ্চতথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।।'

মৎস্যপুরাণ, ৪৩/২৬

'পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গো বালেয়ো বলের্যোগী বলান্বিতঃ।'

অগ্নিপুরাণ, ২৬৭/১১

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মেদিনীপুরের পৌণ্ড্রগণ 'বলাই' এর পরিবর্তে নিজেদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিচয় দিতে শুরু করে।

প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগে পৌণ্ড্রজাতির বৃত্তি

খ্রীষ্টপূর্ব কালে পৌণ্ড্রজাতি পুণ্ড্রদেশের শাসকগোষ্ঠী ছিল। এই সময় তারা মূলত বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামরিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। একই সঙ্গে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য কার্যে নিযুক্ত ছিল। প্রাচীনকালে কৃষিকাজ সম্মানজনক বৃত্তি ছিল। অথর্ববেদে উল্লিখিত আছে. 'কৃষিং সাধ্বিতি বিপ্রাণাং শক্‌ত্রি পুত্রাদয়ো জগুঃ।' পরাশর সংহিতাতে উল্লেখ আছে,

'ষটকর্মসহিতে বিপ্রঃ কৃষিবৃত্তিং সমাশ্রয়েৎ।

কুর্যাৎ কৃষি প্রযত্নেন সর্ব্বসত্ত্বোপজীব্যকৃৎ।।'

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ষটকর্মের সহিত কৃষিকর্ম করবেন। অন্যত্র মনুসংহিতাতে উল্লেখ আছে, ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ পুজয়েৎ।' অথাৎ ক্ষত্রিয়গণও কৃষিকর্ম করে দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করবেন। স্বভাবতই প্রাচীনকাল থেকেই পৌণ্ড্রজাতি বিপুল সংখ্যায় কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতকের প্রস্তর লেখখণ্ড থেকে জানা যায়, সেই সময় পুণ্ড্রদেশে ধন সম্বলের প্রধান উপকরণ ছিল ধান। সন্ধ্যাকার নন্দীর রামচরিতেও উত্তরবঙ্গে ধান চাষের চিত্র পাওয়া যায়।

কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্র পুণ্ড্রদেশের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ছিল। সুদূর মিশর ও রোমে পুণ্ড্রদেশের কার্পাস ও রেশমবস্ত্র রপ্তানি হত। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মিশরীয় নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', অথবা চর্যাগীতি থেকেও পুণ্ড্রদেশের কার্পাসবস্ত্র ও রেশমবস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুণ্ড্র জনগোষ্ঠীর একটি শ্রেণী এই সময় রেশমশিল্প কার্যে নিয়োজিত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রাচীনকালে পুণ্ড্রদেশ আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছিল। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ এবং টলেমির বিবরণে গঙ্গা বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তর্দেশিক বাণিজ্যে পুণ্ড্র বণিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নদীবহুল পুণ্ড্রদেশে জলপথেই অধিক ব্যবসা বাণিজ্য হত। ইৎসিঙের বিবরণ ও সোমদেবের কথা সরিৎসাগরে অন্তর্দেশীয় স্থলপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত পথের উল্লেখ আছে। যুয়ান-চোয়াঙ বারাণসী, বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, কজঙ্গলের পথে পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। যুয়ান-চোয়াঙের সাতশ বছর পূর্বে চাঙ্-কিয়েন নামে

এক চীনা রাজদূতের লেখায় দক্ষিণ চীন থেকে ব্রহ্মদেশ, কামরূপ, পুণ্ড্রবর্ধন পাটলিপুত্র, বারাণসী হয়ে আফগানিস্থান পর্যন্ত একটি বাণিজ্য পথের উল্লেখ আছে। এই সকল বাণিজ্য পথের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় পুণ্ড্রদেশের জনগোষ্ঠীর একাংশ ব্যবসাজীবী ছিল এবং তারা অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল।

মধ্যযুগে পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠী মূলত যে কৃষিজীবী ছিল সমকালীন বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। কবি রামেশ্বর প্রণীত 'শিবায়ন' কাব্যে ভগবতী পার্বতী দারিদ্র্যের প্রতিকারের জন্য মহাদেবকে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করতে বলায় মহাদেব উত্তর দিয়েছিলেন—

বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসূতা।
দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা।।
ভিক্ষা দুঃখে সুখে আছি আকিঞ্চন পণে।
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।।
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
সকল সম্পূর্ণ যার নাহি তার ডর।।

এখানে কৃষকের কার্যকে পোদবৃত্তি বলা হয়েছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান যে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী মধ্যযুগে কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। রামেশ্বর মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ ছিলেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্র বা পোদ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম আদমসুমারীতে পোদ ও পুঁড়ো জাতির জীবিকা সম্পর্কে এইরূপ লিখিত হয়েছে।

পোদ (Pod)—নৌজীবী ও মৎস্যজীবী

পুঁড়া (Pura)—মৎস্য ও শস্য ব্যবসায়ী

(Bengal Census Report 1872 Appendix-cxxxiii)

অপরদিকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জনবিবরণীতে বলাই আখ্যাধারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণকে কৃষিজীবী বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, সমুদ্র উপকূলবর্তী ও নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে বসবাসরত পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর একাংশ মৎসজীবী ও নৌজীবী হলেও এই জনগোষ্ঠী প্রধানত কৃষিজীবী।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বেলির মেদিনীপুর জেলার জলামুঠা ও মাজনামুঠা স্টেটের সেটেলমেন্ট বিবরণীতে মেদিনীপুরেব নিম্নলিখিত জাতিগুলিব তালিকা ও জীবিকা উল্লিখিত আছে—

জাতির নাম	জীবিকা
ডোম	ঝুড়ি প্রস্তুতকারক
ভোসিয়া ও মাহাবা	পাল্কীবাহক
মুচি	জুতা নির্মাতা
তেলী	তৈলকার
গোয়ালা	দুগ্ধাদি বিক্রেতা
কৈবর্ত ও পোদ	কৃষিজীবী
ধোবা	বস্ত্রধাবক
তাঁতি	বস্ত্র বয়নকারী
কেশুরিয়া খাদাল	দিনমজুর
নাপিত	ক্ষৌরকার
কাঁড়রা ও কদমা	তস্কর ও দিনমজুর
করঙ্গা	সানাইবাদক
জেলিয়া	মৎস্যজীবী

উপরোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হয় কেবলমাত্র কৈবর্ত ও পোদ বা পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী কৃষিজীবী সম্প্রদায়।

রিজলী সাহেব তাঁর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে পৌণ্ড্র বা পোদ জনগোষ্ঠীর জীবিকা সম্পর্কে লিখেছেন— The great majority of the caste are engaged in agriculture, as tenure holders and occupancy rayats. A few have risen to be zaminders and some of the other end of the scale work as nomadic cultivators in freshly cleared land in the Sundarbans, changing their location every two and three years according to the fortune of their crops. Many Pods have taken to trade and gold-smith, tin-smith, carpenters etc.found among them. Vol II, P-177.

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। উক্ত রিপোর্টে পোদ (পৌণ্ড্র) জনগোষ্ঠীকে কৃষি, নৌ ও মৎস্যজীবী (Boating and fishing) বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টেও পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা সম্পর্কে একই মন্তব্য করা হয়েছে। ১৯০১

খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পোদ বা পুঁড়া জনগোষ্ঠীর জীবিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

জাতি	প্রধানত যে স্থানে দৃষ্ট হয়	মন্তব্য
পোদ	দক্ষিণবঙ্গ	কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ী জাতি। পৌণ্ড্রক নামেও অভিহিত হয়। (A fishing, cultivating and trading caste, also called Poundrak
পুণ্ডরী (পুঁড়া)	মালদহ	রেশমকীট পালনকারী, মূলত পোদ (Silk-worm rearers, originally Pods)

(Report on the census of Bengal, 1901, Administrative volume, Appendix 1, P. XIV.

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে পোদ বা পৌণ্ড্র জাতি কৃষি ও মৎস্যজীবী। এই জনবিবরণীতে পৌণ্ড্রজাতির জনসংখ্যা ৫, ৩৬, ৫৯০ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে জাতীয় বৃত্তির তালিকা শীর্ষক বিবরণে পৌণ্ড্রজাতি সম্পর্কে লিখিত হয়েছে—

জাতির নাম—পোদ (হিন্দু)। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের অধিবাসী।

প্রকৃত কর্মীর সংখ্যা—পুরুষ ১৬০, ১০৭, স্ত্রী ১২২,৭৬৮।

পোষ্য (Dependants)—পুরুষ ১১১, ৬৩৪, স্ত্রী ২০৬, ৬৩৮।

বৃত্তি	পুরুষ	স্ত্রী
পরম্পরাগত জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন	১৪৫,০৪৭	৫,৫০২
জমির খাজনা দ্বারা আয়কারী	২১০	৩৬
সর্বপ্রকার কার্যকারী	১,৪৩৫	৪৭
চা বাগানের মালিক, বনবিভাগের কর্মচারী, জমিদারের ম্যানেজার, তহশীলদার, মজুরী প্রভৃতি	২,০৬২	১০
ক্ষেত্রে কার্যকরী ও কাঠুরিয়া	১,৮৬৪	৮

গৃহপালিত পশুপালনকারী, দুগ্ধাদি বিক্রেতা	১,২২৭	৯৭
খনিমজুর	৩	—
শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবী	১৪০	২৫৯
শিল্পী	২,৮৫২	৩,৫৬১
আমদানী বিভাগের ও জাহাজের কর্মচারী	৩৬	১
নৌজীবী, গাড়োয়ান প্রভৃতি আমদানী বিভাগের শ্রমিক	৩৪৫	২২
সৈন্যবিভাগে উচ্চ কর্মচারী	৪	—
(Commissioned and Gazetted Officer)		
সৈন্যবিভাগে অন্যান্য কর্মচারী	১০৯	৫
বিচার বিভাগে নিয়োজিত উচ্চ কর্মচারী	৫	—
বিচার বিভাগের অধীন অন্যান্য কর্মচারী	৫০	২
সাধু বা সন্ন্যাসী	৬	২
আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক	৩৩৭	৫
ব্যবসাগত নানা বিভাগীয়	৫০	৩৫
গৃহকর্মচারী	১০৬৯	৩৪০
কন্ট্রাকটর, কেবাণী, খাজাঞ্চী	১০৮	১৪
স্ব স্ব আয়ের উপর জীবিকা নির্বাহকারী	১৩৪	৪০
নানাবিধ শ্রমিক	১৩৩২	৬৬৯

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জনবিবরণীতে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর ৫,৮৮,০০০ ব্যক্তি কৃষিজীবী উল্লিখিত হয়েছে। অন্য কোন জীবিকার উল্লেখ নেই।

বর্তমানে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী মূলত কৃষিজীবী। যদিও এই জনগোষ্ঠীর বহু মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী, শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিভিন্ন শিল্প কলকারখানার শ্রমিক হিসাবে জীবন যাপন করছে।

পুণ্ড্রদেশের জাতি ও বর্ণ

জাতি ও বর্ণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত অধ্যায়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামো জাতি ও বর্ণবিন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সমাজের যা কিছু উত্থান ও পতন এবং তার বিবর্তন জাতি ও বর্ণের মধ্যে নিহিত। নীহাররঞ্জন রায় বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন, "বর্ণাশ্রমই ভারতীয় সমাজের ভিত্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর্যপূর্ব ও অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এই বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং আদর্শের মধ্যে সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়াছে। বস্তুত বর্ণাশ্রমাশ্রিত সমাজবিন্যাস এক হিসাবে যেমন ভারত ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট, তেমনই অন্যদিকে এমন সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী এবং গভীর অর্থবহ সমাজ-ব্যবস্থাও পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

বস্তুত জাতি ও বর্ণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রাচীনতম বিন্যাস হলেও আর্যপূর্ব কালে তা শিথিল ছিল। আর্যপূর্ব কালেও ভারতবর্ষে অসংখ্য বর্ণ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল বহু স্তর-উপস্তর। আর্য স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা বিভিন্ন অভিনব ও অবাস্তব উপায়ে বর্ণ, জন ও কোমের স্তর ও উপস্তরকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মনু থেকে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টার অবিরাম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। চতুর্বর্ণের বহির্ভূত অসংখ্য বর্ণ ও কোমের নরনারীর সঙ্গে চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নরনারীর যৌনমিলনের ফলে যে বর্ণ, উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে বলে স্মৃতিকারগণ নিরন্তর প্রচার করে গেছেন তা অনৈতিহাসিক ও অলীক।

আর্য শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদদ্বয় থেকে শূদ্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। এই ধারণা কল্পনা মাত্র। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ বেদান্তসার, যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থে মানব-মনকেই হিরণ্যগর্ভ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যোগবাশিষ্টের উৎপত্তি প্রকরণে দ্বিতীয় ও ততীয় সর্গে মনকেই ব্রহ্মা বলা হয়েছে। সুতরাং চতুর্বর্ণের সৃষ্টি রহস্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বৈদিক যুগের প্রথম কালেও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ছিল না। জন্মগত, বর্ণগত বর্ণভেদও শিথিল ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তান কর্মের জন্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রত্বে অবনীত হতেন। আবার অন্যান্য বর্ণও কর্মগুণে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হতেন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় শৌনকের চার পুত্র কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ বা শূদ্র হয়েছিল (বিষ্ণুপুরাণ ৪/৮, হরিবংশ ২৯, অগ্নিপুরাণ ২৮)। মহাভারতের শল্যপর্বে উল্লিখিত আছে, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি

প্রমুখ ব্যক্তিবণ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। ব্যাস, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মনীষীগণ শূদ্রগর্ভজাত। মহাভারতের বনপর্বে আছে।

"শূদ্র যোনৌ হি জাতস্য সদগুণানুপতিষ্ঠতঃ ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মণ্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈবচ।।
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভি জায়তে।"

বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলন করেছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতাগণ। স্মৃতিশাস্ত্রকারদের মধ্যে হয়ত সমসাময়িককালের সামাজিক অবস্থার কিছুটা প্রতিফলন আছে কিন্তু যে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে চতুর্বর্ণের মিলনের ফলে সমাজের যে বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সৃষ্টি করা হয়েছে তা অনৈতিহাসিক ও অলীক।

পুণ্ড্র দেশের জাতি ও বর্ণবিভাগ বিষয় আলোচনাকালে উল্লেখ করা যায়, প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলির একটিও পুণ্ড্রদেশে রচিত হয় নি। সুতরাং এই সকল স্মৃতিশাস্ত্রে পুণ্ড্রদেশেব বর্ণবিন্যাসগত সামাজিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় না। একাদশ শতকের পূর্বে পুণ্ড্রদেশে সামাজিক বিষয়ে কোন স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয় নি। যদিও আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব পুণ্ড্রদেশে আরও পূর্বেই সূচিত হয়েছিল। বস্তুত পুণ্ড্রদেশে বর্ণবিন্যাসের ইতিহাস আর্যীকরণের সূত্রপাতের সময় থেকেই সূচিত হয়েছিল।

পুণ্ড্রদেশে আর্যীকরণের তথা বর্ণবিন্যাসের প্রথম পর্বের ইতিহাসের উপাদান রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনু-বৌধায়ণ স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে কিছুটা পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতেও কিছু তথ্যের উল্লেখ আছে।

গুপ্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বর্ণবিন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। এই সময় থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুণ্ড্রদেশের বর্ণ ও জাতি বিন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদান বিভিন্ন লিপিমালায় পাওয়া যায়। স্মৃতিগ্রন্থ ব্যতীত বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বল্লালচরিত এবং বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থমালায় পুণ্ড্রদেশের বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রাহ্মণেতর সমস্ত শূদ্রবর্ণের ছত্রিশটি উপ ও সংকর বর্ণের বিভাগ উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ সম্ভবত দ্বাদশ শতকের রচনা।

আর্যীকরণের সূচনার পূর্বে পুণ্ড্রদেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যথেষ্ট সংখ্যক ছিল। অন্যান্য ভাষাভাষী বিভিন্ন কোমে বিভক্ত জনজাতিও যথেষ্ট সংখ্যক ছিল। এই সকল কোমের মধ্যে বিবাহ, ধর্ম ও আচারগত বিধিনিষেধও কিছুটা ছিল। পরবর্তীকালে আর্য-ব্রাহ্মণদের

বর্ণবিন্যাসের চিন্তায়-চেতনায় তার কিছুটা প্রভাবও ছিল। আর্য ব্রাহ্মণরা সুপরিকল্পিতভাবে এই বিরোধকে কেন্দ্র করে সুবিধামত সমাজে জাতি ও বর্ণের বিভাজন করে নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন লোকায়ত সংস্কৃতির বিরোধ বহু শতাব্দী ধরে চলেছিল। তার প্রমাণ পুণ্ড্রদেশে গুপ্ত রাজত্বকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি স্বীকৃত হয় নি। আর্য ব্রাহ্মণ পুণ্ড্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠায় কখনও পুণ্ড্র জনগোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে আবার কখনও তাদের আর্যীকরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদেশের জনগোষ্ঠীকে দস্যু বলা হয়েছে। আবার এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আখ্যানে পুণ্ড্রদের বিশ্বামিত্রের বংশধর বলা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আরট্ট, পুণ্ড্র প্রভৃতি কোমদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে মনু পুণ্ড্র কোমের জনগোষ্ঠীকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের সভাপর্বে পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। পুণ্ড্রভূমির করতোয়া তীরকে তীর্থক্ষেত্র বলা হয়েছে। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে পুণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। মনু লিখেছেন পৌণ্ড্রকরা ক্ষত্রিয় ছিল কিন্তু ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে বহুদিন না আসায় তাদের শূদ্র পর্যায়ে অবনমিত করা হয়েছে।

পুণ্ড্রদেশের জাতি ও বর্ণবিন্যাসের ইতিহাসে ব্রাহ্মণদের পরিচয় গুপ্ত রাজত্বকালেই প্রথম পাওয়া যায়। ১ নং দামোদর লিপিতে (৩৪৩-৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) কপর্টিক নামে এক ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞকার্য সম্পাদনের জন্য ভূমি ক্রয়ে আবেদন কবছেন। ৩ নং দামোদর লিপিতে নাভক নামে এক ব্যক্তি কয়েকজন ব্রাহ্মণকে বসবাসের জন্য ভূমি ক্রয় করছেন। ধনাইদহ পট্টোলীতে দেখা যায়, কটক নিবাসী ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ পুণ্ড্রদেশে ভূমি লাভ করছেন। বৈগ্রাম পট্টোলী থেকে জানা যায়, ভাস্কর ও ভোয়িল নামে দুই ভ্রাতা গোবিন্দস্বামীর নিত্য পূজার জন্য ভূমি ক্রয় করছেন। এই সকল লিপিগুলি পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ভূমি সম্পর্কিত। এই সকল ঘটনা প্রমাণ করে পঞ্চম শতকে পুণ্ড্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীর পূজা, মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ভিন প্রদেশী ব্রাহ্মণরা পুণ্ড্রদেশে এসে বসবাস করছেন।

পুণ্ড্রদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য ব্রাহ্মণদের বসতি সূচিত হয়েছিল কিন্তু আর্য বর্ণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বসতি বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সমসাময়িক কালের পুণ্ড্রদেশের রাজণ্যবর্গও ক্ষাত্রিয়ত্বের দাবী করে নি।

পুণ্ড্রদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সবিশেষ উল্লেখ আছে কিন্তু বৈশ্য বর্ণের উল্লেখ নেই। কোন স্মৃতি গ্রন্থাদিতে তার প্রমাণ নেই। এমন কি বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণেব উল্লেখ নেই। বস্তুত পুণ্ড্রদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ বর্ণ হিসাবে গঠিত হয় নি। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে, বাঙলার আর্যীকরণ ঋগ্বেদীয় আর্য সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী হয় নি। সে কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নিয়ে চাতুবর্ণ সমাজ বাংলাদেশে প্রচলিত হয় নি। বাংলার বর্ণ সমাজ আলপীয় আর্য সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী গঠিত। বাংলার বর্ণ বিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজদের নিয়ে গঠিত। কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য সংকর বর্ণ শূদ্র পর্যায়ের। সর্বনিম্নে অন্ত্যজ বর্ণ। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুণ্ড্রদেশের জনগোষ্ঠীর বর্ণ বিন্যাস এইভাবেই গঠিত হয়েছিল।

পাল রাজত্বকালে বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের পরেই ক্ষেত্রকর এবং কুটুম্ব অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদের স্থান। তারপরেই সমাজের অন্যান্য বর্ণ। চর্যাগীতিতে সমকালীন সময়ের কয়েকটি নিম্নবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—ডোম, চণ্ডাল, শবর, কাপালি। কাহ্নপাদের একটি পদে আছে।

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ।।

ডোমেরা নগরের বাইরে কুঁড়ে বেঁধে বাস করত এবং ব্রাহ্মণ স্পর্শ তাদের নিষিদ্ধ ছিল। শবরেরা বাস করত জঙ্গলে, পাহাড়ে।

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।

আবার এই চর্যাগীতির মধ্যে বজ্রযান বৌদ্ধ দেবতা পর্ণশবরীর রূপ পাওয়া যায়।

জাতি ও বর্ণের ইতিহাস আলোচনায় একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্টপূর্বকালে এ দেশের জাতি ও বর্ণের রূপ ছিল ভিন্নতর। মেগাস্থেনিস লিখেছেন, এ দেশে সাতটি জাতি ছিল। যথা পণ্ডিত, কৃষক, পশুপালক, বণিক, যোদ্ধা, কার্য্যাধ্যক্ষ ও অমাত্য। এই সকল জাতি বর্ণের মধ্যে বিবাহাদিও নিষিদ্ধ ছিল না। জাতিভেদের কঠোরতাও ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সংহিতা রচনাকারী ব্রাহ্মণগণ তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিবিধ সংকরবর্ণের উদ্ভব ও ভেদাভেদের কঠোরতা লিপিবদ্ধ করেন। অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণান্তর বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। মনু সংহিতায় শূদ্র বর্ণের প্রতি বিদ্বেষবশত

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় সমস্ত ক্ষেত্রে শূদ্রদের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিভিন্ন পুরাণ, সংহিতায় শাস্ত্রকারগণ বর্ণ ও জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে অলীক ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে তাদের নিজ স্বার্থে এই সকল অন্ত্যজ বর্ণ ও জাতিকে হীন প্রতিপন্ন করে এবং নিরন্তর তার প্রচার করে। হিন্দু রাজন্যবর্গও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ব্রাহ্মণদের সহায়ক হয়েছিল। ব্যাস সংহিতায় উল্লেখ আছে,

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণির্ক কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ।।
বরটো মেদ চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ।
এতে হন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চানো চ গবাশনা।।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নাহং দর্শণাদর্কবীক্ষণম।

অর্থাৎ বর্দ্ধকা (বড়াই বা সূত্রধর), নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বাপদ, কোলজাতি অন্ত্যজ। বৌদ্ধ পরবর্তী যুগেই অধিকাংশ পুরাণাদি ও সংহিতার সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পতাকা উড্ডীন ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্মের জোয়ার ছিল অতি প্রবল। পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষার জন্য আর্য ব্রাহ্মণেরা পর্ব ভারতকে নিষিদ্ধ ও পতিত দেশ বলে ঘোষণা করেছিল। মনু সংহিতাতে উল্লেখ আছে,

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেযু চ।
তীর্থযাত্রাবিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমহতি।।

অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে গমন করলে পতিত হতে হয়।

ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন। উশন সংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে,

কাপালিকাঃ পাশুপতাঃ পাষণ্ডাশ্চৈব তাদ্বিধাঃ।
ষসাশ্নন্তি হবিংষ্যেতে দুরাত্মনস্ত তামসাঃ।।

অর্থাৎ বৌদ্ধ মতাবলম্বী শ্রাবক, নিগূঢ় অর্থাৎ দিগম্বর জৈন, পঞ্চরাত্রবেত্তা, কাপালিক, পাশুপত ইত্যাদি যত পাষণ্ড আছে, এই সকল দুরাত্মা তামস ব্যক্তিরা যারা শ্রাদ্ধে হবিভোজন করে, তার শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হবে না।

বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদের শিথিলতা ছিল। ধম্মপদে আছে, 'ন জচ্চা বসলো হোতি না জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো। কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি

ব্রাহ্মণো।' অর্থাৎ জাতি দ্বারা বৃষল হয় না। জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। কর্মের দ্বারা বৃষল হয় এবং কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।

পৌণ্ড্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় বর্মন এবং সেন যুগে। রাজা জাতবর্মা কৈবর্তরাজ দিব্যকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার জাতবর্মার সৈন্যরা ধ্বংস করেছিল। বর্মণ রাষ্ট্রের ভট্ট ভবদেব বৌদ্ধদের সঙ্গে বিতর্ক ও সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাজা ভোজবর্মা যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ কাণ্বশাখ এবং ব্রাহ্মণ রামদেব শর্মাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের জন্য পুণ্ড্রদেশে ভূমিদান করেছিলেন। ভট্ট ভবদেব বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারের প্রধান হোতা। ভট্ট ভবদেব কুমারিল ভট্টের মীমাংসা গ্রন্থের টীকাকার এবং স্মৃতিগ্রন্থের লেখক। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ বিভিন্ন বর্ণের স্তর উপস্থর বিভাগের সীমা, আহার, বিহার ও বিবাহাদি বিষয়ে বিধিনিষেধ এবং পুরোহিত তান্ত্রিক নির্দেশ এই সময়ই গৃহীত হয়। বর্মন রাষ্ট্রে যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল, সেন রাজত্বকালে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেনযুগে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের মনোবৃত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত ও ধর্মশাস্ত্রকারগণ এই সময়কালেরই। জীমূতবাহনের পরেই বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের নাম উল্লেখযোগ্য। বল্লালসেন স্বয়ং একাধিক স্মৃতি গ্রন্থের লেখক। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' এগুলির মধ্যে অন্যতম। 'দানসাগর' তিনি রচনা করেছিলেন তার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের আদেশে। ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্যের লেখক গুণবিষ্ণুও এ যুগের। স্মৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে সেনযুগে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন হলায়ুধ। তিনি ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। এ যুগের স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সুস্পষ্ট। পূজানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের শুভ অশুভ কাল বিচার, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও আর শাস্তি, শ্রাদ্ধ, উত্তরাধিকার, আহার বিহারের বিচিত্র বিধিনিষেধ, তিথি নক্ষত্রের বিচার, সমাজের বিচিত্র স্তর, উপস্তর, বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের বিধিনিষেধ এ সকল স্মৃতিকারদের আলোচনার বিষয় ছিল। এই স্মৃতিশাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেন রাজত্বকালে ভিনদেশী ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করে এ দেশে বসতি স্থাপনে সহায়তা করা হয়েছিল। বিভিন্ন লিপিতে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বল্লালসেনের নৈহাটি লিপি থেকে জানা যায়, তার মাতা বিলাসদেবী ব্রাহ্মণ বাসুদেব শর্মাকে ভূমিদান করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপি থেকে

জানা যায়, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মাকে ভূমি দান করেছিলেন। লক্ষ্মণসেন যে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করেছিলেন তা এই লিপিতে উল্লেখ আছে। গোবিন্দপুর পট্টোলীর ভূমিদান গ্রহীতা ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব শর্মা, সুন্দরবন লিপিতেও প্রভাস, রামদেব, কেশব, বিষ্ণুপাণি, কৃষ্ণধর দেবশর্মা প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের উল্লেখ আছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদেও পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি লিপিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিপালদেবের (১২২০) পট্টিকেরা লিপিতে এই সময়কার বৌদ্ধ সহজধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন কি পঞ্চদশ শতকেও বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের অনুলিপি থেকে। কিন্তু বর্মন, সেন যুগে রাজণ্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সামাজিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের উপর আঘাত হেনে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় প্রথম হয়েছিল। বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থাদি, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং সমসাময়িক লিপিমালায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত বর্ণই সংকর। চতুর্বর্ণের পারস্পরিক যৌনমিলনে তাদের উৎপত্তি এবং তারা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। এই গ্রন্থে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণেরা এই সকল সংকর শূদ্রবর্ণকে তিনটি বিভাগে ভাগ করে তাদের স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এই বর্ণ উপবর্ণের উৎপত্তির ব্যাখ্যার সঙ্গে অবশ্য বাস্তব ইতিহাসের কোন যোগ নেই। এই গ্রন্থে তিন পর্যায়ে ৩৬টি উপবর্ণ বা জাতের উল্লেখ করা হয়েছে যদিও তালিকাভুক্ত ৪১টি জাত। উত্তম সংকর পর্যায়ে ২০টি উপবর্ণ। (১) করণ (লেখক) (২) অম্বষ্ঠ (চিকিৎসক/বৈদ্য) (৩) উগ্র (এদের ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি) (৪) মাগধ (সংবাদবাহী/দূত) (৪) তন্তুবায় (তাঁতী) (৬) গান্ধিক বণিক (৭) নাপিত (৮) গোপ (৯) কর্মকার (কামার) (১০) তৈলিক (১১) কুম্ভকার (কুমোর) (১২) কাংসকার (কাঁসারী) (১৩) শঙ্খকার (শাঁখারী) (১৪) দাস (কৃষিকাজ যাদের বৃত্তি) (১৫) বারুজীবী (বারুই/পান উৎপাদনকারী) (১৬) মোদক (ময়রা) (১৭) মালাকার (১৮) সূত (১৯) রাজপুত্র (রাজপুত?) (২০) তাম্বলী (তামলী/পানবিক্রেতা)

১২টি উপবর্ণ মধ্যম সংকর। (১) তক্ষণ (খোদাইকর) (২) রজক (ধোপা) (৩) স্বর্ণকার (৪) সুবর্ণবণিক (৫) আভীর (গোয়ালা) (৬) তৈলকার (তেলি) (৭) ধীবর (৮) শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) (৯) নট (১০) শাবক (বৌদ্ধ শ্রাবকদের বংশধর?) (১১) শেখর (?) (১২) জালিক (জেলে)।

অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের ৯টি উপবর্ণ। (১) মলেগ্রাহী (২) কুড়ব (?) (৩) চণ্ডাল (৪) বরুড় (বাউরী?) (৫) তক্ষ (তক্ষণকার) (৬) চর্মকার (৭) ঘট্টজীবী (খেয়া ঘাটের রক্ষক/মাঝি) (৮) ডোলাবাহি (ডুলি বেহারা) (৯) মল্ল (মালো)। এই ৪১টি জাত ব্যতীত কয়েকটি দেশী ও ভিনদেশী জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা পুক্কস, পুলিন্দ, থর, খস্, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সৎ ও অসৎ এই দুই পর্যায়ে শূদ্রবর্ণের বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। সৎশূদ্র ঃ (১) করণ (২) অম্বষ্ঠ (দ্বিজপিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান) (৩) বৈদ্য (৪) গোপ (৫) নাপিত (৬) ভিল্ল (আদিবাসী কোম) (৭) মোদক (৮) কুবর (?) (৯) তাম্বুলী (১০) স্বর্ণকার (১১) মালাকার (১২) কর্মকার (১৩) শঙ্খকার (১৭) সূত্রধর (১৮) চিত্রকর (১৯) স্বর্ণকার। সূত্রধর, স্বর্ণকার ও চিত্রকর পরবর্তীকালে কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করার জন্য পতিত হয়ে অসৎশূদ্র পর্যায়ে গণ্য হয়েছিল।

অসৎশূদ্র ঃ (১) অট্টালিকাকার (২) কোটক (ঘরবাড়ী নির্মাতা করে) (৩) তীবর (৪) তৈলকার (৫) লেট (৬) মল্ল (৭) চর্মকার (৮) শুঁড়ি (৯) পৌণ্ড্রক (১০) মাংসচ্ছেদ (কসাই) (১১) রাজপুত্র (পরবর্তীকালের রাউত) (১২) কৈবর্ত (১৩) রজক (১৪) কৌয়ালী (১৫) গঙ্গাপুত্র (লেট তীবরের বর্ণসংকর সন্তান) (১৬) যুঙ্গি (যুগী) (১৭) আগরী (বর্তমানের আগুরী)।

অসৎশূদ্র পর্যায়েরও নিম্নে অর্থাৎ অন্ত্যজ পর্যায়ে যে সকল জাতির উল্লেখ করা হয়েছে তাদের তালিকা যথাক্রমে ব্যাধ, কাপালি, কোল, কোঞ্চ (কোচ) হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী), শরাক (প্রাচীন শ্রাবকদের বংশধর), বালগ্রাহী ও চণ্ডাল।

ভবদেব ভট্ট অন্ত্যজ পর্যায়ের যে জাতিগুলির উল্লেখ করেছেন, তারা হল রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কস, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌভিক, কৈবর্ত।

লক্ষণীয় বিষয় যে, সমাজের যারা উৎপাদক শ্রেণী শিল্পী, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সকলকেই মধ্যম বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্বর্ণকার, তৈলকার, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক, শৌভিক, তক্ষণ, ধীবর, জালিক, কৈবর্ত্ত, অট্টালিকাকার, কোটক, চর্মকার সকলেই অসৎশূদ্র পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিক সমাজ অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ। চণ্ডাল, বরুড় (বাউড়ী), ঘট্টজীবী (পাটনী), ডোলবাহী (দুলিয়া দুলে) মল্ল, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী) সকলেই সমাজের শ্রমিক শ্রেণী। এদের স্থান সমাজের অন্ত্যজ পর্যায়ে

নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। চর্যাগীতিতে ডোম, চণ্ডাল, শবরদের বর্ণ ও বৃত্তি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। বস্তুত এই সময় এই সকল শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধ সহজ ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

সমসাময়িক লিপি ও স্মৃতিগ্রন্থ থেকে আরও কতকগুলি প্রাচীন ক্রোমের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা ভিল্ল, আভীর, মেদ, কোল, পৌণ্ড্রক, পুক্কস, খস, কম্বোজ, সুহ্ম, শবর, অন্ধ্র। এদের অসৎশূদ্র পর্যায় বা অন্ত্যজ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে যে বর্ণভেদ বিন্যাসের সূচনা হয়েছিল, সেন রাজত্বকালে তা বিস্তৃততর হয়ে দৃঢ় ও অকল্পনীয়ভাবে হিন্দু সমাজকে স্তরে উপস্তরে বিভক্ত করেছিল।

হিন্দু সমাজের সামাজিক সাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার বিচিত্র পদ্ধতিতে এদেশে আদিবাসী ও প্রাচীন জাতিগুলি সমাজের নিম্নতর স্তরে স্থান পেয়েছিল এবং ব্রাহ্মণগণ তথাকথিত এই সকল নিম্নবর্গীয় জনসমাজের উপর বিভিন্ন সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। কালক্রমে এই সকল বিধিনিষেধ সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে পড়ে। সমাজে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা বিস্তৃত হয়।

বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal Vol. I উল্লেখ করা হয়েছে, 'An important factor in the evolution of this final stage is the growing .iction that alomst all Non-Brahmans were Sudras. The origin of this fiction is perhaps to be traced to the extended significance given to the term Sudra in the Purans, where it denotes not only the members of the forth caste but also those members of the three higher castes who accepted any of the heretical religions or were influenced by tantric rites'. The predominance of Buddhism and Tantric Saktism in Bengal as compared with other parts of India since the eighth century A.D. perhaps explains why all the notable castes in Bengal were degraded in the Brihad-dharma Purans and other texts as Sudras and the story of vena and pritha might be mere echo of a large scale re-conversion of the Buddhist and Tantric elemants of the population into the orthodox Brahmanical fold (P. 578)

সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ধর্মের উচ্ছেদের জন্য নানাবিধ কৌশল করেছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপে বহু বৌদ্ধ হিন্দু ধর্মের মধ্যে এসেছিল। যে সকল জাতি হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রথমে এসেছিল তারা সৎশূদ্র জাতি। যারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আসে নি তারাই মূলত অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য বলে

ঘোষিত হয়েছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তিতে এই সকল জাতি হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করেছিল। এই সকল জাতি পতিত, অনাচরণীয় বলে গণ্য হয়েছে। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'The Modern Buddhism' গ্রন্থে লিখেছেন, After the Mahamedan conquest Brahmanic ideals were superinfused on the Buddhist ideals of Society. The distinction among the classes became more and more prominent till they developed into a regular caste system. People forgot their old history, the history of their own distinctions were due either to crossbreeding or to excommunication. Thus a social edifice was built up in Bengal with the Brahmins forming the topmost part. The existence of buddhism was forgotten. Masses of Anacharaniya classes are the survivals of the forgotten Buddhism and those who have come under the Brahmanic influences. The more one would study the social history of Bengal, the more will one be convinced that the classes were not really depressed. They continue to be what they were; only they have lost their consciousness of a great past intellectually, morally and socially.

এই ঘৃণ্য জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ভারতবর্ষকে বহু শতাব্দী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। সামাজিক অনুদারতা ও স্বার্থপরতার নিপীড়নে পুণ্ড্র জাতির অধিকাংশই মুসলমান রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে লেখা হয়েছে, শেখ মুসলমানগণ প্রায় সকলেই নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র এই দুই জাতির বংশধর। চট্টগ্রাম বিভাগের দেড় কোটি মুসলমানের অধিকাংশ এই দুই জাতি হতে মুসলমান ধর্মে আগত। প্রেসিডেন্সি বিভাগে মুসলমানের মধ্যে এই জাতিদ্বয়ের ধর্মান্তরীতের সংখ্যা অল্প সংখ্যক নয়। 'The Namasudras aggregate about 18,61,000 and tne pods nearly half of a million but the full large numbers have been converted to Mahamedanism in the Dacca and Chittagong Divisions and it has been shown that the great majority of thse are the descendants of converts of the same origin in the southern districts of the Presidency division. It would probably be safe to say that at least nine millions of the Mahamedans of Bengal proper belong to this stocks'—(The Census Report of Bengal, 1901, P-396).

প্রাচীন ও মধ্যযুগে স্মরণীয় পৌণ্ড্র ব্যক্তিত্ব

পৌণ্ড্র কুলপতি মহারাজ বাসুদেব (খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী)

মহাভারতের যুদ্ধের সময় পূর্ব ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল মগধ ও পুণ্ড্র রাজ্য। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অনতিপূর্বে এই ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন বাসুদেব। মহাভারতের সভাপর্বে ১৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, মহাবল বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কৌরব পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

হরিবংশের ভবিষ্যপর্বের ৯৩ অধ্যায়ে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের এক বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাসুদেবের বন্ধু ছিলেন প্রাগ্জ্যোতিষপুররাজ নরক। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নরক নিহত হলে বাসুদেব বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অষ্ট সহস্র রথ, বহু সহস্র গজ ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম গ্রন্থের দশম স্কন্ধের ছেষট্টিতম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব দুই অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মিত্র কাশীরাজ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ সম্রাট বাসুদেবকে সাহায্য করেছিলেন।

পৌণ্ড্রকোহপি তদুদযোগমুপলভ্য মহারথঃ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ দ্রুতম।।
তস্য কাশিপতির্মিত্রং পার্ষ্ণিগ্রাহোহন্বায়ান্নৃপ।
অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ।।

পূর্বভারতের সমস্ত রাজণ্যবর্গ এই যুদ্ধে মহাবাজ বাসুদেবকে সাহায্য করেছিলেন। এইসব রাজণ্যবর্গের মধ্যে নিষাধরাজ একলব্যও ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বাসুদেবের বীরত্বে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, এর কি আশ্চর্য বীর্য, কি দুঃসহ ধৈর্য।

মহারাজ বাসুদেব ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে গেছেন। তাঁর অসীম বীরত্ব, সাহসিকতা, বন্ধু বাৎসল্য কিংবদন্তীর স্তরে উন্নীত হয়েছে। তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান পুরুষ।

মহামুনি কপিল (খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী)

প্রাচীন যুগে পুণ্ড্রদেশে বহু মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন। এই সকল মনীষীদেব মধ্যে মহামুনি কপিল সর্বশ্রেষ্ঠ। হবিবংশে উল্লেখিত আছে, সম্রাট পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও মহামুনি কপিলের পিতা ছিলেন বসুদেব। বসুদেবের দুই পত্নী ছিল। সুতনু ও নারাচী। সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্রক বাসুদেব এবং নারাচীর গর্ভে কপিল জন্মগ্রহণ করেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব পরবর্তীকালে পুণ্ড্ররাজ্য লাভ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অপরদিকে কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করেন।

'সুতনুশ্চ নারাচী চ শৌরে রাস্তাং পরিগ্রহৌ।
পৌণ্ড্রশ্চ কপিলশ্চৈব বসুদেবস্য তৌ সুতৌ।।
নারাচ্যাং কপিলো জজ্ঞে পৌণ্ড্রশ্চ সুতনু সুতঃ।
তয়োর্নৃপোহভবৎ পৌণ্ড্রঃ কপিলশ্চ বনং যযৌ।।

—হরিবংশ, ১৬০ অঃ।

মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে,—

সুতনুবথরাজী চ শৌরে বাস্তাং পবিগ্রহৌ।
পুণ্ড্রশ্চ কপিলশ্চৈব বসুদেবাত্মজৌ বলৌ।।

—মৎসপুরাণ, ৪৬ অঃ

পৌণ্ড্রদেশের দক্ষিণে যেখানে গঙ্গা নদী হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিশেছে, সেই গঙ্গা নদীর মোহনায় এক বৃহৎ দ্বীপ সাগর দ্বীপ নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে এই দ্বীপ 'সগর দ্বীপ' নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে উল্লেখ আছে, এই দ্বীপে মহামনি কপিল বসবাস করতেন। এখানেই মহামুনি তাঁর বিখ্যাত 'সাংখ্য-দর্শন' রচনা করেছিলেন। এই সাংখ্য-দর্শনে তিনি তাঁর বিস্ময়কর মনীষার পরিচয় রেখে গেছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ সাগর দ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বসতিস্তর পাওয়া গেছে এবং এই এলাকায় যে বহু প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর এবং সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকে প্রস্তর যুগ ও তাম্রাশ্ম যুগের নিদর্শন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত মহাশয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব আধিকারিক স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত দেউলপোতায় খননকার্য চালিয়ে প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। সাগরদ্বীপের মন্দিরতলায় প্রাক্ মৌর্য যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া

গেছে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় এখানে তাম্রাশ্ম যুগে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

মৌর্য যুগেও এই অঞ্চলে সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণেও এই অঞ্চলের খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর এক উন্নত সভ্যতার বিবরণ পাওয়া যায়।

মহামুনি কপিল এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল অসীম। তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করেননি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের উন্নতি বিধানের জন্য গভীর চিন্তাভাবনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মহামুনি একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তি।

শ্রেষ্ঠী সার্থপতি (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী)

প্রাচীন পুণ্ড্ররাষ্ট্র শুধুমাত্র সামরিক শক্তিতে নয়, ব্যবসা বাণিজ্যেও উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। পুণ্ড্রদেশের বণিকেরা অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মগধ, উজ্জয়িনী, বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় জনপদগুলির সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, কম্বোজ এবং পশ্চিমে ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তারা বাণিজ্য করত।

বৌদ্ধযুগে পৌণ্ড্রদেশ ব্যবসা বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। বৌদ্ধ কাহিনীতে উল্লেখ আছে, অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুমাগধার বিবাহ হয় পুণ্ড্রনগরের শ্রেষ্ঠী সার্থপতির পুত্র বৃষদত্তের সঙ্গে। সার্থপতি পুণ্ড্রনগরের অতি ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বারাণসী, উজ্জয়িনী, মথুরা প্রভৃতি নগরীর বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলির সঙ্গেও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সুমাগধার আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন এবং ছ'মাস এখানে অবস্থান করেছিলেন। বুদ্ধদেব সার্থপতির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রেষ্ঠী সার্থপতি এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এরপর তিনি পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ ধন্য শ্রেষ্ঠী সার্থপতি এবং তার পুত্র বৃষদত্ত ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

দক্ষিণ রায় (খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী)

ব্যক্তিগত শৌর্য, বীর্য ও মহত্ত্বের গুণে যে সকল মানুষ দেবত্বে পরিণত হয়েছেন এবং সাহিত্য, লোককথা ও পালাগানে অমরত্ব লাভ করেছেন তাদের মধ্যে দক্ষিণ রায় অন্যতম। দক্ষিণ রায় ঐতিহাসিক পুরুষ। দক্ষিণবঙ্গের নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির কৃষিজীবী, জলজীবী ও জঙ্গলজীবী মানুষের কাছে তিনি আঠারো ভাটির দেশের অধিপতিরূপে পূজিত। কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপ, হুগলী নদী থেকে রায়মঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে লোক বিশ্বাসে দেবতা রূপে পূজিত হন তিনি। গবেষক ধূর্জটি নস্কর লিখেছেন, ত্রয়োদশ শতকে পুণ্ড্র, রাঢ়, বঙ্গদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে যারা স্বধর্ম রক্ষায় যুদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে দক্ষিণ রায় ছিলেন সর্বপ্রধান। তাঁর নিবাস ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের শেষ প্রান্তে খাড়িমণ্ডলের খাড়ি গ্রামে। খাড়ি গ্রামটি বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের রায়দিঘি থানার অন্তর্গত। ত্রয়োদশ শতকে বহিরাগত ইসলাম ধর্মযোদ্ধা বড় খাঁ গাজীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের এক দীর্ঘকালীন যুদ্ধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষে মৈত্রী স্থাপন হয়েছিল। বর্তমানে সুন্দরবনের লোক সমাজে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে দক্ষিণরায়, বড় খাঁ গাজী, বনবিবি পূজিত হন। লোকায়ত হিন্দু ও মুসলমান সমাজে এই সমন্বয় উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'দক্ষিণ রায়ের কাহিনী'তে লিখেছেন, বঙ্গে পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে পীর গাজীরা সশস্ত্র ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই কালে দক্ষিণ রায় স্বধর্ম রক্ষায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তিনি এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় দেবত্বে পরিণত হয়েছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর '২৪ পরগণা ঃ হাজার বর্ষ পূর্বে' আলোচনায় এই বিষয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, দক্ষিণ রায় একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন। গাঙ্গেয় সমভূমিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূর্বে পৌণ্ড্রজনসমাজ মূলত বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ছিল। সুতরাং দক্ষিণ রায় যে একজন ঐতিহাসিক চরিত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সপ্তদশ শতকের কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামের কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যে (১৬৭৯-৮০) দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে এই দুই ঐতিহাসিক চরিত্রের মানবিক দিক সুস্পষ্ট। আবার যুদ্ধের প্রাক্কালে পরস্পরবিরোধী আস্ফালন ও জাত ধর্ম

নিয়ে কটূক্তির মধ্য দিয়ে অনেক ঐতিহাসিক সত্যতা উঠে এসেছে। কৃষ্ণরাম দাস বড় খাঁ গাজীর সংলাপে লিখেছেন ঃ

ভালো আগে করো তোম জতেক কারণে।
ভেজতাঁহো জমকু হুজুরি চলনে।।
শুনিয়া হারামজাদ মহলিয়া ফোদ।

এখানে পংক্তিভুক্ত 'ফোদ' শব্দটি সম্পর্কে পুঁথি বিশারদ গবেষক অক্ষয়কুমার কয়াল লিখেছেন, কৃষ্ণরাম দাসের মূল পুঁথির লিপিকারগণের অনবধানবশতায় মূল 'পোদ' শব্দের পরিবর্তে 'ফোদ' শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দক্ষিণ রায় আদি মধ্যযুগের এক ঐতিহাসিক পৌণ্ড্র ব্যক্তিত্ব।

দেওয়ান রামজীবন খাঁ (১৩৬৫-১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দ)

মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বকালে পৌণ্ড্র জাতির অনেকে মুসলমান নবাবদের দরবারে উচ্চ রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ান রামজীবন খাঁর পূর্বপুরুষগণ মুসলমান নবাবদের অধীন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন এবং তাঁরা খাঁ উপাধি পান। রামজীবন খাঁ ২৪ পরগণা জেলার ধাড়া নগরের শাসক হরিহর রায়ের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ পোদ। দেওয়ান রামজীবন খাঁ আমাদের কাছে অজ্ঞাতই ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ মহাত্মা রাইচরণ সরদার ২৪ পরগণা জেলার ভাঙড় খানার মুলীমুকুন্দপুর গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামের প্রান্তে খাঁয়ের মায়ের দিঘি নামে পরিচিত বিশাল দিঘিটির পাড়ে গিয়ে তিনি দাঁড়ান। অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পারেন, মধ্যযুগে এই অঞ্চলে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। দেওয়ান রামজীবন খাঁ প্রথম দিকে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজা হরিহর রায়ের ব্যবস্থাপনায় দেওয়ান রামজীবন খাঁ তাঁর মায়ের নামে যে দিঘি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন, সেই প্রতিষ্ঠা যজ্ঞে রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করেন। রাইচরণবাবু স্থানীয় কালিকাপুর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি ননীগোপাল মণ্ডল মহাশয়ের বাসভবনে রক্ষিত একটি প্রাচীন লিপি পাঠ করে জানতে পারেন ৮১২ বঙ্গাব্দে ২রা বৈশাখ রামজীবন খাঁ মায়ের নামে এই দিঘি প্রতিষ্ঠা করেন। রামজীবন খাঁর ব্যবস্থাপনায় সর্বপ্রথম বৌদ্ধ পোদ সমাজে বৈদিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত হয়। নিম্নবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক ধর্ম সংস্কৃতির মিলনসূত্র রচনায় পথিকৃত ছিলেন দেওয়ান রামজীবন খাঁ।

ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁ লশকর (১৪৫০-১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ)

দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম বন্দর হিসাবে মধ্যযুগে ছত্রভোগের খ্যাতি ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বড়াশী গ্রামই প্রাচীন ছত্রভোগ। এর পাশ দিয়ে এক সময় আদি গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কনচণ্ডী, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি মধ্যযুগে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে ছত্রভোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছত্রভোগের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণবঙ্গ পথে নীলাচল যাত্রাকালে গঙ্গার তীর ধরে ছত্রভোগে এসে পৌঁছান। ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ শিব মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁর। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব রামচন্দ্র খাঁর পরিচয় জানতে চাইলে, রামচন্দ্র খাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি এই দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি।

'তবে শেষে সর্বলোক লাগিলা কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে।।'

শ্রীচৈতন্যদেব রামচন্দ্র খাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁকে নীলাচলে যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য অনুরোধ করেন।

'প্রভু বলে,—তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচল—আমি যাই কেমতে সকাল।।'

রামচন্দ্র খাঁ তাঁকে নৌকাযোগে মেদিনীপুর জেলায় পৌঁছে দেন। তখন মেদিনীপুর জেলা উড়িষ্যার একটি সীমান্ত জেলা ছিল। এই সময় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে বাংলার নবাব হুসেন শাহের রেষারেষি চলছিল। নবাবের আদেশে সীমান্তের জলপথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারত না। অপরিচিত ব্যক্তি দেখলেই 'জাণ্ড' অর্থাৎ গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করার নির্দেশ ছিল সুলতানের। দক্ষিণ অঞ্চলের এই গুরু দায়িত্বের ভার ন্যস্ত ছিল রামচন্দ্র খাঁ লশকরের উপর।

রামচন্দ্র খাঁ যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবতে' মহাপ্রভু এবং রামচন্দ্র খাঁর কথোপকথন প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'কোন দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু, শুন মন দিয়া।।
মুঞি সে নস্কর, এথাকাব মোর ভার।

নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার।
তথাপি ও যে-তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়।।'

চৈতন্যদেবের প্রভাবে রামচন্দ্র খাঁ লশকব বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে লিখেছেন,

মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে।।
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগ-বাসী।
সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ বিলাসী।।

ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর দক্ষিণ বঙ্গে পৌণ্ড্র সমাজ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য শতকম' গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

'গতির্য পুণ্ড্রানাং প্রকটিত নবদ্বীপমহিমা
ভবেন্নালং কুর্বন ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্।
পুন্যত্যঙ্গী কারাদ্ভবি পরমহংসাশ্রমপদম
ন দৈবশ্চৈতন্য কৃতিরতিতরাং নং কৃপয়তু।।'

ছত্রভোগ অঞ্চল আগে ছিল খাড়িমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান হিসাবে খাড়িমণ্ডলের পরিচয় বহন করছে বর্তমান খাড়ি গ্রামটি। গঙ্গা নদীর পূর্ব অববাহিকায় বিস্তীর্ণ পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির দক্ষিণ মণ্ডল হল এই 'খাড়িমণ্ডল'। রামচন্দ্র খাঁ লশকর খাঁ পদবী প্রাপ্ত হয়েছিলেন বাদশাহের কাছে থেকে এবং নৌচালনায় সুদক্ষ ছিলেন বলে তাঁর পূর্বপুরুষদের লশকর বলা হত। লশকর থেকেই এসেছে নস্কর পদবী। গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে উল্লেখ করেছেন, পাঠান আমলে দক্ষিণবঙ্গে স্থানীয় শাসকরা প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। রামচন্দ্র খাঁ লশকর এ রকমই একজন শাসনকর্তা ছিলেন। মধ্যযুগে ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁ লশকরের চৈতন্যদের সহিত সাক্ষাৎ ও বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। যেমন দেওয়ান রামজীবন খাঁর বৌদ্ধধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ইতিহাসেব উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই দুই ব্যক্তির ধর্ম থেকে ধর্মান্তরে উত্তরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পৌণ্ড্র সমাজের ধর্ম থেকে ধর্মান্তরে উত্তরণের ইতিহাস।'

চারণকবি দুর্লভ রায় হালদার (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ)

মধ্যযুগের চারণকবি দুর্লভ রায় হালদার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মন্দির বাজার থানার ইনাতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী। তিনি অসাধারণ কবিত্ব শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। গ্রীক কবি হোমারের মত তাঁকে চারণ কবিও বলা যায়। জনশ্রুতি আছে, কবি দুর্লভ রায় হালদারের পিতা করাতিমোহন হালদার একজন বিখ্যাত দারুশিল্পী ছিলেন। এক সময় এক নবাবের কাঠ খোদাইয়ের কাজে সামান্য ভুল করার অপরাধে তিনি বন্দী হন। রাজরোষে বন্দী পিতাকে মুক্ত করতে কিশোর দুর্লভ রায় হালদার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি জানতেন যে নবাব সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। একদিন নবাবের দরবারের বাইরে দাঁড়িয়ে কিশোর কবি দুর্লভ রায় সুললিত কণ্ঠে স্বরচিত চারণগীতি গাইতে শুরু করেন। তাঁর চারপাশে বহু মানুষের ভীড় জমে যায়। রসগ্রাহী নবাবের কানে সংবাদ পৌঁছাতে দেরী হল না। সঙ্গে সঙ্গে নবাব দরবারে ডাক পড়ল কিশোর কবি ও গায়কের। কিশোর গায়কের মধুর কণ্ঠে গান শুনে নবাব তার পিতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। নবাব কিশোর কবি দুর্লভ হালদারকে রায় উপাধি দিয়ে সভাকবি পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে ইনাতপুর মৌজা জায়গীরস্বরূপ উপহার দিয়েছিলেন। এছাড়া নবাবের কাছ থেকে কবি দুর্লভ রায় হালদার সম্মানসূচক সরকারি পাঞ্জা (Emblem) লাভ করেছিলেন।

কবি দুর্লভ রায় শুধু যে অসাধারণ গায়ক ও কবি ছিলেন তা নয় তিনি ভ্রমণপিপাসুও ছিলেন। তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। কাশীধাম থেকে অষ্টধাতুর রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ এনে ইনাতপুরে তাঁর বাসভবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চারশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত সেই মূর্তির পদতলে কবি দুর্লভ রায় হালদারের নাম খোদাই ছিল। ইনাতপুর গ্রামে এই যুগল বিগ্রহের সেবাপূজা উপলক্ষে এখানে আজও জন্মাষ্টমী, ঝুলন, দোল পূর্ণিমা প্রভৃতি উৎসব পালিত হয়। কবি দুর্লভ রায় হালদার প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মন্দিরের শীর্ষে কয়েকটি রৌপ্য কলস এঁর বংশধরগণ এখনও সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে পৌণ্ড্রজাতির আত্মজাগরণ আন্দোলন

বিশাল পুন্ড্রদেশ একদিন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। পৌণ্ড্রজাতি ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে হারিয়ে গেল। আর্যদের সঙ্গে সংঘাতে এই প্রাচীন জনজাতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজিত হয় নি, আর্যরা সামাজিক ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাদের রাক্ষস, দস্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছিল। ধীরে ধীরে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি পৌণ্ড্রদের নিজস্ব ধর্ম ও সাংস্কৃতিকে গ্রাস করে।

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব পৌণ্ড্রজাতির জনজীবনে এক নতুন অধ্যায় নিয়ে এসেছিল। বুদ্ধদেব দীর্ঘদিন পৌণ্ড্রদেশে অবস্থান করেছিলেন। পৌণ্ড্রজাতি বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য ও মৈত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশে যে দীর্ঘকাল বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চোয়াঙ প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকদের রচনায়। এই সকল চৈনিক পরিব্রাজকগণ বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার জন্য ভারতে এসেছিলেন। ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন চতুর্থ শতকে। য়ুয়ান চোয়াঙ ভারতে এসেছিলেন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে। তাঁদের প্রত্যেকেরই রচনায় পুন্ড্রদেশ ও জনজাতি সম্পর্কে এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তাছাড়া পুন্ড্রদেশের রাজধানী মহাস্থানগড়ের নিকটে সোমপুরী মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

একাদশ শতাব্দীতে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হিন্দু ধর্ম উত্থানের এক অধ্যায়। এই সময় ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় ছিলেন হিন্দু। দক্ষিণ ভারতের চোল রাজবংশ, মধ্যভারতের রাষ্ট্রকুট রাজবংশ এবং বাংলার সেন রাজবংশ এরা সকলেই ছিল হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। শঙ্করাচার্যের মত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচেষ্টায় এবং এই সকল হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর নিপীড়ন চালায় তার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। উৎপীড়িত বৌদ্ধরা অনেকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের হিন্দু সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত করে। বাংলাদেশে বল্লাল সেন 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তন করেন। এখানে আমরা দেখি যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই সমাজে কুলীন আর সবাই অন্ত্যজ শ্রেণীর। বিশেষ করে আর্যপূর্ব বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকেই অন্ত্যজ

শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই ঘৃণা ও অপমান সহ্য করতে হয় এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, সৌভ্রাতৃত্ব এদেশের অন্ত্যজ মানুষদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পৌণ্ড্রজাতির ইতিহাসের জনক মহেন্দ্রনাথ করণ লিখেছেন, মধ্যযুগে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। রিজলী সাহেব জানিয়েছেন যে ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রামের নব্বই শতাংশ মুসলমান নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতির।

দীর্ঘদিন মুসলমান রাজত্বে বাংলাদেশের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর বহুসংখ্যক মানুষ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তখন হিন্দুধর্ম ধীরে ধীরে এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। শ্রীচৈতন্যদেব এই সংকট থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য প্রচার করেন বৈষ্ণবধর্ম। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় পৌণ্ড্রসহ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। কারণ বৈষ্ণব ধর্ম সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে তারা অন্ত্যজই থেকে গিয়েছিল। কখনই হিন্দু সমাজে বৈষ্ণবগণ গ্রহণীয় ছিল না।

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু ধর্ম গ্রাস করে। হিন্দু ধর্মের মধ্যে তারা অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত হিসাবে পরিগণিত হয়। অবহেলা, ঘৃণা ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে তারা হিন্দুধর্মের মধ্যে বেঁচে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। বিদেশী ব্রিটিশ শক্তি মুসলমানদের পরাজিত করে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। বলা যেতে পারে ইংরাজদের ভারত শাসন করার বিষয়ে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণী সাহায্য করেছিল। ব্রাহ্মণ্য শ্রেণী ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং প্রশাসনিক কার্যে অংশ গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষা অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও কিছুটা প্রসারলাভ করে। ইংরাজপূর্বযুগে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে সুদীর্ঘকাল শিক্ষার অভাব, সেই সঙ্গে অবহেলা, শোষণ, ঘৃণা ও বঞ্চনার জন্য পৌণ্ড্র তথা অন্যান্য অব্রাহ্মণ জনগোষ্ঠী অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে শুরু হয় আত্মজাগরণ আন্দোলন। বিভিন্ন অন্ত্যজ শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষজনেরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হন এবং তাদের সমাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন।

এই আন্দোলনকে 'Self-respect Movement' বলা যেতে পারে। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে যারা তাদের জনসমাজকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর, রাজবংশী সম্প্রদায়ের পঞ্চানন বর্মা, হাড়ি সম্প্রদায়ের বলরাম হাড়ি, পৌণ্ড্র সমাজের মধ্যে বেণীমাধব দেব হালদার, শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ, রাইচরণ সরদার এবং মহেন্দ্রনাথ করণের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই আন্দোলনে পৌণ্ড্র সমাজের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ ছিলেন মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, ভবসিন্ধু লস্কর তারণকৃষ্ণ নস্কর, হেমচন্দ্র নস্কর, জয়কৃষ্ণ মণ্ডল প্রমুখ।

বেণীমাধব দেব হালদার

পণ্ডিত বেণীমাধব দেব হালদার অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানার রঙ্গিলাবাদ গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র হালদার ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। পাঁচ বছর বয়সে বেণীমাধব গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ হলে তিনি পার্শ্ববর্তী সেরপুর গ্রামের মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তারপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং নর্মাল ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন। কলকাতায় একটি টালির ঘরে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে বাস করেও তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে নর্মাল স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে কলকাতার একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর তিনি হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার মুককামান মাইনর স্কুলে হেড-পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতার পর তিনি তাঁর জন্মস্থান রঙ্গিলাবাদ গ্রামের বিদ্যালয়ে হেড-পণ্ডিতের পদ গ্রহণের জন্য চেষ্টা করেন। এই সংবাদে গ্রামের উচ্চবর্গীয় সমাজ একজন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ যাতে হেড-পণ্ডিতের পদ না পান তার জন্য প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করেন কিন্তু পণ্ডিত বেণীমাধবাবু তাঁর পাণ্ডিত্য ও মাধুর্যগুণে এবং সেই সময়কার ২৪ পরগণা জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টরের চেষ্টায় নিজ গ্রামের স্কুলে নিয়োগপত্র পান। শিক্ষকতা জীবনেব শেষ দুই বছর তিনি হাঁসুড়ি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শুধুমাত্র শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপনের যে কোন সার্থকতা নেই তা তিনি অল্প বয়সেই অনুধাবন করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে নিজ গ্রামের উচ্চবর্গীয় মানুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণার শিকার তিনি হয়েছিলেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিছক সম্প্রদায়গত কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের প্রতি ঘৃণা জন্মেছিল তার। স্বজাতিসহ অন্যান্য অপমানিত ও লাঞ্ছিত মানুষের গৌরব কথার সন্ধানে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য পাঠ করেন এবং পৌণ্ড্র সমাজের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী জনগণনার সময় তিনি পোদ তথা পৌণ্ড্র সমাজের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ইংরাজ সরকারের সহিত পত্রালাপ শুরু করেন এবং উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও উৎকল এই চারভাগে বিভক্ত প্রাচীন পুণ্ড্রজনগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরেন। এই সময় থেকেই বেণীমাধববাবু নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, মূলাজোড়, শ্রীরামপুর এবং সুদূর কাশীধামের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে পোদ, পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। সেই সঙ্গে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটান। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের (১৮৯১ খ্রীঃ) ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রঙ্গিলাবাদ গ্রামে নিজ বাসভবনে তিনি এক সামাজিক সভার আয়োজন করেন। এই সম্মেলন থেকেই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের নবজাগরণ শুরু হয়।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে বেণীমাধববাবু শ্রীমন্তবাবুর সহায়তায় হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে সর্বজাতির ইতিবৃত্ত 'জাতি-বিবেক' গ্রন্থটি তাঁর পিতা কৈলাশ চন্দ্রের নামে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তাঁকে অর্থ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন বেলেঘাটার জমিদার রামকৃষ্ণ নস্কর এবং কোটালপুর কুন্দরালির জমিদার জয়কৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থখানির উপর ভিত্তি করে বেণীমাধববাবু 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়', প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থ সংগ্রহে বেরিয়ে বেণীমাধববাবুর সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার আদালতের প্রখ্যাত আইনজীবী রাইচরণ সরদারের পরিচয় হয়। রাইচরণবাবু তখন সদ্য যুবক। বেণীমাধববাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাইচরণবাবু ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ) পৌষমাসে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি' স্থাপন করেন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে (১৩১৭বঙ্গাব্দ ১৮ বৈশাখ) ডায়মণ্ডহারবার থেকে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।

বেণীমাধববাবুর প্রচেষ্টায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনসমাজে এক নবজাগরণের সূচনা হয় এবং তাঁর পাশে শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ, রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ

করণ প্রমুখ পৌণ্ড্র ব্যক্তিত্ব এসে দাঁড়ান। তাঁদের এই আন্দোলনে অর্থ সাহায্য করেন বেলেঘাটার জমিদার রামকৃষ্ণ নস্কর, কোটালপুর কুন্দরালির জমিদার জয়কৃষ্ণ মণ্ডল এবং গোবিন্দপুরের জমিদার কালীচরণ কয়াল।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে ২১শে কার্ত্তিক পণ্ডিত বেণীমাধব দেব হালদারের জীবনাবসান হয়।

মনীষী শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলপী থানার অন্তর্গত দরিরত্নেশ্বরপুর গ্রামে এক সাধারণ কৃষিজীবী পরিবারে শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগবান লস্কর এবং মাতার নাম কুমারী দেবী। বাল্যকাল থেকেই শ্রীমন্তবাবু ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে তিনি লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকায় ঘাটেশ্বর গ্রামে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। হটুগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এফ. এ. পড়ার জন্য কলকাতায় আসেন।

রাইচরণবাবুর বিবরণ থেকে জানা যায় প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন সারস্বত সাধক ও সমাজ সংস্কারক। পণ্ডিত বেণীমাধব হালদারের 'জাতি-বিবেক' গ্রন্থটি রচনা কালে তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী। শ্রীমন্তবাবু সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য থেকে স্ব-সমাজের ইতিহাস রচনার জন্য গভীর অনুসন্ধান করেন এবং ১২৯৪ বঙ্গাব্দে 'জাতিচন্দ্রিকা' ও পরবর্তীকালে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়' নামে দু'টি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। অসাধারণ এই মনীষী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রথম রচনা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ইতিহাস গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁরই লেখনী ধরে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ পৌণ্ড্র সমাজের ইতিহাসের আকর গ্রন্থ, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ' প্রণয়ন করেন।

শুধুমাত্র নিজ জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান নয়, সমাজ জাগরণ আন্দোলনেও শ্রীমন্তবাবুর ভূমিকা ঐতিহাসিক। পণ্ডিত বেণীমাধব দেব হালদারের সঙ্গে একজোটে তিনি নিজ সমাজের আত্মজাগরণের জন্য লড়াই করেছিলেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে এই মনীষীর মৃত্যু হয়। তাঁর অকাল মৃত্যু সম্পর্কে গবেষক প্রভাসচন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন,

উড়িষ্যার এক পণ্ডিত সভায় নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য তিনি উপস্থিত পণ্ডিতদের ঈর্ষাভাজন হন এবং তাঁর মৃত্যু ঘটানো হয়। তাঁর মৃত্যুতে পৌণ্ড্র সমাজ এক মনীষীকে হারায়।

মহাত্মা রাইচরণ সরদার

মহাত্মা রাইচরণ সরদার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর প্রথম উচ্চ শিক্ষিত, সামাজিক ইতিহাস আবিষ্কারক ও লেখক, সমাজ সংগঠন এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানার বন-সুন্দরিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গদাধর সরদার। মাতার নাম লক্ষ্মীদেবী। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধামুয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন এবং কলিকাতা 'আর্য মিশন ইনষ্টিটিউশনে' এফ. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন। মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট।

কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি আলিপুর কালেক্টরেটে কুড়ি টাকায় মাসিক বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে আলিপুর কালেক্টরেটে কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করলে তিনিও যোগ দেন। ফলে চাকুরীটি হারান। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরা জেলার কাশীনগরে 'রাধাকিশোর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে' মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাইচরণবাবু চট্টগ্রাম জেলার রাউজান এলাকার 'রামগতি রামধন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন। কিন্তু এই চাকুরী ছেড়ে তিনি কলকাতায় আইন পড়ার জন্য ফিরে আসেন এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে মুনসেফ বারে যোগ দেন। ওকালতি করার সময় তিনি বিদীর্ণ হিন্দু সমাজের জাতপাতের ভেদাভেদ গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর সমাজের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাইচরণবাবু স্বজাতির উন্নতি ও আত্মজাগরণের জন্য 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি' স্থাপন করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে তিনি ডায়মণ্ডহারবার থেকে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। শিক্ষার উপর তিনি সর্বাগ্রে লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁর সমাজের ছাত্ররা যাতে কলকাতায় উচ্চ শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে মার্চ ১৪৪ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে 'আর্যপৌণ্ড্রক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম' নামে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা

করেন। এই ছাত্রাবাস স্থাপনে সাহায্য দানে এগিয়ে এসেছিলেন হাওড়া জেলার পালপাড়া গ্রাম নিবাসী দ্বারিকানাথ কয়াল এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ফলতা থানার মহাদেবপুর গ্রাম নিবাসী ক্ষীরধর মণ্ডল মহাশয়। শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি নিজ গ্রামে একটি বিদ্যালয় এবং একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১৭ সালের ২রা ডিসেম্বর জয়কৃষ্ণবাবুর বাসভবনে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতির' বৈঠক বসে। এই সম্মেলনে মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহেন্দ্রনাথ করণ ও ক্ষীরোদচন্দ্র দাস। সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে জয়কৃষ্ণ মণ্ডল ও রাইচরণ সরদার। সম্পাদক অনুকূলচন্দ্র দাস। সহ সম্পাদক ভবসিন্ধু নস্কর ও মহেন্দ্রনাথ করণ। কোষাধ্যক্ষ শ্রীধরচন্দ্র রায়।

১৯১৯ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারী গোবিন্দপুরের জমিদার কালীচরণ কয়াল মহাশয়ের বাসভবনে এক সামাজিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন রাইচরণবাবু। রাইচরণবাবুর অনুরোধে কালীচরণবাবু পরবর্তীকালে নিজ গ্রামে তিনশ বিঘা জমি ও ছাত্রাবাসসহ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রাইচরণ বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় পাঁচটি ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর অন্যতম কীর্ত্তি হল মন্দিরবাজারের জগদীশপুর গ্রামের সিতিকণ্ঠ ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়।

রাইচরণবাবুর প্রতিভার অন্যতম দিক ছিল তাঁর লেখনী শক্তি। তিনি সমাজের বহু বিষয় নিয়ে সমগ্র জীবন লিখে গেছেন। তাঁর রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমস্যা ২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্য পুণ্ড্র ৩। দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে ১০ই মাঘ (১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ) এই মহাপুরুষের জীবনাবসান হয়।

ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস মনস্ক ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা মহেন্দ্রনাথ করণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার অন্তর্গত ভাঙনমারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ক্ষেমানন্দ করণ ও মাতার নাম সুভদ্রা দেবী। মহেন্দ্রবাবু প্রকাশিত সচিত্র করণ কুল পঞ্জিকা (পারিবারিক) থেকে জানা যায় ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পূর্বপুরুষ মাংতারাম করণ দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগরদ্বীপ পরিত্যাগ করে মেদিনীপুরের হিজলী দ্বীপ এলাকায় কেওড়ামালতরফ বিশুয়ান পরগণায় বসবাস শুরু করেন।

মহেন্দ্রবাবুর পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল। শৈশবে গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠ শেষ করার পর তিনি 'খেজুরী মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে' ভর্তি হন এবং সেখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কাঁথি সরকারী উচ্চ ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন।

তখন স্বদেশী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। মহেন্দ্রবাবু স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে তাঁর আর পড়াশুনা হয়ে ওঠেনি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন। সেই সময় তিনি জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম কীর্তি হল 'খেজুরী সাধারণ পাঠাগার' স্থাপন ও জনকার 'আলেকজান্দ্রা দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর মহেন্দ্রনাথবাবু সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে চিন্তাশীল হয়ে ওঠেন এবং নিয়মিত তিনি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী এবং ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ডায়মণ্ডহারবার থেকে মহাত্মা রাইচরণ সরদার সম্পাদিত 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' প্রকাশিত হওয়ার পরই মহেন্দ্রবাবু নিজ সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর মহাত্মা রাইচরণ সরদার আহূত বারুইপুর থানার কোটালপুর কুন্দরালি গ্রামে জমিদার জয়কৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়ীতে যে সামাজিক সম্মেলন হয় সেখানে মহেন্দ্রবাবু উপস্থিত হন এবং 'সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতির' সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পরই তিনি তাঁর 'A Short History and Ethnology of the Cultivating Pod.' ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এছাড়া তাঁর লেখা ইতিহাস গ্রন্থ 'হিজলীর মসনদ-ই-আলা' ও 'খেজুরী বন্দর' তাঁকে ঐতিহাসিকের গৌরবময় আসন দিয়েছে। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে তিনি সহকর্মী মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের পরামর্শে পৌণ্ড্রসমাজের জাগরণের জন্য 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার অন্তর্গত তাজনগর গ্রামের জমিদার অন্নদাপ্রসাদ দেব তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে নব-জাগরণ আনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হল তাঁর রচিত 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কূল-প্রদীপ' গ্রন্থখানি। নিজ সমাজের ইতিহাস অনুসন্ধানে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই মনীষী অল্প বয়সেই কঠিন অসুখে পড়েন এবং মাত্র ৪১ বছর বয়সে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর ফলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনসমাজ এক শ্রেষ্ঠ মনীষীকে হারায়।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য পৌণ্ড্র ব্যক্তিত্ব

ঈশানচন্দ্র কামার

ঈশানচন্দ্র কামার ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এক কিংবদন্তী পরুষ। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কুলপি থানার অন্তর্গত কামারচক গ্রামে তাঁর জন্ম। সাধারণ পরিবারের সন্তান ঈশানচন্দ্র কামার প্রথম জীবনে সুন্দরবনে জঙ্গলের কাঠ কেটে লক্ষ্মীকান্তপুরের গোলের হাটে বিক্রী করতেন। এই সময় মুড়ি গঙ্গার পূর্বতীরে সুন্দরবন অঞ্চলের সাত নম্বর লাটের পাট্টাদার ছিলেন কলকাতার শোভাবাজারের কালীপদ মল্লিক এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার কল্যাণপুর নিবাসী শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিশ্রমী ঈশানচন্দ্র কামার কলকাতার শোভাবাজার মল্লিক পরিবারের কাছ থেকে দু'শ বিঘা জঙ্গল মহলের পাট্টা পেয়েছিলেন। ঈশানচন্দ্র কামার লোকজন নিয়ে এসে জঙ্গল কেটে বসত গড়ে তোলেন। সাত নম্বর লাটের পাট্টাদার শিবপ্রসাদবাবু এবং কালীপদবাবুর নামানুসারে গ্রামের নাম হয় শিবকালীনগর। পরবর্তীকালে ঈশানবাবু উক্ত অঞ্চলের পাঁচ হাজার বিঘা জমির জমিদারী লাভ করেন। আবাদি পত্তনের পর ঈশানবাবু তার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকান্তবাবুকে পৈত্রিক বাসস্থান কামারচকে রেখে কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে শিবকালীনগরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

জমিদারী স্থাপনের পরেই ঈশানবাবু সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে লিপ্ত হন। প্রচীনকাল থেকেই এই অঞ্চল ছিল দুর্গম, শ্বাপদসংকুল। পাশেই মুড়িগঙ্গা-হুগলী ভাগীরথীর বিস্তৃত মোহনার মাঝখানে সাগরদ্বীপ প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ চরম কষ্টের মধ্য দিয়ে এখানে তীর্থ যাত্রা করতে আসতেন। এই দুর্গম শ্বাপদসংকুল অঞ্চলে অনেক তীর্থযাত্রীর মৃত্যুও হত। ঈশানবাবু তীর্থযাত্রীদের জন্য তার শিবকালী নগরের বাড়িটিকে উন্মুক্ত করে দেন। শিবকালীনগর গ্রামের অবস্থান ছিল হুগলী ভাগীরথী মুড়িগঙ্গার পূর্বতীরে। এখান থেকেই নৌকাযোগে সাগরদ্বীপে যেতে হত। এক সময় কামারবাড়ি

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের এক উল্লেখযোগ্য চটি ছিল। হাজার হাজার পুণ্যার্থী শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌরী, বৈষ্ণব নির্বিশেষে সকলে ঈশানভবনে আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

ঈশানবাবু ছিলেন একজন সদাব্রতী ধার্মিক পুরুষ। তিনি ছিলেন সুন্দরবনের লৌকিক দেবী বিশালাক্ষী দেবীর ভক্ত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশালাক্ষী দেবীর এক বিশাল আটচালা মন্দির নির্মাণ করে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণমুখী মন্দিরের গর্ভগৃহে তিনফুট উচ্চতার পিতলের চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি বিরাজমান। দেবীর মুখমণ্ডল অষ্টধাতু নির্মিত। পদতলে শায়িত শিব। বিশালাক্ষ্মী দেবী বছরের বিভিন্ন সময় দুর্গা, কালী ও বাসন্তীরূপে পূজিত হন।

ঈশানবাবুর কনিষ্ঠপুত্র প্রাণকৃষ্ণবাবু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশালাক্ষী মন্দিরের পশ্চিমে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিবের নাম ঈশানেশ্বর। প্রাণকৃষ্ণবাবুও একজন একনিষ্ঠ সমাজসেবী ছিলেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে ঈশানবাবুর পূণ্য স্মৃতিতে শিবকালীনগর গ্রামে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈশান মেমোরিয়াল হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে হুগলী ভাগীরথীর করাল গ্রাসে কাকদ্বীপ থানার শিবকালীনগর গ্রামের ঐতিহাসিক কামারবাড়ি ভাঙনের মুখে পড়েছে। শিবমন্দির ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত হয়েছে কাকদ্বীপ ডায়মণ্ডহারবার সড়ক পথের কামারের হাট সংলগ্ন স্থানে। এই হাটও ঈশানবাবুর বংশধরেরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিবকালীনগরের ঐতিহাসিক কামারবাড়ী দক্ষিণ ২৪ পরগণার শতাধিক বছরের অন্যতম পুরাকীর্তি। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির এখন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই পুরাকীর্তি রক্ষায় সরকারী পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সঙ্গীতসাধক ভীমচন্দ্র সরদার (ভীম ওস্তাদ)

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনজাতির মধ্যে বহু চারণকবি, কবিয়াল, টপ্পাদার, তরজা শিল্পী, যাত্রা শিল্পী, সঙ্গীত সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন। নিম্নবঙ্গের প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও নিজ প্রতিভাবলে কালজয়ী হয়েছেন। এ রকমই একজন সঙ্গীত সাধক ছিলেন ভীম ওস্তাদ। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার ঘোষেরচক গ্রামে এক সাধারণ কৃষিজীবী পরিবারে সঙ্গীতসাধক ভীম ওস্তাদ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। প্রথাগত শিক্ষার

প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণযাত্রা, যাত্রাগান, শিবের গাজনগান, তরজা, কবিগান, টপ্পা প্রভৃতি গানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ভীম ওস্তাদ বাল্যকালেই বিভিন্ন গান গেয়ে গ্রামের মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। কিশোর বয়সে ভীম এক যাত্রাদলে ভিড়ে যান। অচিরেই সাধারণ জনসমাজে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর গান শোনার জন্য সাধারণ জনতার ভীড় উপচে পড়ত। ভীমচন্দ্রের সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে গ্রামের হিতৈষী ব্যক্তিরা তাঁকে ঝাউখালি গ্রামের বিশিষ্ট সঙ্গীতগুরু কেশব ঘোষ মহাশয়ের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার জন্য পাঠান। গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে অতি অল্প সময়েই ভীম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি সাধারণ সঙ্গীত চর্চাও তিনি গুরুর কাছে শিখেছিলেন। ধ্রুপদ গানে পারদর্শিতা অর্জনের পর তিনি তবলা শিক্ষার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিখ্যাত তবলচী ওস্তাদ গিরীশচন্দ্র হালদারের কাছে শিক্ষা নেন। নিরলস সাধনার মধ্য দিয়ে ভীম ওস্তাদ নিজেকে সঙ্গীত জগতের একজন সব্যসাচী শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভীম ওস্তাদ সমগ্র জীবন সঙ্গীত সাধনার মধ্য দিয়ে আপামর জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন। তিনি এক কিংবদন্তী শিল্পী। পরবর্তীকালে ভীম ওস্তাদের বহু ছাত্র সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে সুধন্য ওস্তাদ, শিরোমণি ওস্তাদ, অমূল্য মাল (বিশ্বাস), মাধুর্য হালদার, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক বিভূতি ময়রা প্রমুখ সঙ্গীতশিল্পীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই কিংবদন্তী শিল্পীর জীবনাবসান হয়।

পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি কাব্যসাগর

নিম্নবঙ্গে যারা শিক্ষা প্রসারের জন্য সারা জীবন আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মণিপুর বাঁশতলা গ্রামে এক কৃষিজীবী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ভজহরি মণি। মাতা রক্ষমণি দেবী। বিপিন বাবুর প্রপিতামহ রতনচন্দ্র প্রায় আড়াইশ বছর পূর্বে মন্দিরবাজার থানার নটুনি গ্রাম থেকে মণিপুর বাঁশতলা গ্রামে আবাদি জমির সন্ধানে চলে আসেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। প্রাচীন ছত্রভোগের বৈষ্ণবগুরু অন্ধমুনি গোস্বামী ছিলেন তাঁর গুরু। সাত্ত্বিক সাধকের ন্যায় জীবন

যাপন করতেন বলে স্থানীয় লোকেরা তাদের মুনি ঋষির মত শ্রদ্ধা করত। এভাবেই তাদের পদবী মণি পদবীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

শৈশবকালে বিপিনবাবুর পড়াশুনায় হাতে খড়ি হয় পার্শ্ববর্তী বটতলা গ্রামের তারকনাথ নস্কর মহাশয়ের বৈঠকখানার পাঠশালায়। তারপর তিনি ময়দা গ্রামের মধ্য বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। মধ্য বাংলা স্কুলে পাঠ শেষ করে বিপিনবাবু কলকাতায় নর্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে Vernacular Mastership Examination এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে Medium First Grade পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে প্রশংসাপত্র পান।

কর্মজীবনের প্রথমে বিপিনবাবু জয়নগর-মজিলপুরে জে. এম ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিছুদিন পর শিক্ষকতা ছেড়ে প্রাইমারী স্কুলের ইনস্‌পেকটিং পণ্ডিতের সরকারী পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী চাকুরী ভাল না লাগায় পুনরায় শিক্ষকতায় ফিরে আসেন এবং ময়দা মধ্যবাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯২০-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ বারাশত স্কুলে হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সমাজসেবী পণ্ডিত বিপিনবাবু শুধুমাত্র শিক্ষকতার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি। সুন্দরবনের অবহেলিত অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজ বাসস্থান মণিপুর বাঁশতলা গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। স্কুল স্থাপনের সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বিপিনবাবু স্কুল স্থাপনের সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে অর্থসাহায্যের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সরকারী চাকুরীর নিশ্চিন্ত জীবন ত্যাগ করে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তার স্বেচ্ছা কষ্ট, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি। শুধু এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয়, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী অনুদানে তিনি মণিপুর বাঁশতলা গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের বয়স্ক ছাত্ররা যষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। বিপিনবাবুর আরও একটি অবদান ছিল নিজ গ্রামে ডাকঘর প্রতিষ্ঠা। সেই সময় তেরশ টাকা সরকারের কাছে জমা দিয়ে এবং কঠোর পরিশ্রম করে তার গ্রামে ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ না হলে গ্রামের মানুষের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিপিনবাবু শিক্ষকতা, সমাজসেবা ও কাব্য সাহিত্যের সাধনার সঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলনেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাইচরণ সরদারের সঙ্গে বিপিনবিহারী মণি'র

সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। রাইচরণবাবুর পরামর্শে বিপিনবাবু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষদের উপবীত গ্রহণের জন্য নিজ গ্রামে এক উপনয়ন সভার আয়োজন করেছিলেন।

বিপিনবাবু ছিলেন একজন সার্থক পণ্ডিত কবি। আজীবন তিনি কাব্য সাধনা করে গেছেন। পণ্ডিত কবি বলেই তাঁর কাব্যে ছন্দ ও অলংকার পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কাব্যের মূল বিষয় ছিল প্রচলিত কাহিনী, কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্ধমুনি গোস্বামী মাহাত্ম্য, ময়দার মহাকালী, বুজরুকীনাথ মাহাত্ম্য (বদরিকানাথ), গঙ্গাস্নান বা চক্রতীর্থ মাহাত্ম্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কাহিনী, শ্রীশ্রী বিশালাক্ষীদেবীর শাঁখা পরা, হরিনাম সংকীর্তন পদাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসাধারণ কবিত্বশক্তির জন্যই তিনি কাব্যসাগর উপাধি পেয়েছিলেন। ১৩৪৭ সালের ১৮ই মাঘ (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) শুক্রবার অপরাহ্নে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি পরলোক গমন করেন।

আলোর পথিক গৌরমোহন মণ্ডল

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয় তফসিলী অধ্যুষিত অনগ্রসর এই অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে যিনি ছিলেন তাঁর নাম গৌরমোহন মণ্ডল। শিক্ষাব্রতী, দানশীল গৌরমোহনবাবুর জন্ম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত বীরেশ্বরপুর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে। তাঁর পিতার নাম হরিনাথ মণ্ডল, মাতা বিপদনাশিনী দেবী। হরিনাথবাবু যথেষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। গৌরমোহনবাবুর শিক্ষাদীক্ষা অধিক ছিল না। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে তিনি আর পুঁথিগত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হন নি। সেই যুগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বিশেষ ছিল না। পরিণত বয়সে গৌরমোহনবাবু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এবং তাঁর এলাকায় শিক্ষা প্রসারের জন্য জীবন সমর্পণ করেছিলেন। গৌরমোহনবাবু এবং ঘাটেশ্বর গ্রামের বিশ্বাস পরিবারের সহযোগিতায় স্থাপিত হয়েছিল ঘাটেশ্বর বিজয় কিষেণ বিদ্যামন্দির। এই উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণকল্পে গৌরমোহনবাবু ভূমি ও অর্থ দান করেছিলেন। গৌরমোহনবাবুর স্বপ্ন ছিল এই অঞ্চলে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সেই

স্বপ্ন রূপায়িত হওয়ার পূর্বেই ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। গৌরমোহনবাবুর কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেন তাঁর পুত্র শচীন মণ্ডল। শচীন মণ্ডল এবং বীরেশ্বপুর গ্রামের মণ্ডল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরেশ্বরপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়। আজ এই মহাবিদ্যালয় থেকে অনগ্রসর, তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বদেশীবাবু গৌরহরি বিশ্বাস

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে গৌরহরি বিশ্বাস এক স্মরণীয় নাম। ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনতা পাশ থেকে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সমগ্র জীবন তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। অগ্নিযুগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যে সকল বিপ্লবীদের নাম স্মরণীয় তাঁরা হলেন গৌরহরি বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্র বৈদ্য, শহীদ গঙ্গাহরি দাস, অমিয়ভূষণ মণ্ডল, দিবাকর হালদার, চিত্ত নস্কর, বসন্ত দাস, কংসারি হালদার, ললিতমোহন দেবশর্মা প্রমুখ।

গৌরহরি বিশ্বাস ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাজারহাট থানার পাথরঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ পাঁচুগোপাল বিশ্বাস ছিলেন ধর্মপ্রাণ জমিদার। পিতা শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন সৎ, উদার এবং স্বাধীনচেতা মানুষ। স্ত্রী কুন্তিদেবী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী অমিয়ভূষণ মণ্ডলের ভগিনী। ছাত্রাবস্থায় গৌরহরিবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, আইন অমান্য, চৌকীদারী কর বন্ধ, মাদকদ্রব্য বর্জন প্রভৃতি আন্দোলনের পুরোভাগে এক সময় তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক মহিষবাথান লবণ আইন আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা। মহিষবাথান আন্দোলনে লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক, সতীশ দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল সেন, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় গৌরহরিবাবু কারাবরণ করেন। সেই সময় ২৪ পরগণা জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। গৌরহরিবাবু আহ্বানে হাজার হাজার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পুরুষ ও নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। পুলিশী নির্যাতন ও কারাবরণ তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী স্বর্ণময়ী মণ্ডল, অষ্টমী ঢালী, মোক্ষদা নস্কর প্রমুখ কারাবরণ করেছিলেন। গৌরবাবুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় জীবন মণ্ডল, বীরুপদ মণ্ডল প্রমুখ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গণসংগীত শিল্পী পথে পথে স্বদেশী গান গেয়ে সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিপ্লবী মনীন্দ্রনাথ

মণ্ডল, হরহরি দেব প্রমুখ মহিষবাথান লবণ আইন আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এই সময় গৌরহরিবাবু মেদিনীপুর জেলার নেতৃবৃন্দ সতীশ সামন্ত ও অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। গৌরহরিবাবুর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে দমদম, আলিপুর ও হিজলী জেলে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি গৌরহরিবাবু বিধবা বিবাহ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জাতপাত বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাথরঘাটা কালীমন্দিরে ব্রাহ্মণ পূজারীরা নিম্নবর্গীয় মানুষদের প্রবেশে বাধা দিতেন। গৌরহরিবাবু সেই বিধি-নিষেধ ভেঙে সমস্ত নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রবেশের অনুমতি দেন। তার বিধবা বিবাহ ও জাতপাত বিরোধী আন্দোলন এক সময় চারণগীতি হয়ে লোকমুখে ফিরত। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য তিনি নিজে পাথরঘাটা জে. ভি. স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আর এক কৃতি পুরুষ খুলনা জেলা নিবাসী পতিরাম রায় পাথরঘাটায় এসে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ব্রতী হয়েছিলেন।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান হয়।

জনসেবক অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর

জনসেবক অনুকূলচন্দ্র দাস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গড়িয়া এলাকার তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত নস্কর পরিবারে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্রবাবু ছিলেন ধর্মপ্রাণ, সমাজহিতৈষী পুরুষ। উদার পিতার কর্মপ্রেরণা অনুকূলবাবুর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। শৈশব থেকেই অনুকূলবাবু ছিলেন মেধাবী। কলকাতার রিপন স্কুল থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। এরপর এই কলেজ থেকে বি. এ. এবং বি. এল. পাশ করার পর কলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন।

অনুকূলবাবুর কর্মজীবন ছিল বহুধা বিস্তৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেই তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হয়ে জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। অনুকূলবাবু দেশসেবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলার নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের অশিক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য

আত্মনিয়োগ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের অশিক্ষা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ না হলে ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থে মুক্তিলাভ করতে পারবে না। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর কোটালপুর-কুন্দরালির জমিদার জয়কৃষ্ণ মণ্ডলের বাসভবনে রাইচরণ সরদার যে সামাজিক সভার আয়োজন করেছিলেন সেই সভায় অনুকূলবাবু যোগদান করেছিলেন। উক্ত সভায় গঠিত 'সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণবঙ্গে নিম্নবর্গীয় জনসমাজ বিশেষ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনসমাজে শিক্ষাপ্রসারে অনুকূলবাবু বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

শুধুমাত্র নিম্নবর্গীয় জনসমাজে শিক্ষা প্রসার নয়, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তার অবদান স্মরণীয়। বেণীমাধব দেব হালদার, শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ, রাইচরণ সরদার ও মহেন্দ্র করণের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনায় অনুকূলবাবুর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনে ভারতবর্ষে প্রভিন্সিয়াল অটোনমি বিষয়টি স্বীকৃত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুকূলবাবু নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং ডায়মণ্ডহারবার, বারাসাত ও বারাকপুর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন। উচ্চশিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভায় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

অনুকূলচন্দ্র দাস দেশসেবা ও সমাজের উন্নতির স্বার্থে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সমগ্র জীবন লড়াই করে গেছেন। কিন্তু তার রাজনৈতিক জীবনের শেষ দিনগুলি তার কাছে সুখের ছিল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারতভাগকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। অনুকূলবাবু হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনে শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যখন ভারতকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়, অনুকূলবাবু তার তীব্র বিরোধিতা করেন। এইজন্য তাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চক্রান্তের শিকার তিনি হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দ থেকে নিম্নবর্গীয় জনসমাজের প্রতিনিধিদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল তা দেখে অনুকূলবাবু মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু অন্ত্যজ ভারতবর্ষ ও নিম্নবর্গীয় জনসমাজের মধ্যে তিনি যে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা শিক্ষণীয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর তার জীবনাবসান হয়।

শিক্ষাদরদী ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার

যে সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজসেবী অবহেলিত জনসমাজের শিক্ষা প্রসারে জীবন সমর্পণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার অগ্রগণ্য। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণনগর গ্রামে এক কৃষিজীবী পরিবারে ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবীনচন্দ্র হালদার। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি কলকাতার ন্যাশন্যাল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা শহরে প্র্যাকটিস শুরু করেন। ব্যক্তি জীবনে ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও মেধাবী পুরুষ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কলকাতার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। শিয়ালদহের নিকটস্থ হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) হালদার ফার্মেসী নামে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি গরীব ও দুঃস্থদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন। সাধারণ দরিদ্র মানুষদের তিনি অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে অথবা অনেক ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করতেন।

অনেক অর্থ, যশ ও খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও ধ্রুবচাঁদ বাবু ছিলেন সংযমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। চিকিৎসার মাধ্যমে মানবসেবা ছাড়াও বৃহত্তর রাজনীতি ও সমাজসেবায় তিনি জীবন সমর্পণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং আজীবন কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘদিন তিনি ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

ধ্রুবচাঁদবাবুর মহাত্মা গান্ধী রোডের হালদার ফার্মেসী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র ও যুবকদের আশ্রয়স্থল ছিল। কলকাতায় সাধারণ ছাত্রদের থাকার অসুবিধার কথা ভেবে তিনি একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নপুকুরিয়া গ্রামের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সুধাংশুশেখর গায়েন মহাশয় তাঁকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেন। সুধাংশুবাবু ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদারকে বলেন, যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয় তাহলে কলকাতায় ছাত্রাবাস নির্মাণ অপেক্ষা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় একটি কলেজ স্থাপন অধিকতর

গ্রহণযোগ্য হবে। একই অভিমত প্রকাশ করেন ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদারের বন্ধু জয়নগর থানার অন্তর্গত গাববেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাশীনাথ মণ্ডল মহাশয়। ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার বন্ধুদের এই অভিমত গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাশতে একটি কলেজ নির্মাণে সচেষ্ট হন। স্থানীয় সর্বস্তরের মানুষ ভূমিদান ও আর্থিক সহায়তায় শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞে এগিয়ে আসেন। ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার এই কলেজের জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ বারাশতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের জন্য তাঁরই নামে কলেজটি নামকরণ করা হয়েছে ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান শিক্ষাদরদীর জীবনাবসান হয়।

শিক্ষাব্রতী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর

ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৫ বঙ্গাব্দ ১৮ শ্রাবণ) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত জগদীশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নবীনচন্দ্র নস্কর, মাতা যজ্ঞেশ্বরী দেবী। ভূষণবাবু ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, গবেষক ও সাহিত্যিক। পারিবারিক দিক থেকে তিনি ছিলেন ষোড়শ শতকের ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁর উত্তরপুরুষ।

ছাত্রজীবন থেকে ভূষণচন্দ্র ছিলেন মেধাবী। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তিনি আই. এস. সি. অধ্যয়নের জন্য কলকাতায় আসেন। মহাত্মা রাইচরণ সরদার প্রতিষ্ঠিত ১৪৪ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে 'আর্যপৌণ্ড্রক ব্রহ্মচর্য আশ্রম' ছাত্রাবাসে তিনি ছিলেন। আই. এস. সি. পাশ করার পর বি. এস. সি. পড়াশুনাকালীন পরীক্ষা বয়কট করে ভূষণচন্দ্রবাবু স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় ব্রতী হন।

চিকিৎসার পাশাপাশি অবহেলিত জনসমাজের শিক্ষা প্রসারে ভূষণবাবু আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মন্দিরবাজার থানার জগদীশপুর গ্রামে সিতিকণ্ঠ ইনস্টিটিউশনের উন্নতি সাধিত হয়। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা

সিতিকণ্ঠ নস্কর মহাশয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। ভূষণবাবু অবহেলিত মানুষের চিকিৎসার পাশাপাশি এই উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করে গেছেন। আগেকার দিনে স্কুল চালানোব পক্ষে সরকারী সাহায্য ছিল অপ্রতুল। ভূষণবাবু বিদ্যালয়ের চরম আর্থিক দুরাবস্থার সম্মুখীন হয়ে তার মায়ের মূল্যবান অলংকার পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন দেবতুল্য।

ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর ছিলেন একজন যথার্থ সমাজ সংস্কারক। রাইচরণ সরদার ও মহেন্দ্র করণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি পেয়েছিলেন। পৌণ্ড্র সমাজের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় তার অবদান স্মরণীয়। সাহিত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যযুগ, বন্দেমাতরম্, সমাজদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে গেছেন। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, আঞ্চলিক ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সমাজ কথা, দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্য মেলা স্মরণিকা, পৌণ্ড্রদর্পণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম প্রচার লীলাস্থলী ছত্রভোগ ও রামচন্দ্র খান, ছত্রভোগ অঞ্চলের পারমার্থিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র, কর্মবীর সিতিকণ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও সংস্কৃতির টানে তিনি তাঁর হাউড়ীহাট বাসভবনে বহুবার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চক্রের আয়োজন করেছেন।

আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় ভূষণবাবু ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁর প্রপিতামহ ভৈরব নস্করও ছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধক। অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁরা উদার ছিলেন। তাঁদের প্রাচীন শিবমন্দির ১০৪০ বঙ্গাব্দে (১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ অক্টোবর এই মহাপ্রাণ পরলোক গমন করেন।

পতিরাম রায়

পাতিরাম রায় খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থানার কাঁঠালতলা গ্রামে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই পতিরাম রায় মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি কলকাতায় নর্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং নর্মাল স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায়

কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি বসিরহাট মহকুমার সফিরাবাদ স্কুলে হেড পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। স্বাধীনতাকামী পতিরাম রায় দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে হেড পণ্ডিতের পদে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেন। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি এ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্র খুলে বহু মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পতিরাম রায় ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির সভাপতি।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পতিরাম রায় চব্বিশ পরগণার বসিরহাট কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাতিখালি গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর রাজেন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম হয়। পিতার নাম পবনচন্দ্র সরকার ও মাতার নাম শান্তা দেবী। রাজেন্দ্রনাথ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের পাঠশালায়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে আই. এ. শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই সময় থেকেই রাজেন্দ্রনাথ সমাজসেবায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং মহেন্দ্রনাথ করণ প্রমুখ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশ স্বাধীনতা অন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিল। দৌলতপুর কলেজের ছাত্ররাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তারা কলেজ ত্যাগ করে কংগ্রেসের নির্দেশে মুষ্টিভিক্ষার জন্য পথে নেমে পড়ে। রাজেন্দ্রনাথও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিনের মুষ্টিভিক্ষার পর সন্ধ্যায় সত্যাশ্রমে ফিরলে সত্যাশ্রমের অধ্যক্ষ কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সকলের ন্যায় রাজেন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে রাজেন্দ্রনাথ নিম্নবর্গীয় তখন তিনি তাকে বললেন, 'তাইতো, তোমার খাবার ব্যবস্থা

কোথায় করা যায়!' রাজেন্দ্রনাথ বিপ্লববাদী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এইরূপ আচরণে ব্যথিত হন। কর্মাধ্যক্ষের এই অসম আচরণের প্রতিবাদে আন্দোলন পরিত্যাগ করে রাজেন্দ্রনাথ পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন।

স্ব জাতির মঙ্গলের জন্য রাজেন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা জীবনের প্রথম থেকেই ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ 'খুলনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র সংঘ' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনিই ছিলেন এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক। এই ছাত্র সংঘ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে শিক্ষা, সংহতি, জনসেবা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ সরকার আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং কলকাতায় সিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লোকনাথ রায় মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা মেনকা দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্র আবদ্ধ হন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেন। তিনি ছিলেন খুলনা জেলায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও এম. এ. (ভারতীয় মাতৃভাষা) শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। একই সঙ্গে স্ব-জাতির উন্নয়নে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুলে বঙ্গীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন শেষে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র-যুবক পরিষদ গঠিত হয়। রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন এই পরিষদের সভাপতি।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ একই সঙ্গে আইন ও এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। কিছুদিনের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ খুলনা জজকোর্টে ওকালতি পেশায় যোগদান করেন। এখানেও তিনি বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে ওকালতিতে প্রসার ও প্রতিপত্তিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

রাজনীতিতে তাঁর প্রথম থেকে ঝোঁক ছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ খুলনা লোকাল বোর্ডের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পঁচিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনের পূর্বে সরকার ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু সমাজের পশ্চাদপদ জাতিসমূহের এক তালিকা প্রস্তুত করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে যে এই সমস্ত জাতির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখবার জন্য এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই তালিকা প্রস্তুত হল। যে সমস্ত জাতি উক্ত তালিকাভুক্ত আছে তাদের আপত্তি থাকলে আপত্তিকারী জাতির নাম ঐ

তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি ঐ তালিকাভুক্ত হয়েছিল (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী তারিখের ১২২নং পি, আর বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য)। সেই সময় রাইচরণ সরদার খুলনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা সাউথ সুবারবন স্কুলে তার সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে পৌণ্ড্র জাতির নাম উক্ত তালিকা থেকে বাদ-দেওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এর অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয়। খুলনা যশোহরের কোন প্রতিনিধি ঐ সভায় ছিলেন না। রাইচরণ সরদার রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একখানি পত্র লিখেছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দেখান যে দেশের ও সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে 'ক্ষত্রিয়' জাত্যাভিমান নিয়ে বর্তমানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে এই জাতিকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত-করে রাখলে আমরা পশ্চাতে পড়ে থাকব। তিনি তাঁর এই বক্তব্য খুলনা ও যশোহরের সমস্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতাদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে উক্ত নেতৃবর্গের অভিমত অনুসারে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় পৌণ্ড্র জাতির নাম তালিকাভুক্ত করবার জন্য একটি আবেদনপত্র সরকারের নিকট পাঠানো হয়। এর ফলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতির পক্ষ থেকে প্রেরিত পূর্বোক্ত আবেদন পত্র সরকার কর্তৃক বিবেচিত হয় নি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২/৫/১৯৩৫) টালিগঞ্জে ভবসিন্ধু লস্কর মহাশয়ের বাড়িতে বঙ্গীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় প্রধান আলোচনা বিষয় ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির তপশীল তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত কিনা। রাইচরণ সরদার তার যুক্তির স্বপক্ষে বলেন যে তপশীল তালিকাভুক্ত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মর্যাদা হানি হবে। হেমচন্দ্র নস্কর রাইচরণবাবুকে সমর্থন করেন। কিন্তু খুলনা যশোহরের প্রতিনিধিরা যে কোন মূল্যে এই জাতির উন্নতির স্বপক্ষে যুক্তি দেখান। ফলে দুই পক্ষে এক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। রাজেনবাবু এই মনোমলিন্য এড়াবার জন্য উক্ত সভার শেষে রাইচরণবাবুর মত সমর্থন করেন। কিন্তু খুলনায় ফিরে পুনরায় সরকারের নিকট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নাম তপশীল তালিকাভুক্ত করবার জন্য আবেদন পত্র পাঠান। অবশ্য উক্ত চিঠিতে তাঁর স্বাক্ষর ছিল না। উক্ত চিঠিতে স্বাক্ষর ছিল সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের (তারিখ ১৬/৫/১৯৩৫)। রিফর্মস্ কমিশনার আর. এন. গিলক্রাইষ্ট, আই, সি, এস ২৩/৫/১৯৩৫ তারিখে

৬৩৮ নং এ, ডি, আর মেমো দ্বারা উক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন। এরপর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নাম তপশীল তালিকাভুক্ত থেকে বাদ যায়নি।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির উন্নয়ন ও আত্ম-চেতনার জন্য রাজেন্দ্রনাথ সরদার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা থেকে 'সঙ্ঘ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটিই খুলনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রথম পত্রিকা। রাজেন্দ্রনাথ সরদার তাঁর সমাজের উন্নয়নের জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নিজ গ্রামের পাঠশালা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। নিজ গ্রামের উন্নতির জন্য তিনি বাতিখালি পল্লীমঙ্গল সমিতি গঠন করেছিলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ বিভাগ হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। দেশবিভাগ রাজেন্দ্রনাথ সরকার মেনে নিতে পারেন নি। দেশবিভাগ অনিবার্য জেনে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রধান খুলনা জেলা যাতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার জন্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন।

দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন এবং খুলনা সংখ্যালঘু বোর্ডে সরকার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি এবং স্পেশাল ঋণ সালিশি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। এই সময় তিনি দৌলতপুর কলেজের সদস্য ও খুলনা জেলা পরিদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে ব্যবস্থাপক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্রনাথ সরকার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে পাইকগাছা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। এদিকে দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ পাকিস্তানে ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ববঙ্গের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। এই অবস্থায় রাজেন্দ্রনাথ সরকার স্বজাতির উন্নয়ন ও রক্ষায় জীবন সমর্পণ করেছিলেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে হজরত মহম্মদের চুল চুরি যাওয়াকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী রাজেন্দ্রনাথবাবুর বাড়ী আক্রান্ত হয়। তাঁর প্রতিবেশী এক মুসলমান বন্ধুর সহায়তায় তিনি এবং তাঁর পরিবার প্রাণে রক্ষা পান। এই ঘটনায় তিনি ভারতে চলে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তিনি ভারতে চলে আসেন। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মৃত্যু হয়।

সমাজসেবী ডাক্তার রাধানাথ সরকার

সমাজসেবী রাধানাথ সরকার ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে (২১শে কার্ত্তিক ১৩১১ বঙ্গাব্দ) মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রাহ্মণটুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহানন্দ সরকার। মাতার নাম কাত্যায়নী। তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট রেশম ব্যবসায়ী। মাত্র আট মাস বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ এবং এক বছর বয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়।

শৈশবকাল থেকেই রাধানাথ সরকার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার National Medical College থেকে L.M.F. পাশ করেন। ডাক্তার রাধানাথ সরকার State Medical Faculty-র পরীক্ষায় ফিজিওলজিতে প্রথম এবং মেডিসিন-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এরপর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে স্বাধীনভাবে চিকিৎসাকার্য শুরু করেন। তিন বছর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা কার্যের পর তিনি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দফরপুর চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীতে মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ আঠার বছর এখানে কাজ করার পর তিনি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে চিকিৎসাকার্যে রত হন।

রাধানাথ সরকার শুধুমাত্র বিশিষ্ট ডাক্তার ছিলেন না। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। আনন্দবাজার, পরিচয়, জঙ্গীপুর সংবাদ ও গঙ্গারিডি পত্রিকায় তিনি সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। জঙ্গীপুর সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রখ্যাত দাদা ঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) মহাশয়ের তিনি বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। দাদাঠাকুরের আবাল্য বন্ধু কিরীটিভূষণ দাস তাঁর দীক্ষাগুরু। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথবাবু কিরটিভূষণবাবুর কন্যা রাধারানীকে বিবাহ করেন। রাধানাথ সরকার সমাজতত্ত্বের একজন বিশিষ্ট গবেষক ছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট রচনা 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অতীত ইতিহাস পুণ্ড্রবর্ধন ও পৌণ্ড্র বাসুদেব' নাটিকা। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সরদার

যে সকল মনীষী দক্ষিণবঙ্গে নিম্নবর্গীয় জনসমাজে শিক্ষা প্রসারে সমগ্র জীবন সমর্পণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সরদার বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ১৩১১ বঙ্গাব্দে ১২ই ফাল্গুন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ট্যাংরাখালি গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারে তার জন্ম। তাঁর পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ সবদার। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে তিনি ক্যানিং ডেভিড হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে কালিকাপুর হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। নবম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর তিনি লেখাপড়া করেন নি।

পড়াশুনা শেষ করে তিনি পিতার জমি-জায়গা এবং মাছের ভেড়ি দেখাশুনার কাজে মনোনিবেশ করেন। কয়েক বছর পরে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। তার পত্নীর নাম সুশীলা দেবী। বঙ্কিমবাবু ছিলেন পরহিতকারী, দানশীল ও শিক্ষানুরাগী। তৎকালে নিম্নবর্গীয় সমাজে শিক্ষার বিশেষ প্রসার ছিল না। সেই সময় সুন্দরবন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার জন্য কোন কলেজ ছিল না। বঙ্কিমবাবু অনুভব করেছিলেন সুন্দরবনের নিম্নবর্গীয় দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষে কলকাতায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। তিনি আরও উপলব্ধি করেছিলেন, নিম্নবর্গীয় জনসমাজের উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষার প্রয়োজন। বঙ্কিমবাবু সুন্দরবন অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় জনসমাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য এই অঞ্চলে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য গভীর চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ট্যাংরাখালি পরশুরাম-যামিনী-প্রাণ উচ্চবিদ্যালয়। এরপরই তিনি এই অঞ্চলে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমবাবুকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেচিলেন তার কাকাবাবু পশুপতি সরদার মহাশয়। পশুপতিবাবুও শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং সুন্দরবন অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় জনসমাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য সমগ্র জীবন সচেষ্ট ছিলেন। তিনি গোলডহরা নলিয়াখালি হরিনারায়ণ বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমবাবু পশুপতি সরদার, স্থানীয় মহতাব আলী লস্কর এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরদার পরিবারের মানুষজন সকলেই অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করে বঙ্কিমবাবুকে সাহায্য করেছিলেন। পশুপতি সরদার মহাশয় কলেজের ব্যয় ভার গ্রহণের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে তার ট্যাংরাখালি গ্রামে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাকে সাহায্য করেছিলেন বসিরহাট মহকুমার খোলাপোতা গ্রামের চন্দ্রকান্ত সরকার, ফরিদপুরের চন্দ্রকান্ত বসু, পবিত্র দাশগুপ্ত (কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল) এবং সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। সমগ্র জীবন তিনি কলেজের বিভিন্ন বিল্ডিং এবং বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিল্ডিং নির্মাণের অর্থের জন্য তিনি তাব সর্বস্ব দিয়েছিলেন। পশুপতিবাবুব কনিষ্ঠ পুত্র সুবলসখা সরদার মহাশয়ের কাছে শুনেছি সাধারণ একটি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়েই তিনি সমগ্র জীবন কাটিয়েছিলেন। ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের ২১শে চৈত্র এই মহান শিক্ষানুরাগী কর্মবীরের জীবনাবসান হয়।

কংসারী হালদার

কংসারী হালদার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আন্ধারিয়া গ্রামে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নরেন্দ্র হালদার, মাতা যশোদা। ছাত্রজীবনেই তিনি চরমপন্থী আন্দোলনে যোগদান কবেন এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই সময়ই বামপন্থী ভাবাদর্শের পতি আকৃষ্ট হন এবং বাংলার কৃষক প্রজা পার্টিতে যোণদান করেন। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বুকে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী-সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কংসারী হালদার মানুষের ত্রাণ কার্যে জীবন সমর্পণ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙড়ে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। কংসারী হালদার তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কৃষক আন্দোলনের অবিস্মরণীয় যোদ্ধা। স্বাধীনতার পর প্রথম লোকসভা নির্বাচনে তিনি মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

শহীদ গঙ্গাহরি দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাগরদ্বীপের প্রথম শহীদ গঙ্গাহরি দাস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সাগরদ্বীপের অন্তর্গত মহিষমারী গ্রামে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নিতাইচাঁদ দাস। মাতার নাম জ্ঞানদা দেবী। তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। গঙ্গাহরি দাস প্রাথমিক পাঠশালা পর্যন্ত পড়াশুনা করলেও ধর্মশিক্ষা ও

শাস্ত্রচর্চায় পারদর্শী ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাদর্শ ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি বিদেশী ইংরাজ শাসন ও শোষণ থেকে ভরতবর্ষের মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাহরি দাস মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। নটেন্দ্রপুর বাজারে সত্যাগ্রহীগণ স্থির করেন, সাগরদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত লাইট হাউসে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করবেন। গঙ্গাহরি দাস এই বৈঠকে উপস্থিত হয়ে স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সাগরদ্বীপ অঞ্চলে সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্বে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ মণ্ডল। স্বেচ্ছাসেবকদের এই কর্মসূচী বানচাল করার জন্য পুলিশ অতর্কিতে জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে গ্রেপ্তারের জন্য তাঁর বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে পুলিশ ধরতে না পেরে তার ভাই উদয় মণ্ডল ও গোবিন্দ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবীগণ ঐ দিন জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলনের জন্য এবং মিছিলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। উদয় মণ্ডল ও গোবিন্দ মণ্ডলের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ঘটনাস্থল অবরোধ করেন এবং উদয় মণ্ডল ও গোবিন্দ মণ্ডলকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য দাবী করেন। পুলিশ তাদের দাবী উপেক্ষা করলে গঙ্গাহরি দাস শ্লোগান দিতে দিতে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে বীরবিক্রমে এক মিলিটারী পুলিশের মাথায় সজোরে লাঠির আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করে বন্দীদের মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে এক মিলিটারী পুলিশ বন্দুকের সঙ্গীনের খোঁচায় গঙ্গাহরিকে আহত করে তার বুকের উপর রাইফেল ঠেকিয়ে পর পর গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে গঙ্গাহরি দাস শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

গঙ্গাহরি দাসের মৃত্যুতে সাগরদ্বীপের গ্রামবাসীগণ মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে দলে দলে পুলিশের দিকে ছুটে আসতে থাকে। বাধ্য হয়ে পুলিশ উদয় মণ্ডল ও গোবিন্দ মণ্ডলকে ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করে। গ্রামবাসীরা শহীদ গঙ্গাহরি দাসের মরদেহ নারায়ণী আবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে পুষ্পশোভিত করে মিছিল সহকারে গঙ্গাসাগর মহাতীর্থে পৌঁছায় এবং কপিল মন্দিরের সম্মুখে কলাগাছের ভেলায় করে সাগরজলে বিসর্জন দেয়।

গঙ্গাহরি দাসের মৃত্যু সাগরদ্বীপে পরবর্তীকালে এক বিপ্লবী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে সাগরদ্বীপে শহীদ হয়েছিলেন চেমাগাড়ী গ্রামের রাজবংশী পরিবারেব সন্তান দুর্যোধন ঘোড়ই।

অক্ষয়কুমার কয়াল

অক্ষয়কুমাব কযাল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ফলতা থানাব অন্তর্গত পশ্চিম দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ পুঁথি প্রত্ন-পণ্ডিত। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যাক প্রায় তিন হাজার। এর মধ্যে দেড় হাজার পুঁথি তিনি বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় প্রদান করেছেন। কিছু পুঁথি তিনি সুকুমার সেনকে দিয়েছিলেন। সেগুলি বর্ধমান সাহিত্যসভা লাইব্রেরীতে রয়েছে। অক্ষয়বাবুব সংগৃহীত কিছু পুঁথি বয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। তাঁর সংগৃহীত ও আবিষ্কৃত পুরানো পুঁথিগুলির মধ্যে রত্নেশ্বর সোমের কালিকামঙ্গল, কৃষ্ণদাসের বিল্বমঙ্গল চরিত, বৈদ্য ধর্মদাসের ধর্মমঙ্গল, রাজারাম দাসের নারায়ণী মঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাসের চণ্ডীমঙ্গল, কবিকর্ণের সত্যপীর পালা, সত্যনারায়ণের কামদেব মদনসুন্দর পালা, শঙ্কর গুড়িয়ার পালা, মর্দগাজীর পালা বিশেয উল্লেখযোগ্য।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরবর্তী বছরেই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বুড়লে পল্লী হিতৈষী সমিতিব সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন তিনি। এরপর তিনি গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারারুদ্ধ হন। আলিপুব সেন্ট্রাল জেলে তিনি বন্দী ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়েই অক্ষয়বাবু কিছু পুরানো পুঁথির খোঁজ পান এবং তার গবেষণা শুরু করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়বাবু যোগাযোগ করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সুনীতিবাবুই তাঁকে পুঁথি সংগ্রহে উৎসাহিত করেন। পরবর্তীকালে সুকুমার সেন, যদুনাথ সরকারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সুকুমার সেন এই সময় বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানের কাজ করছিলেন। অক্ষয়কুমার কয়াল তাঁর সংগৃহীত ও আবিষ্কৃত মধ্যযুগের সাহিত্যের বহু পুঁথি দিয়ে সুকুমার সেনকে সাহায্য করেছিলেন। সুকুমার সেন এই পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার করে তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন এবং অক্ষয়বাবুর অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণেও অক্ষয়বাবুর নাম ঋণ স্বীকারোক্তিতে সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন।

অক্ষয়বাবু ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলে নূতন পুঁথি খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রা দেবের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় ভরদ্বাজ এ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখাপড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল

কেতকী দাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারবি থেকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন রূপরাম চক্রবর্ত্তীর 'ধর্মমঙ্গল'। সম্পাদনা করেছিলেন প্রাণরাম কবিবল্লভের 'কালিকামঙ্গল' (১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ)। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন রাজারাম দাসের 'নারায়ণীমঙ্গল'। এই গ্রন্থটি তাঁরই আবিষ্কার। সম্পাদনা করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। আর একটি প্রাচীন পুঁথি তিনি পেয়েছিলেন। পুঁথিটি কবি অযোধ্যরামের 'মহীরাবণ পালা'। কবি অযোধ্যারাম তার জন্মভূমি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুরের নিকটবর্তী আদিগঙ্গার পূর্বতীরে গোবিন্দপুর গ্রামে ১৬২৫ শকাব্দে (১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে) মহীরাবণ পালা গ্রন্থটি লিখেছিলেন। গ্রন্থটি গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় নরোত্তম হালদার তার ভগিনীপতি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলপি থানার অন্তর্গত সিদ্ধিবেড়িয়া নারায়ণপুর গ্রামের আত্মারাম পুরকাইতের বাড়িতে পেয়েছিলেন। নরোত্তমবাবু গ্রন্থটি অক্ষয়কুমার কয়ালকে পাঠোদ্ধারের জন্য দান করেছিলেন।

অক্ষয়কুমার কয়ালের উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায় পট ও পটুয়া বিষয়ক ইংরাজীতে লেখা তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থটি থেকে। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এছাড়া অজস্র পত্র-পত্রিকায় তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। লিখেছেন বঙ্গশ্রী, দৈনিক বসুমতী, সমকালীন, জয়শ্রী, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র মাসিক পত্রিকা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকায়। কল্যাণী নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকও তিনি ছিলেন। পত্রিকাটি কলকাতার ৩নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হত। তার লেখা কলকাতা, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদরে গৃহীত হয়েছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে আগস্ট অক্ষয়কুমার কয়ালের মৃত্যু হয়।

শক্তিকুমার সরকার

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট থানার অন্তর্গত হোটর গ্রামে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ শক্তিকুমার সরকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. কম. পাশ করে শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই শক্তিকুমার সরকার মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে তিনি বারুইপুর কেন্দ্র থেকে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন সংঘটিত হয়। শক্তিকুমার সরকার এই অন্দোলনকে সমর্থন করে কংগ্রেসের বিরাগভাজন হন এবং তিনি বাংলা কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরে উভয় কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হলে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে জয়নগর কেন্দ্র থেকে লোকসভায় সদস্য নির্বচিত হন। এই সময় তিনি ড. আম্বেদকর জন্মবার্ষিকী পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শক্তিবাবু কংগ্রেসের জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিরোধিতা করে কংগ্রেস ছেড়ে জনতা পার্টিতে যোগদান করেন এবং ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়নগর কেন্দ্র থেকে জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্টের সমর্থনে এম. পি. নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মরিচঝাঁপি দ্বীপে সাধারণ মানুষের উপর বামফ্রণ্ট সরকারের পুলিশ বাহিনীর গুলিচালনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিকুমার সরকার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। এরপরই তিনি সমগ্র জীবন সমাজসেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তারই প্রচেষ্টায় সুন্দরবন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মৎস্যজীবীদের সংগঠন 'বঙ্গীয় ফিস প্রডুয়েসর সমিতি' এবং গোসাবায় স্থাপিত হয় 'এগ্রিকালচার রিসার্চ সেণ্টার'। তিনি 'বঙ্গীয় ফিস প্রডুয়েসর সমিতি'র প্রথম সভাপতি ছিলেন। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শক্তিকুমার সরকার সমগ্র জীবন দলিত জনগণের উন্নতি সাধনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর লেখনীও ছিল উল্লেখযোগ্য। দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখেছেন। এছাড়া তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন শুভদূত, ন্যায়-অন্যায় এবং বিভিন্ন পত্রিকায়। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী সমাজদরদী শক্তিকুমার সরকার পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে 'মুক্ত সমাজ' পত্রিকা লিখেছিল, 'মাঝে মাঝে পৃথিবীতে কেহ কেহ জন্মান যারা অনায়াসে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র পরান্মুখ হন না। শক্তিকুমার সরকার ছিলেন তাদেরই একজন।'

বসন্তকুমার মণ্ডল

বসন্তকুমার মণ্ডল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার নিকটবর্তী কৃষ্ণপুর (কেষ্টপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতার নাম অধরচন্দ্র মণ্ডল। ছোটবেলায় তিনি গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। সেই সময়ই

তাঁর মেধার প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বসিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিপন কলেজ থেকে আই এস সি. ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এসসি এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

কর্মজীবনে বসন্তবাবু স্বাধীনচেতা ছিলেন। কোনদিন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর তিনি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পাওয়ার প্লেস এবং কেক তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার পাশাপাশি তিনি সমাজসেবা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়ে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী শোভাদেবী। শোভাদেবী ছিলেন পাথরঘাটার জমিদার গৌরহরি বিশ্বাসের কন্যা। বসন্তকুমার মণ্ডল ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। তাঁর বহু রচনা যুগান্তর ও বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বসন্তবাবু অন্ত্যজ জনসমাজের চিন্তা ও চেতনার একজন অগ্রদূত। জীবনের প্রথম দিকেই তিনি 'অনুলিখন' নামে দলিতের মুখপত্র হিসাবে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি 'প্রগতি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে 'একলব্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন। বসন্তবাবুর রচনাগুলির মধ্যে ধীবরকন্যা, মহিষবাথান, আমার মা, সাধু ডাকাত, বনানী, গীতিমঞ্জুষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা নাটক অরণ্য প্রেম, ওরা কেন কাঁদে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় স্মরণীয়। বসন্তবাবু নীলদর্পণ, সাধক বামাক্ষ্যাপা প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। সংগীতের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। অন্ত্যজ সমাজের জাগরণের জন্য তাঁর জাগরণী গান এবং গীতিকবিতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার

নরোত্তম হালদারের জন্ম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর (বাংলা ২০শে আশ্বিন ১৩৪১) রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামে। পিতা বিরিঞ্চিমাধব ছিলেন কীর্তন, যাত্রা ও গাজন গানের রচয়িতা, শিল্পী ও সুরকার। মা লক্ষ্মীভারতীও বিভিন্ন সঙ্গীতে পারদর্শিনী ছিলেন। স্বভাবতই

শৈশবেই পারিবারিকসূত্রে লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ মাঠ, নদী, খাল-বিল, অদূরে সুন্দরবন, সমুদ্র নরোত্তম বাবুর শৈশব জীবনে গভীব প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে তাঁকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মাটি ও মানুষ। আমৃত্যু তিনি সেখানেই থেকেছেন। সমগ্র জীবন তিনি তার ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতির গভীর অনুসন্ধান করেছেন।

কবি ও প্রাবন্ধিক নরোত্তম হালদারের শৈশব থেকেই লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল অসীম। কিন্তু প্রি. ইউনিভার্সিটি পাশ করার পর তিনি প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মনে হয়েছিল প্রচলিত স্কুল, কলেজের বাইরে শিক্ষা ও জ্ঞানের জগত অসীম। এরপর অবশ্য তিনি বেসিক ট্রেনিং, সোস্যাল ট্রেনিং, এ্যাডাল্ট এডুকেশন ট্রেনিং প্রভৃতিতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর মায়ের নামে স্ব-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীভারতী শিক্ষা নিকেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন।

কর্মজীবনে তিনি শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু শিক্ষকতার বাইরে সাহিত্য, শিল্প, লোক-সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই নরোত্তমবাবু কলকাতার প্রখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' এবং ডায়মণ্ডহারবার থেকে প্রকাশিত 'দখিন' পত্রিকার কচি ও কাঁচা আসরের সুযোগ্য পরিচালক ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল বড়দা ও মনুজেশ গুপ্ত। 'দক্ষিণায়ণ' ও 'মুকুলিকা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক তিনি। তার লেখা অর্ধ-শতাধিক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শিশুদের জন্য তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'কুঁড়ি', 'কুসুম' ও 'সোনার বাংলা'। কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধানেই তাঁর অবদান অপরিসীম। বিস্তীর্ণ দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে তিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের তথ্যসূত্রে প্রাচীন গঙ্গারিডি জাতির ইতিহাস তিনি লিখেছেন। আর্যপূর্ব যুগে এদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা গড়ে তুলেছিল গঙ্গারিডি সভ্যতা। তাদের গৌরবময় ইতিহাস কথা লিখে গেছেন মেগাস্থিনিস (৩৫০-২৯০ খ্রীঃ পূঃ), ডিওডোরাস, প্লিনি, ভেলেরিয়াস ফ্লাককাস, টলেমি প্রমুখ গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ। মহাকবি ভার্জিল তাঁর 'জর্জিকাস' কাব্যগ্রন্থে গঙ্গারিডি জাতির কথা লিখে গেছেন। নরোত্তম হালদার নিজেও প্রাচীন গঙ্গারিডি জাতির আদি-বংশধর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। অথচ বর্তমানকালের ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তে প্রাচীন আর্যপূর্বকালের গৌরবময় সভ্যতার অধিকারী নিম্নগাঙ্গেয় ভূভাগের অধিবাসীগণ দলিত ও ঘৃণিত। নরোত্তমবাবু সমগ্র জীবন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তাঁর লিখিত 'গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ' এবং

'গঙ্গারিডি ঃ আলোচনা ও পর্যালোচনা' গঙ্গারিডি জাতির গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসের আকরগ্রন্থ। একক প্রচেষ্টাতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কাকদ্বীপে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'গঙ্গারিডি রিসার্চ সেণ্টার।' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করেছেন 'গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র মাসিক পত্রিকা।' গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রে তাঁর সংগৃহীত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তন্মধ্যে পোড়ামাটি ও প্রস্তরনির্মিত নিদর্শনগুলির সংখ্যা সর্বাধিক। অপরিসীম একক প্রচেষ্টায়, অবিচলিত নিষ্ঠায় তিনি তাঁর লক্ষ্যপথে এগিয়ে গেছেন। সমগ্র জীবনে তিনি পুরস্কারও পেয়েছেন অনেক। কলকাতার সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল কর্তৃক 'বিজ্ঞান পুরস্কার' (১৯৮৫), ব্যাঙ্গালোর থেকে অখিল ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক 'সাহিত্যশ্রী' সর্বভারতীয় জাতীয় পুরস্কার (১৯৮৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান পরিচয় তিনি একজন ইতিহাস অনুসন্ধানকারী গবেষক। ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ এই বহুমুখী বিরল প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও কর্মযোগীর জীবনাবসান ঘটে।

গণেশ মণ্ডল

জল ও জঙ্গলে ঘেরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার গোসাবা থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ মণ্ডল জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর লেখা পড়ার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। নিজ গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় পায়ে হেঁটে ও নদী পেরিয়ে চার কিলোমিটার দূরে সন্দেশখালির গোরাবাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্দেশখালির পি. সি. লাহা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে গ্যাজুয়েট হয়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে গণেশবাবু পড়াশুনা শেষ করে তাঁর জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে 'যতীন্দ্র শিক্ষানিকেতন'-এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে কর্মজীবন শুরু করেন। একই সঙ্গে তিনি দরিদ্র, অশিক্ষিত, অবহেলিত সুন্দরবন অঞ্চলের অনগ্রসর মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হলে তিনি রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই গণেশবাবু বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষকতাকালীন তিনি জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে তাঁকে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গণেশবাবু গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আর এস পি প্রার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একটানা সাতবার তিনি গোসাবা বিধানসভার কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ মণ্ডল জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় সেচ ও জলসম্পদ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেচ ও জলসম্পদ দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

গণেশবাবু দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত কৃষাণ সভার রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। অনগ্রসর সুন্দরবন অঞ্চলের দরিদ্র. নিপীড়িত অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সমগ্র জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা

যে সুপ্রাচীন পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী একদা শৌর্যে, সম্পদে বিশ্ববাসীর কাছে বন্দিত হয়েছিল, কালের বিবর্তনে সেই জাতি পিছিয়ে পড়ে। পৌণ্ড্রজাতির ইতিহাস নিয়ে যিনি আজীবন গবেষণা করেছেন, সেই ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণের ভাষায়, 'The Poundras are a dying race.' সময়ের বিবর্তনে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী সমগ্র বাংলাদেশ থেকে প্রায় হারিয়ে যায়। অবশিষ্টাংশ সুন্দরবনের জলা জঙ্গলে বসতি স্থাপন করে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জনবিবরণীতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি সম্পর্কে লিখিত হয়েছে, 'The Pods (Poundras) are the indegenous people of the 24 Parganas and Jessore. Out of the total of 5,88,394, 3,64,490 were returned in the 24 Parganas and 1,51,953 in Jessore leaving only 16 per cent to be returned elsewhere mostly in Midnapore and Howrah. Very few indeed are to be found in Burdwan, Birbhum, Bankura, Nadia and Murshidabad.

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজত্বকালেই আর্যরা বাংলাদেশে বসতি বিস্তার করে। প্রাচীন পৌণ্ড্র জনজাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে সেন বংশের রাজত্বকালে তারা বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার শিকার হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রাচীন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনজাতিকে 'নিম্নশ্রেণী' হিসাবে গণ্য করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা বঞ্চিত হয়। এইভাবেই প্রাচীন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি যারা প্রায় চার হাজার বছর পূর্বেই এক সুমহান সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব যুগে যারা ভারতীয় সাহিত্য, গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনায় বন্দিত হয়েছিল তারা কালের বিবর্তনে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনে এক দীন হীন জনজাতি রূপে বসবাস করতে থাকে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে মুসলমানরা সেন রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ দখল করে। বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার, অপমানে জর্জরিত বাংলার অন্ত্যজ সমাজ

দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। মধ্যযুগে পৌণ্ড্রজনজাতির প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। পৌণ্ড্র জনজাতির অবশিষ্টাংশ মানুষ যারা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ছিল তারা মুসলমান রাজত্বকালে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। মধ্যযুগে পৌণ্ড্র জনজাতির বহু ব্যক্তি নবাবদের কাছ থেকে 'জায়গীরদারী' পেয়েছিলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিশিষ্ট গবেষক ধূর্জটি নস্কর তাঁর 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক' গ্রন্থে মুসলমান রাজত্বকালে দক্ষিণ-বঙ্গের দু'জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শাসকের নাম উল্লেখ করেছেন। একজন দেওয়ান রামজীবন খাঁ। অপরজন ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁ নস্কর। নীলাচল যাওয়ার পথে তাঁর বাড়িতে শ্রীচৈতন্যদেব আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং রামচন্দ্র খাঁ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা হয়। এই ইংরাজদের ব্রাহ্মণ্যশ্রেণী স্বাগত জানিয়েছিল এবং ইংরাজ শাসকদের নিকট থেকে তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদারী এবং সরকারী পদগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং সমাজের অন্যান্য উচ্চবর্গীয়রা দখল করে। নিম্নবর্গীয় সমাজের পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ তারা দীর্ঘকাল শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্বে এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার চর্চা ছিল। সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিম্নবর্গীয় ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটে। ইংরাজী শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য উন্মোচিত হওয়ায় নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেও শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৌণ্ড্র জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যে প্রসার ঘটেছিল তার উল্লেখ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টে পাওয়া যায় (Report of the Indian Education Commission of 1882, Chap. IX, Para 553) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ আছে, 'As regard other Caste, it is noticeable that two of the ambitious Castes that are endeavouring to raise their social status viz the Chasi Kaibartas and Pods have reached a very fair average of literacy. The Pods have made great strides, the proportion of literates

having been nearly doubled. Considerable advance has also been made by the Namasudras and Rajbanshis, but inspite of this only one in every twenty can read and write, whereas among the chasi Kaibartas one in nine and among the Pods one in seven can do so. (The census Report—1911) বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই যে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল তার প্রমাণ কয়েকটি রিপোর্টে পাওয়া যায়, এগুলির মধ্যে Progress of Education—Bengal 1912-13 to 1916-17, Fifth Quinquennial Review by W. W. Hervell (Calcutta 1918, Chap IX, Para 610 এবং Calçutta University Commission Report 1917-18 (Vol-1, Part V, Chapter VII) উল্লেখযোগ্য।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সেন্সাস বিবরণীতে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল প্রতি এক হাজারে ১৩৮ জন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ আছে, The Pods have taken to education and are improving their position. They are 9.7 per cent more numerous than in 1911 and 26.6 per cent more than in 1901 (Census Report—1921, Chap, XI, P. 358)

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার ক্রমেই প্রসারিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার ছিল পঁয়ষট্টি শতাংশ।

সামাজিক অবস্থা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌণ্ড্র জনজাতির সামাজিক অবস্থান আলোচনা প্রসঙ্গে এই জনজাতির প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করা যাক। প্রাচীনকালে পুণ্ড্র জনজাতির সামাজিক অবস্থান জানা যায় ঐতরেয় আরণ্যক, মনুসংহিতা, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, কুলতন্ত্র এবং দ্বিজ ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে। ঐতরেয় আরণ্যকে পুণ্ড্র জনজাতিদের 'দস্যু' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, এরা বিশ্বামিত্রের বংশধর। মুখ্যত এই উক্তির পিছনে পুণ্ড্রজনদের আর্যীকরণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মনুসংহিতাতে। মনু পুণ্ড্র কোমের লোকেদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করেছেন। আবার মহাভারতে সভাপর্বে পুণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে পুণ্ড্রজনদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। সুতরাং মহাভারতীয় যুগে পুণ্ড্রদের সামাজিক অবস্থান ছিল ক্ষত্রিয় পর্যায়ে।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজত্বকাল পর্বে বাংলার সামাজিক ইতিহাস চক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হয়েছিল। পাল রাজত্বকালে সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের ঔদার্য ছিল। সেন রাজত্বকালে সমাজ ব্যবস্থায় কোন ঔদার্য, অন্যতর আদর্শ ও ব্যবস্থার স্বীকৃতি ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কাব ও সংস্কৃতি তদনুযায়ী সমাজ ও বর্ণব্যবস্থায় সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রেব ইচ্ছায ও নির্দেশে। ফলে বর্ণবিন্যাসে বিষময় বিভেদ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশে আর যত বর্ণ আছে, সকলেই সংকর বর্ণ এবং সকলেই শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণেরা এই সকল শূদ্র সংকর উপবর্ণগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি উপবর্ণের স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ছত্রিশটি জাত বা উপবর্ণের কথা বলা হয়েছে যদিও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে একচল্লিশটি জাত। সম্ভবত পরে আরও পাঁচটি জাত তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় যে এই একচল্লিশ জাতের তালিকায় পোদ বা পৌণ্ড্র জাতির নাম নেই। কিন্তু প্রায় সমসাময়িককালে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পৌণ্ড্রক জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাংলাদেশের সমস্ত জাতকে সৎশূদ্র এবং অসৎশূদ্র পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। সৎশূদ্র পর্যায়ের জাতগুলি হল করণ, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য, গোপ, নাপিত ভিল্ল, মোদক, কুবর, তাম্বলী, স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক (স্বর্ণকারগণ পরে অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত) মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার. কুবিন্দক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকর (চিত্রকর পরবর্তী পর্যায়ে অসৎশূদ্রভুক্ত)। অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত হল স্বর্ণকার, সূত্রধর, চিত্রকর, অট্টালিকাকার, কোটক (যারা ঘরবাড়ী তৈরী করে), তীবর, তৈলকার, লেট, মল্ল, চর্মকার, শুঁড়ি, পৌণ্ড্রক, কসাই, রাজপুত্র (পরবর্তীকালের রাউত!) কৈবর্ত, রজক, কৌয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুগী, আগরী। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এই সকল বর্ণ উপবর্ণের সম্পর্ক এবং বিধিনিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায় ভবদেব ভট্টের রচনায়। দু'একটা নমুনা উল্লেখ করা যাক। রজক, কর্মকার, নট, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, কাপালিক, ভক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক এবং পতিত ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্পৃষ্ট বা পক্ক খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধ অমান্য করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। কিন্তু পৌণ্ড্রকদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সম্পর্ক বা বিধিনিষেধের কথা ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন ও অন্যান্য স্মৃতিকারের রচনায় উল্লেখ নেই।

মধ্যযুগের শেষার্ধে পৌণ্ড্র জনজাতির সামাজিক মর্য্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজ ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মেদিনীপুর জেলার ঢেকুর রাজ্যে নগর স্থাপন প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

রঙ্গিণী কিঙ্কর হল নৃপবর
সতন্তর মহাশূর।
ইচ্ছাই দুর্বার করিল রাজাব
দোহাই দস্তুর দূর।।
চৌদিকে পহাড় বেড়ি বাড়ি গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিল চত্বর বসাল নগর
রাজার বসতবাটি।।
করিয়া আসন গাড়িল নিশান
সম্মানে বসান পদ্য।
স্বধর্ম-মণ্ডিত বিধর্ম-খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বৈদ্য।।

যোগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'পদ্য' হল পোদ জাতি। পদ্য নামে অন্য কোন জাতির অস্তিত্ব হিন্দু সমাজে নেই। ঘনরাম মেদিনীপুরেরই স্থান বিশেষের বিষয় লিখতে গিয়ে 'পদ্য' অর্থে এই অঞ্চলের অধিবাসী 'পদ্মরাজ' বা 'পদ্যরাজ'কে ছন্দ মিলনের জন্য 'পদ্য' লিখেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৌণ্ড্রজাতির সামাজিক অবস্থান আলোচনা প্রসঙ্গে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের একটি নথির উল্লেখ করা যায়। জগন্নাথদেবের মন্দিরে পৌণ্ড্রজাতির প্রবেশের অধিকার ছিল। যে সকল জাতিগুলির জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না তারা হল—লোলি, শুঁড়ি, মেছুয়া, নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল, খুসকী, গাজুর, বাগদি, যোগী, কাহার, রাজবংশী, পিরালী, চামার, ডোম, পান, তিয়র, ভুঁইমালী, হাড়ি (Sec. 7-of regulation IV of 1809)। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ১১ আইনে পিরালীদের উক্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চক্রান্তে পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন অলীক এবং অনৈতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করা হয়। খুলনা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, রিজলী সাহেবের The Tribes and Castes of Bengal (Vol. II), হান্টার সাহেবের Statistical Account of Bengal (Vol. I 24 Parganas P. 69) এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জনবিবরণীতে বিভিন্ন ভিত্তিহীন অনৈতিহাসিক তথ্য মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চক্রান্তেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই

সকল কল্পনাপ্রসূত, ভিত্তিহীন তথ্য সরকারী নথীপত্রে লিপিবদ্ধে সাহায্য করেছে। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষ সেন্সাস কর্তৃপক্ষের নামের আড়ালে থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনেক জনগোষ্ঠীর ন্যায় পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হান্টার সাহেবের বিবরণীতে উল্লেখ আছে, They are said to be the offspring of a Sunri Mother and Napti Father. আবার বিজলী সাহেব কায়স্থ পিতা, নাপিত মাতার প্রসঙ্গ তুলেছেন। বলা বাহুল্য এগুলি সমস্তই কল্পনাপ্রসূত এবং ভিত্তিহীন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সেন্সাসে প্রাচীন পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীকে পোদ নামে উল্লেখ করা হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৌণ্ড্র জনসমাজের মধ্যে সামাজিক উত্তোরণের জন্য এক আন্দোলন সূচিত হয়। এই আন্দোলনকে Self Respect Movement বলা যেতে পারে। এই আন্দোলনে প্রধান হোতা ছিলেন বেণীমাধব হালদার। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার রঙ্গিলাবাদ গ্রামে নিজ বাসভবনে তিনি যে সামাজিক সভার আয়োজন করেছিলেন সেই সভায় পৌণ্ড্র জনসমাজের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ হাজির ছিলেন। বস্তুত এই সম্মেলন থেকেই পৌণ্ড্র জনসমাজের জাগরণ ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সূচিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বেণীমাধব হালদার 'জাতিবিবেক' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রকাশকালে গ্রন্থটি তিনি তার পিতা কৈলাসচন্দ্রের নাম গ্রন্থকার হিসাবে এবং নিজ নাম প্রকাশক হিসাবে ব্যবহার করেন। বেণীমাধববাবুর সমসাময়িককালে আর একজন পৌণ্ড্র মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নাম শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে তিনি 'জাতিচন্দ্রিকা' এবং ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়' প্রণয়ন করেন। এটিই পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। এই ইতিহাস গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাঁরই লেখনী ধরে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ পৌণ্ড্র সমাজের ইতিহাসের আকর গ্রন্থ 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ' প্রণয়ন করেন। নিজ জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান ও সমাজ জাগরণে বেণীমাধব হালদার এবং শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণের নেতৃত্বে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সেই আন্দোলনের সার্থক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাইচরণ সরদার। তিনিই পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং পরে আইন পাশ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাইচরণ বাবুর উদ্যোগে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি' স্থাপিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে রাইচরণবাবু ডায়মণ্ডহারবার থেকে

পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের মুখপত্র হিসাবে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বেণীমাধববাবু এবং রাইচরণ সরদার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জনগণনার রিপোর্টে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আবেদন পত্রটি গৃহীত হয় নি। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর কোটালপুর কুন্দরালি গ্রামের জমিদার জয়কৃষ্ণ মণ্ডলের সভাপতিত্বে তাঁরই বাসভবনে ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতির বৈঠক বসে। এই সভাতে সর্বসম্মতিক্রমে ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতির নতুন নামকরণ হয় 'সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি।' সভাপতি নির্বাচিত হন রাইচরণ সরদার। সম্পাদক অনুকূলচন্দ্র দাস (নস্কর), সহ-সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ করণ এবং ভবসিন্ধু লস্কর। পৌণ্ড্রজাতির নেতৃবর্গ এই সময় সামাজিক আন্দোলনের কতকগুলি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ইংরাজ প্রশাসকদের কাছে পৌণ্ড্র জাতির নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্রকে তুলে ধরার জন্য কতকগুলি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পৌণ্ড্র জনজাতির উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস ইংরাজীতে লেখার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় মহেন্দ্রনাথ করণের উপর। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'A short History and Ethnology of the Cultivating Pods'.

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আদমশুমারির সময় উপস্থিত হলে 'সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি'র সম্পাদক অনুকূলবাবু বেণীমাধব হালদার, রাইচরণ সরদার, ভবসিন্ধু লস্কর, হেমচন্দ্র নস্কর, রাখালচন্দ্র মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে সেন্সাসের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাব্লিউ. এইচ. টমসনের কাছে ডেপুটেশন সহকারে একটি স্মারকলিপি পেশ করে (তাং ১৭/০১/১৯২১) পোদ শব্দটির নাম পরিবর্তন করে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' শব্দটি প্রয়োগের দাবি জানান। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতৃবর্গ সামাজিক আন্দোলনের এক অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণের নেতৃত্বে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যে উপবীত ধারণের জন্য প্রয়াসী হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। পৌণ্ড্র নেতৃবর্গ ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে একটি সভায় মিলিত হলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়কৃষ্ণ মণ্ডল, মহেন্দ্রনাথ করণ, অনুকূলচন্দ্র দাস, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, শরৎচন্দ্র নস্কর প্রমুখ ব্যক্তিরা। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে নেতৃবর্গের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে পৈতা ধারণ বা দ্বাদশাহ অশৌচ পালন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে যার ইচ্ছা অনুযায়ী তা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৫ আষাঢ়) ৫৫ জন পৌণ্ড্র সমাজের ব্যক্তিকে উপবীত পরিয়ে ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদায় ভূষিত করেন। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৌণ্ড্রজনসমাজের প্রায় দশ হাজার ব্যক্তি উপবীত ধারণ করেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার রিপোর্টে পৌণ্ড্র নেতৃবর্গের কাছে আর একটি 'ইস্যু'-র জন্ম দেয়। এই বছর ব্রিটিশ সরকার কতকগুলি বর্ণ বা গোষ্ঠীকে Depressed class হিসাবে চিহ্নিত করে। উক্ত তালিকাভুক্তরা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইনে (Govt. of India Act 1935) Scheduled Caste নামে চিহ্নিত হয়। পৌণ্ড্র জনজাতিও এই তালিকাভুক্ত হয়। তদবধি পৌণ্ড্র সম্প্রদায় Scheduled Caste তালিকাভুক্ত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌণ্ড্র জনজাতি মূলত চাষবাস করে জীবন-যাপন করত। পৌণ্ড্র জনজাতি যে কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করত মধ্যযুগেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে। ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে শিবায়ন কাব্য রচিত হয়েছিল। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাকবি ও সভাসদ। এই অঞ্চলে কৃষিজীবী পোদ জাতি তার নিকটবর্তী প্রতিবেশী ছিল। 'শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক শিবের দারিদ্রের বর্ণনায় পার্বতী শিব-কে যে কৃষিকাজ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন তা শিবঠাকুর সহজে মেনে নিতে পারেন নি। কবির ভাষায় শিবঠাকুর উত্তর দিয়েছেন ঃ

বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈল সুতা।
দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা।।
ভিক্ষা দুঃখে সুখে আছি আকিঞ্চন পণে।
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।।
শুনিতে সুন্দর চাষ আরাম বিস্তর।
সকল সম্পূর্ণ যার নাহি তার ডর।।

অষ্টাদশ শতকের কবি দ্বিজ নরোত্তমের 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যেও পোদ জাতি যে কৃষিজীবী তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে কে বড় এই মীমাংসার পর রাজা বিক্রমাদিত্য লক্ষ্মীর কৃপালাভ করেন। তারপর লক্ষ্মীদেবী চাষবাসের জন্য তার কৃপাধন্য এক কৃষিজীবী পোদের নন্দনের নাম এবং তার কৃষিবৃত্তির কথা ঘোষণা করেন।

দুঃখীদাস হলধর পোদের নন্দন
তারে করাইব চাষ বলেন বচন।
দুঃখীদাসে কৃপা করিতে যান নারায়ণী
কাঁচা সোনা চাঁদের কোনা দেবী নারায়ণী।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মিস্টার বেলী মেদিনীপুর জেলার জোলামুঠা ও মাজনামুঠা স্টেটের সেটেলমেন্ট বিবরণীতে মেদিনীপুরে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এক তালিকা এবং তাদের জীবিকা উল্লেখ করেছেন।

জাতির নাম	**জীবিকা**
ডোম	ঝুড়ি প্রস্তুতকারী
ভোসিয়া ও মাহারা	পাল্কীবাহক
মুচি	জুতা নির্মাতা
তেলী	তৈলকার
গোয়ালা	দুগ্ধাদি বিক্রেতা
কৈবর্ত ও পোদ	কৃষিজীবী
ধোবা	বস্ত্র ধাবক
তাঁতি	বস্ত্র বয়নকারী
কেশুরিয়া খাদাল	দিনমজুর
নাপিত	ক্ষৌরকার
কাঁকড়া ও কদমা	তস্কর ও দিনমজুর
জেলিয়া	মৎস্যজীবী
করঙ্গা	সানাইবাদক

সুতরাং মেদিনীপুরে বসবাসকারী পৌণ্ড্ররা যে কৃষিজীবী ছিল তা উক্ত বিবরণীতে পাওয়া যায়।

Sir H. Risley তার 'Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে পোদ জাতির জীবিকা কৃষিকার্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'The great majority of the Caste are engaged in agriculture, as tenure holders and occupancy rayats. A few have risen to be Zaminders and some at the other end of the sacle work as nomadic cultivators in freshly cleared land in the Sundarban.

Many Pods have taken to trade and goldsmiths, black-smiths, tin-smiths, carpenters etc. found among them.

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পোদ জাতিকে মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী ও ব্যবসাজীবী বলা হয়েছে।

জাতি	যে স্থানে দৃষ্ট হয়	মন্তব্য
পোদ	দক্ষিণবঙ্গ	মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী জাতি। পৌণ্ড্র নামেও অভিহিত হয়।
পুণ্ডরী/পুঁড়া	মালদহ	রেশম কীট পালনকারী (মূলত পোদ)

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা মৎস্য শিকার বলা হয়েছে, কিন্তু পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠী মূলত কৃষিজীবী। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে তার উল্লেখ আছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জনবিবরণীতে বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজীবী সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

কৃষিজীবী সম্প্রদায়	সংখ্যা
মাহিষ্য	২২,১১,০০০
নমঃশূদ্র	২০,০৬,০০০
রাজবংশী	১৭,২৭,০০০
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	৫,৮৮,০০০

বিংশ শতাব্দীতে পৌণ্ড্র জনজাতির আর্থ-সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই জনজাতি বাংলাদেশের এক অনগ্রসর জনজাতি, যদিও এই সময় থেকেই তাদের মধ্যে এক আত্ম-অনুসন্ধান এবং জন-জাগরণের আন্দোলন শুরু হয়। এখনও এই জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে এবং দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। তার উত্তরণের দায় আমাদের সকলের।

তথ্যসূত্র

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র
বৌধায়ন স্মৃতি
মনুসংহিতা
রামায়ণ
মহাভারত
হরিবংশ
শ্রীমদ্ভাগবত
বিষ্ণুপুরাণ
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ
বায়ুপুরাণ
স্কন্দপুরাণ
গরুড়পুরাণ
বামনপুরাণ
মার্কণ্ডেয় পুরাণ
মৎস্যপুরাণ
সৌরপুরাণ
ভবিষ্যপুরাণ
বৃহদ্ধর্মপুরাণ
যোগিনীতন্ত্র; তন্ত্রসার
অর্থশাস্ত্র
রাজতরঙ্গিনী
হর্ষচরিত
জৈন কল্পসূত্র
মহাবংশ
কথাসরিৎসাগর
দশকুমারচরিত
বৃন্দাবন দাস—চৈতন্যভাগবত

রামেশ্বর ভট্টাচার্য—শিবায়ন
ঘনরাম চক্রবর্তী—ধর্মমঙ্গল
কৃষ্ণরাম দাস—রায়মঙ্গল
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ
রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস
দুর্গাচরণ সান্যাল—বাংলার সামাজিক ইতিহাস
অতুল সুর—বাঙলার সামাজিক ইতিহাস
দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ
নগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস
রমাপ্রসাদ চন্দ্র—গৌড়রাজমালা
রজনীকান্ত গুহ—মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণ
বিজয়চন্দ্র মজুমদার—বাঙলা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত—বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা
নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)
বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস
সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
কালিদাস দত্ত—দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতীত
রাইচরণ সরদার—দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য-পরীক্ষা
বেণীমাধব দেব হালদার—জাতিবিবেক
মহেন্দ্রনাথ করণ—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—বাংলার লৌকিক দেবতা
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—ভারতীয় সমাজপদ্ধতি
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস
শশিভূষণ দাসগুপ্ত—হাজার বছরের পুরানো বাঙলা ও বাঙালী
সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর ও খুলনার ইতিহাস
শরৎচন্দ্র রায়—ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা
নরোত্তম হালদার—গঙ্গারিডি ঃ আলোচনা ও পর্যালোচনা

বিমলেন্দু হালদার—দক্ষিণ ২৪ পরগণার কথ্যভাষা ও লোক-সংস্কৃতির উপকরণ
ধূর্জটি নস্কর—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক
কৃষ্ণকালী মণ্ডল—দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ—জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, সংখ্যা ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬
১৮, ২৫ ফেব্রুয়ারী এবং ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ ২০০০
সমকালের জিয়নকাঠি—সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল—সেপ্টেম্বর ২০০৭, সম্পাদক—নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল
গণমুক্তি—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংখ্যা, দশম উদ্যোগ, মার্চ ২০০৯, সম্পাদক—উৎপল বিশ্বাস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Alexander Canningham—The Classical Accounts of India
H. Risley—Tribes and Castes of Bengal
—The People of India
W. W. Hunter—Statistical Accounts of Bengal
Mahendranath Karan—A short Histry and Ethnology of the Cultivating Pods
Haraprasad Sastri—A paper on Buddhism in Bengal
Atul Sur—History and Culture of Bengal
K. J. Saunders—The story of Buddhism
Ferguson—Ancient Geography of India
Charles Lyall—Principles of Geography
R. C. Dutta—Civilisation of Ancient India
Vincent Smith—Early History in India
Jogendranath Vidya Bhusan—Hindu Caste and Sect
Dinesh Chandra Sircar—Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilisation
—The city of Ganga
H. C. Roychowdhury—History of Bengal
R. K. Chakraborty—History of Gaur
A. C. Haden—Races of Man
Jitendranath Bondopadhyay—The Development of Hindu Iconography
Radhagovinda Basak—The History of North-Eastern India.
Kalidas Dutta—Antiquities of Khari in Annual Report of Varendra Research Society Rashahi, 1928-29

K. N. Dikshit—Excavations at Paharpur
Manmohan Gangopadhyay—Handbook to the Sculptures in the museum of Vangiya Sahitya Parishad Calcutta-1922
V. N. Ghosal—The Agrarian system in ancient India
G. S. Ghurye—Caste and Race in India
Lalanji Gopal—The Economic life in Northern India
Kunjagovinda Goswami –Excavations at Bengals, 1938-41, Calcutta
G. A. Grierson—Linguistic Survey of India
Biraja Shankar Guha—An outline of racial ethnology in India in outline of field sciences of India.
Rajendrachandra Hazra—Studies in the Upapuranas
Rameschandra Majumder—The early history of Bengal
Montogomery Martin—Eastern India
T. J. Manohan—The Early history of Bengal
M. Morrison—Political Centres and Cultural regions in early Bengal
Hemchandra Roychowdhury—Studies in Indian antiquities.
Thomas Walters—On Yuan Chwang's travels in India
W. Durrant—Oriental Heritage
Sudhakar Chattopadhyay—Social life in ancient India
Sudhirranjan Das—Folk religion of Bengal
Richard Fick—Social Organisation of North-Eastern India in Buddha's time
Ramaranjan Mukhopadhyay, Sachindra Kumar Maity—Corpus of Bengali Inscriptions bearing on History and Civilization of Bengal
Bengal District Gazetter—Ed. L. S.S. O'Malley, Calcutta-1914
Presidential address for the Anthropological Section : Indian Science Congress—1936—Harenchandra Chakladar
The Study of Kol in Calcutta Review—1923, Sunitikumar Chattopadhyay
Analysis of Race-Mixture in Bengal in Journal of the Asiatic Society—1927—Prasantachandra Mahalanobis
Ancient India as described by Ptolemy—Ed S.N. Majumdar

The Periplus of the Erythrarean Sea : Travel and Trade in the Indian ocean by a merchant of the first century Ed and trans W. H. Schoff

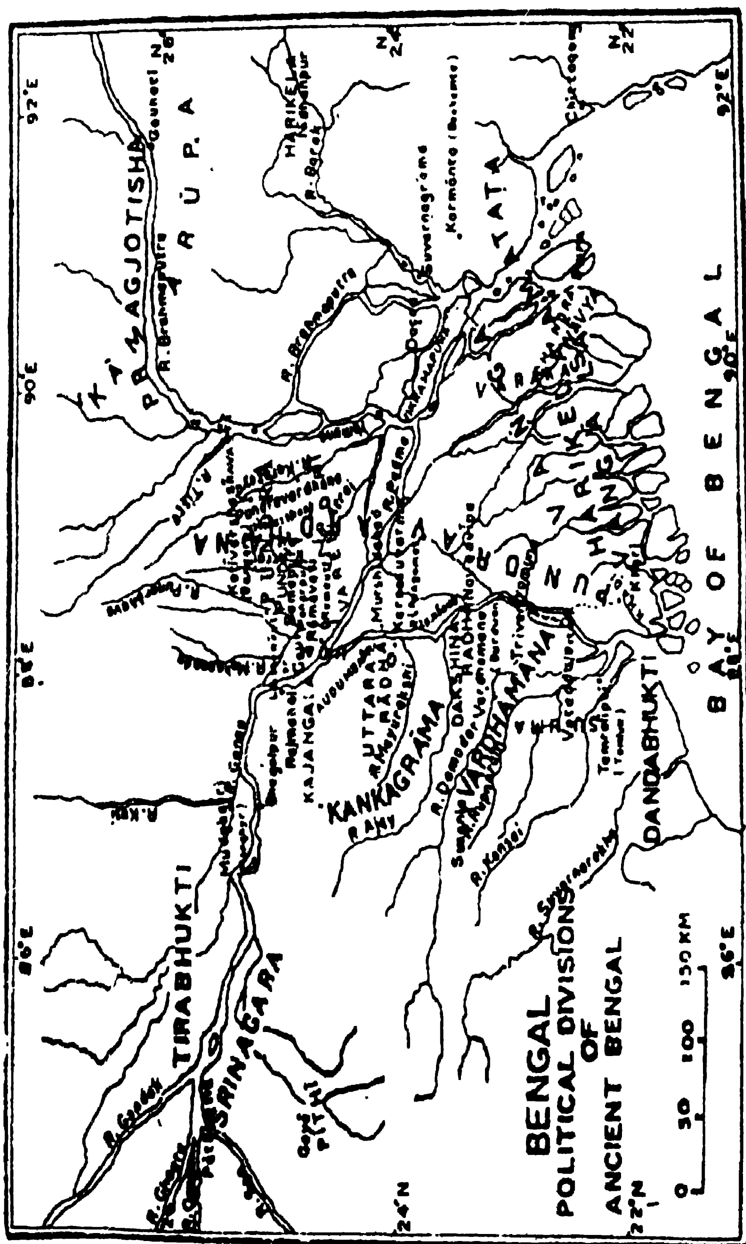
Ancient Countries in Eastern India—(Journal of the Asiatic Society 1895)—E. F. Pargiter

Ancient India as described by Megasthenes and Arrian—J W Mcrindle

Temples of Bengal in Journal of the Indian Society of oriental Art-1934—Sarasikumar Saraswati

Catalogue of coins in Indian Museum, Calcutta Vol-I 1906—Ed. V. A. Smith

Census Report—	1872
,,	1881
,,	1891
,,	1901
,,	1911
,,	1921
,,	2001



History of Bengal, Amita Chakrabarty, The University of Burdwa Burdwan, First Published : 1 July 1991 থেকে কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত।